বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রকাশক

শ্রীবিমলচন্দ্র সেনগুপ্ত

[illegible], রাজা বসন্ত রায় রোড,

কালীঘাট, কলিকাতা

১৩৪৫

প্রাপ্তিস্থান
এস্, সি সরকার এণ্ড্ সন্স্ লিমিটেড্
১।১।১সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
ও
অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

প্রিণ্টার—শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
কালীতারা প্রেস
১৬, টাউন্‌সেণ্ড্ রোড্, ভবানীপুর,
কলিকাতা

শ্রীনীলিমা দেবী ও শ্রীপবিত্রকুমার বসু—

প্রীতিনিলয়েষু

নিবেদন

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক; তদুপরি তিনি কবি, দার্শনিক, সাহিত্য সমালোচক ও জাতীয়তার উদ্গাতা। বর্ত্তমান গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার সম্যক্ আলোচনা করা সম্ভব হয় নাই। এই অপূর্ণতার জন্য শুধু আমার অক্ষমতাই যে দায়ী তাহা নহে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক; তাঁহার প্রতিভার সকল দিক্ আলোচনা করিতে গেলে উপন্যাসের বিচার খণ্ডিত হইতে পারে এবং গ্রন্থের ঐক্য নষ্ট হইতে পারে মনে করিয়া আমি উপন্যাস-সাহিত্যকেই কেন্দ্র করিয়া আমার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব, জাতীয়তা, সাহিত্যসমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ ও অল্পাধিক বিশ্লেষণও করা হইয়াছে, কারণ সাহিত্য সাহিত্যিকের সমগ্র মনের সৃষ্টি; ঔপন্যাসিকের ভাবধারার সন্ধান না পাইলে, তাঁহার সৃষ্টির স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু ভাবী পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন ও প্রবন্ধের যে আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা নিতান্ত গৌণভাবে আসিয়াছে। শুধু হাস্যরসের বিচারকে সমধিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। উপন্যাসের প্রধান কাজ চরিত্রসৃষ্টি; "কমলাকান্তের দপ্তর" ও "মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত" উপন্যাস না হইলেও ইহাদের মধ্যে উপন্যাসোচিত চরিত্রসৃষ্টি আছে এবং যে সকল মৌলিক উপাদান লইয়া উপন্যাসসাহিত্য রচিত হয় হাস্যরস তাহাদের অন্যতম। বঙ্কিমের রচনায় হাস্যরসের স্থান নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন মনে করিয়া "কমলাকান্তের দপ্তর", "মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত" ও "লোকরহস্য" প্রবন্ধমালার বিস্তৃত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে বহু শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুর সাহায্য পাইয়াছি। তন্মধ্যে আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম

সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁহার প্রবন্ধ আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে এবং তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিয়া আমি অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিয়াছি ও আমার নিজের মতকেও স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। আমার অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার বসু ও আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান্ শৌরীন্দ্রনাথ রায় আমার রচনা পড়িয়া ও তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। ইঁহাদের সূক্ষ্ম রসানুভূতি আমার রচনায় কতদূর প্রতিফলিত হইয়াছে জানিনা, কিন্তু ইঁহাদের নিকট আমার ঋণ শুধু অপরিশোধনীয় নহে, অপরিমেয়। শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ সেন নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। বালির "সাধারণ পাঠাগার" ও বেলগাছিয়া ভিলার গ্রন্থাগার হইতে আমি কয়েক খণ্ড পুরাতন "বঙ্গদর্শন" সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তজ্জন্য বালির "সাধারণ পাঠাগারে"র কর্তৃপক্ষ ও আমার পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ জগদীশচন্দ্র সিংহকে আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

কালীতারা প্রেসের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা অতিশয় নিষ্ঠা ও ধৈর্য্যের সহিত মুদ্রণকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। মুদ্রণকালে আমি পাণ্ডুলিপিতে বহু পরিবর্ত্তন করিয়াছি ও অন্যান্য অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদের কখনও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই এবং মুদ্রিত পুস্তকটিকে প্রমাদশূন্য করিতে তাঁহারা যত্নের ক্রটি করেন নাই। ইহা সত্ত্বেও এই গ্রন্থে নানাবিধ ভ্রান্তি রহিয়া গেল। তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই আমি পাঠকের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া লইতেছি। ইতি—

প্রেসিডেন্সী কলেজ
কলিকাতা,
শ্রীপঞ্চমী, ১৩৪৫।

বিনীত
শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

সূচীপত্র

বঙ্কিমচন্দ্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

(১)

বাংলার নব্য লেখকদিগের প্রতি উপদেশ দিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।" বঙ্কিমসাহিত্যের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে সাহিত্যসৃষ্টির এই মূল উদ্দেশ্যের আলোচনা করা প্রয়োজন। সৌন্দর্য্য বলিতে বঙ্কিমচন্দ্র কি বুঝিতেন এবং মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধনের সঙ্গে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির সংযোগ কোথায় তাহার বিচার করিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র মানব মনের বৃত্তিগুলিকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন--জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি, কার্য্যকারিণী বৃত্তি। কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলিকে ছাড়িয়া দিলে, জ্ঞানার্জ্জনী ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির মধ্যে একটি পার্থক্য দেখা যায়। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির উপজীব্য হইতেছে প্রত্যক্ষ ও অনুমান, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন হয় অনুভবের সাহায্যে এবং চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিই সুন্দরের উপাসনা করে। এখন প্রশ্ন হইবে:

চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি যাহাকে অনুভব করে, যাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অনধিগম্য সেই বস্তুর স্বরূপ কি? বঙ্কিমচন্দ্র মনে করিতেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জড়পিণ্ডের সমষ্টিমাত্র নহে—ইহার অন্তরালে অনির্ব্বচনীয় শৃঙ্খলা আছে, এক অপ্রত্যক্ষ শক্তি আছে যাহাকে তিনি বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যাহা আছে, তাহা সৎ, তাহার অন্তরালে রহিয়াছে চেতনা অথবা চিৎ এবং তাহার ফল হইতেছে আনন্দ। এই সচ্চিদানন্দের অনুভূতিই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির বিশেষ ক্ষেত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে তিনি সর্ব্বত্র এই শৃঙ্খলার অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং পার্থিব জগতে এই অনির্ব্বচনীয় ঐক্যের প্রকাশ ও প্রতিক্রিয়ার রূপ আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বয়স ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্কে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শেষ জীবনে তিনি এই শৃঙ্খলার সঙ্গে ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধানের সম্পর্ক দেখিয়াছেন এবং ইহাকেই নিজের ধর্ম্মতত্ত্ব বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি বলিয়াছেন, এই শৃঙ্খলার ফল হইতেছে সুখ, আনন্দ। কিন্তু প্রথম জীবনে তাঁহার এই বিশ্বাস স্পষ্ট হয় নাই, বরং তিনি বিশ্বশক্তিকে সমবেদনাহীন নিয়তি বলিয়া কল্পনা করিতে চাহিয়াছেন।

বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের প্রকাশ হয় বহিঃপ্রকৃতিতে ও মানবের অন্তঃপ্রকৃতিতে। সুতরাং সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে হইলে এই দুই প্রকাশের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে এবং ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আবিষ্কার করিতে হইবে। অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি—একে

উপরের রস জোগাইবে; একটিকে বাদ দিয়া অপরটিকে অবলম্বন করিলে বিশ্বব্যাপী একক চৈতন্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে না, আমাদের দৃষ্টি হইবে খণ্ডিত, আমাদের উপলব্ধি হইবে সঙ্কীর্ণ, ভ্রান্ত। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, "অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়.........যদি শুধু অন্তঃপ্রকৃতির উপর জোর দেওয়া হয় তাহা হইলে ইন্দ্রিয়পরতা দোষ ঘটে—উদাহরণ জয়দেব। আর যদি বহিঃপ্রকৃতিকে অতিমাত্রায় প্রধান করা হয় তাহা হইলে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে—যেমন Wordsworth।"

বহিঃপ্রকৃতির রূপ প্রত্যক্ষ; অন্তঃপ্রকৃতির প্রবৃত্তিও সম্পূর্ণ অপ্রত্যক্ষ নহে। এই প্রত্যক্ষগোচর, অনুমানসাপেক্ষ রূপ বৈজ্ঞানিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের ক্ষেত্র। ইহার মধ্যে কবির প্রবেশাধিকার কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্র মনে করিতেন যে বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের প্রকাশ হয় খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ মূর্তিতে। "যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত" তাহা কাব্যের সামগ্রী হইবে না এমন কথা তিনি বলেন নাই, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক দাবী রহিয়াছে অব্যক্তের, মানবহৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত অস্ফুট ভাবধারার। প্রকৃত স্রষ্টা স্বভাবকে অনুকরণ করিতে পারে, কিন্তু তাহার প্রধান কাজ সত্যকে অতিক্রম করিয়া অরূপকে রূপ দেওয়া। 'উত্তরচরিত' সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, "যাহা স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি।..... যাহা প্রকৃত তাহাতে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেন না, তাহা অসম্পূর্ণ, দোষ সংস্পৃষ্ট, পুরাতন এবং

অনেক সময়ে অস্পষ্ট। কবির সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন; সুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশূন্য, নবীন এবং স্পষ্ট হইতে পারে।"

(২)

বঙ্কিমচন্দ্রের মতের যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে দেখা যায় যে সাহিত্যে তিনি দুইটি জিনিষের অনুসন্ধান করিয়াছেন—বিশ্বের বৈচিত্র্যের অন্তরালে ঐক্যের আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছিলেন এবং প্রত্যক্ষ জগতে রূপের যে প্রকাশ হয় তাহার খণ্ডতা, সঙ্কীর্ণতা অস্পষ্টতা অতিক্রম করিয়া অব্যক্ত, উন্নত ভাবের রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসের কাহিনী অতি বিচিত্র—ইহার ঘটনাবলী অতিশয় বিশৃঙ্খল। এই বিশৃঙ্খল ঘটনার অন্তরালে বঙ্কিমচন্দ্র কোন নিয়ামক শক্তি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। এই অক্ষমতা এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান ত্রুটি। বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্য করিয়াছেন কাহিনীর মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের অপরূপ সমন্বয়ের প্রতি। এই উপন্যাসের নায়িকা দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাধান্য পাইয়াছে বিমলা ও আয়েষা। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে বাহিরে ইঁহাদের জীবনের যে ধারা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। বিমলা পরিচারিকা নহেন, আয়েষা সেবানিরতা নবাবনন্দিনী মাত্র নহেন,—বহিরাবরণের অন্তরালে রহিয়াছে প্রেমোন্মত্ত রমণীর উদ্বেল হৃদয়। বিমলার জীবনের গোপনতম তথ্য এবং আয়েষার হৃদয়ের নিভৃততম কাহিনী—উপন্যাস এই দুইটি রহস্যকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া

উঠিয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকৌশল পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে নাই। সুতরাং তিনি এই দুইটি গোপন রহস্যকে প্রকাশ করিতে অতিনাটকীয় উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। বিমলার পত্র, কতলুখাঁর হত্যা, বন্দীশালায় আয়েষার 'মুক্তকণ্ঠ' স্বীকারোক্তি, ওসমান ও জগৎসিংহের যুদ্ধ—এই সকল ব্যাপারে অস্বাভাবিকতার গন্ধ আছে; মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র 'অব্যক্ত'কে জোর করিয়া 'ব্যক্ত' করাইতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'য় এই অপরিণতির চিহ্ন মাত্র নাই। তিনি এই উপন্যাসে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্যের সন্ধান করিয়াছেন। একের উপর অপরের প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়াছে, কেহ অনাবশ্যক প্রাধান্য পায় নাই। 'কপাল-কুণ্ডলা'র সমুদ্রবর্ণনা খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এই যে সমুদ্রের মনোরম সৌন্দর্য্যকে প্রাণ দিয়াছে কপালকুণ্ডলার হৃদয়ের মাধুর্য্য আর তাহার ভয়ঙ্কর মহিমা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে কাপালিকের ভীষণতায়। এই গ্রন্থে সমুদ্রকে কপালকুণ্ডলা ও কাপালিকের নিকট হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা যায় না; অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে অপরূপ ঐক্য পরিস্ফুট হইয়াছে। হৃদয়ের রহস্য প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং তাহার অভিব্যক্তি সহজ হইয়াছে। আবার প্রকৃতির মাধুর্য্য ও ভীম-কান্ত রূপ নরনারীর হৃদয়ে লীলায়িত হইয়া অনন্যসাধারণ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই দুই শক্তির সমন্বয়, ইহাদের বিচিত্র প্রকাশ বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাকে আন্দোলিত করিয়াছে কিন্তু ইহাদের অন্তরালে যে বিশ্বব্যাপী চৈতন্য আছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সন্ধান করেন নাই,

তিনি রহস্যের চিত্র আঁকিয়াছেন, রহস্যময়কে আবিষ্কার করিতে চাহেন নাই। কপালকুণ্ডলার হৃদয়ের গভীরতা ও সমুদ্রের বিরাট বিস্তৃতি—ইহাদের মধ্যে তিনি এমন পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, যে তাহার অন্তরালে কোন বিশেষ শক্তি আছে কিনা সে তর্ক একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কবির কল্পনা দার্শনিকের জিজ্ঞাসাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

এই উপন্যাসে আর একটি চরিত্র আছেন যিনি লোকাতীত শক্তির পরিচয় পাইয়াছেন—বহিঃপ্রকৃতিতে নহে, আপনার অন্তরের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। মতিবিবি জাহাঙ্গীর বাদ্‌শাহ্‌কে ছাড়িয়া গরীবের গৃহিণী হইতে চাহিলে পেষ্‌মন অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। মতিবিবি নিজেই এই রহস্যের সমাধান করিলেন এই বলিয়া, "আকাশে চন্দ্র সূর্য্য থাকিতে জল অধোগামী কেন?.........ললাট লিখন।" এইখানে আমরা একটি নূতন ভাবের সন্ধান পাইলাম। বিধিলিপি শুধু বাহিরের শক্তি নহে, তাহার আসন রহিয়াছে আমাদের অন্তরে। আমাদের অনেক প্রবৃত্তি একেবারে অপ্রতিরোধনীয়; আমরা ইচ্ছা করিলেও তাহাদিগকে শান্ত করিতে পারি না। যদিও ইহারা আমাদের হৃদয়স্থিত প্রবৃত্তি তবু ইহাদের গতিবেগপ্রাবল্য দেখিয়া মনে হয় যে বাহিরের কোন বৃহত্তর শক্তি ইহাদের প্রেরণা জোগাইতেছে। মতিবিবি সেই শক্তিকেই স্বীকার করিয়াছেন। এই বিষয়ে 'মৃণালিনী'-বর্ণিত মনোরমার চিত্র আরও স্পষ্ট। জ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে কন্যা অনুমৃতা হইবে, এই জন্য কেশব কন্যাকে বিবাহ দিয়া সেই রাত্রিতেই

অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল এবং তাহাকে বিধবা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু নিয়তির বিধান এমনি অনতিক্রমণীয় যে পশুপতি ও মনোরমা পরিচিত হইল এবং নিজেদের অতীত ইতিহাস না জানিয়াও পরস্পরের প্রতি গভীর প্রণয়ে আকৃষ্ট হইল। মানুষের প্রবৃত্তির দ্বারা দৈবের জাল বোনা হইয়াছে। যখন মনোরমা জানিত না যে সে বিধবা নহে এবং তাহার প্রণয়ে কোন পাপ নাই, তখন হেমচন্দ্র বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ও স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্পর্কে তাহাকে উপদেশ দিতেছিলেন। তাহার উত্তরে সে বলিয়াছিল, "ভাই, এই গঙ্গাতীরে গিয়া দাঁড়াও; গঙ্গাকে ডাকিয়া কহ, গঙ্গে, তুমি পর্ব্বতে ফিরিয়া যাও।"

মনোরমার কাহিনী হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে বঙ্কিম সময়ে নিয়তির অনতিক্রমণীয় বিধানের মধ্যে মানবজীবনের সমস্যার সমাধান দেখিতে পাইয়াছিলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে অভিরামস্বামী গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে মোগলসেনাপতি হইতে তিলোত্তমার বিপদের সম্ভাবনা এবং যাহাতে সেই সম্ভাবনা কখনও কার্য্যে পরিণত হইতে না পারে তজ্জন্য তিনি বীরেন্দ্র সিংহকে মোগলের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিপদ দূর হইল না। তিলোত্তমার বিপদ আসিল পাঠানের নিকট হইতে এবং দেখা গেল যে পাঠান সৈন্যদলের মধ্যে একজন সৈনিককে সবাই মোগলসেনাপতি বলিয়া ডাকিত। অদৃষ্টের লীলার এই চিত্রে উচ্চাঙ্গের শিল্পকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ যে পাঠানকে মোগলসেনাপতি বলিয়া ডাকা হইত সে সত্য সত্যই মোগল নহে এবং গড়মান্দারণ

বিজয়ে তাহার অংশ খুব গৌণ। 'মৃণালিনী'তে মাধবাচার্য্য গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে পশ্চিমদেশীয় বণিক আসিয়া পূর্ব্বদেশে মুসলমান রাজত্বের উচ্ছেদ সাধন করিবে। এক সময়ে হেমচন্দ্র বণিক্ পরিচয়ে মথুরায় বাস করিয়াছিলেন। তাহা হইতে মাধবাচার্য্য মনে করিলেন যে হেমচন্দ্রই মুসলমানকে মগধ ও গৌড়রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবেন। যে বণিক্ মুসলমান রাজত্বের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল সে বাণিজ্যের ছলনায় প্রণয়িনীর অভিসারে যায় নাই, সে সত্য সত্যই বাণিজ্য করিয়াছিল এবং বাধ্য হইয়া অনেকটা বাণিজ্যের সুবিধার জন্যই রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিল। মাধবাচার্য্য মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ হইয়া এক বিরাট অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যাহার জন্য তাঁহার সহায় ও সম্বল ছিল না কিছুই। বঙ্কিমচন্দ্রের এই দুইখানি রচনা অতিশয় অপরিণত। মানুষের প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতা ও দৈবশক্তির অনিবার্য্য গতির মধ্যে কোন নিবিড় সংযোগ নাই। যে ঐক্যানুভূতি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার শ্রেষ্ঠ উপাদান এইখানে তাহার একান্ত অভাব।

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনায় নিয়তির লীলার যে চিত্র পাই তাহার সম্যক্ বিচার করিতে হইলে গ্রীক্ ট্র্যাজেডি ও টমাস হার্ডির রচনার সঙ্গে বঙ্কিমের শিল্পকৌশলের তুলনা করা প্রয়োজন। গ্রীক্ ট্র্যাজেডিতে দেখি, নিয়তি যে জাল বুনিয়া দিয়াছে মানুষ তাহা কিছুতেই ছিঁড়িতে পারে না। মানুষের জ্ঞান অস্পষ্ট; সে জানিয়াও জানে না। যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত সে পায় তাহা তাহাকে শুধু গভীরতম পঙ্কে নিমজ্জিত করে। ঈডিপাসের ইতিহাস

মানুষের জ্ঞানের অস্পষ্টতা, তাহার চেষ্টার মূঢ়তা ও নিয়তির অনতিক্রমণীয়তার চরম দৃষ্টান্ত।* শেক্সপীয়রের নাটক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম জীবনের উপন্যাসে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শেক্সপীয়র নিয়তির বিধানকে অস্বীকার করেন নাই, তিনি অতিপ্রাকৃতেরও অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু জোর দিয়াছেন মানবের প্রবৃত্তির উপর। কোন্ শক্তির প্রভাবে ডেস্‌ডিমোনা ঠিক সেই সময়েই রুমালখানা হারাইল যখন এই হারান সব চেয়ে বেশী অমঙ্গলকর হইবে? কে রাজা লীয়রকে তাঁহার বড় দুই কন্যা সম্পর্কে অন্ধ করিয়া দিয়াছিল? শেক্সপীয়র এই শক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে আভাস দিয়াছেন, কিন্তু ইহার কর্ম্মপদ্ধতিকে স্পষ্ট করিতে চাহেন নাই। 'টেম্পেষ্ট' নাটকে দেখি মানুষ নিয়তিকে বশ করিয়াছে—ম্যাজিকের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা নহে। তাই প্রস্পেরো নিজে তাঁহার বিজয়ে উল্লসিত হয়েন নাই; তাঁহার যাদুদণ্ড তিনি জলে নিক্ষেপ করিয়া বিদায় লইয়াছেন। হার্ডির উপন্যাসে দেখি দেবতারা সভা করিয়া বসিয়া আছেন এবং মানবজীবনের ব্যর্থতা, অপূর্ণতা, প্রয়াস ও তাহার পরিসমাপ্তি লইয়া কৌতুক করিতেছেন। এইখানেও দেবতার খেয়াল ও মানবের প্রবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বাহির করার চেষ্টা হয় নাই। দেবতারা পরিহাসপ্রিয়; তাঁহাদের ইচ্ছা কেমন করিয়া নরনারীর জীবনের প্রতি অণু পরমাণুতে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া দেওয়ার মত ধৈর্য্য তাঁহাদের নাই।

* অন্যান্য কাহিনীতে ও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। শুধু ক্যাসাণ্ড্রার জ্ঞান খুব স্পষ্ট। কিন্তু ক্যাসাণ্ড্রার কথা কেহই শোনে না।

বঙ্কিমচন্দ্র অন্য রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসে মানবের জ্ঞান খুবই স্পষ্ট; সুতরাং তাহার পদস্খলন অধিকতর শোকাবহ। ইহাতে নিয়তির অনতিক্রমণীয়তা অতিশয় তীব্র হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানুষ সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিলেও নিয়তির হাত হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই। এই দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে বঙ্কিম-প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ মনোরমার কাহিনীতে নহে, কুন্দনন্দিনীর কাহিনীতে। কালানুক্রমিক বিচারেও দেখা যায় যে 'বিষবৃক্ষ' রচিত হইয়াছিল 'মৃণালিনী'র অব্যবহিত পরেই। উপন্যাসের প্রারম্ভেই দেখি যে, কুন্দনন্দিনী স্বপ্নে তাহার মায়ের নিকট হইতে নির্দ্দেশ পাইল যে দুইটি লোকের নিকট হইতে তাহাকে দূরে থাকিতে হইবে। এই আকাশ-বাণীর সার্থকতাই সমস্ত উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। কুন্দ সমস্তই জানিত, তাহার দুর্ভাগ্য কেমন করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিতেছিল ইহাও সে দেখিতে পাইতেছিল। কিন্তু সে পরিত্রাণ পায় নাই। সমস্ত জানিয়াও যে সে নিজেকে উদ্ধার করিতে পারে নাই তাহার প্রধান কারণ তাহার দুর্দ্দমনীয় প্রণয়; সে বুঝিয়াছে যে নগেন্দ্রনাথকে পাওয়া যত অসম্ভবই হউক না কেন এবং ইহাতে সূর্য্যমুখীর প্রতি যত অবিচারই করা হউক না কেন, নগেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া যাইতে সে কিছুতেই পারিবে না। নগেন্দ্রনাথেরও সেই একই অবস্থা। তিনি স্বপ্নে কোন আদেশ পান নাই। কিন্তু তাঁহার পক্ষে এরূপ প্রত্যাদেশের কোন প্রয়োজনও ছিল না। তিনি পরিপক্কবুদ্ধি; কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্তির ফল কি তাহা তিনি বেশ জানেন কিন্তু জানিয়াও নিস্তার নাই। নিয়তির চক্র অনিবার্য্য বেগে চলিয়া যাইবেই,

কেহ তাঁহাকে রোধ করিতে পারিবে না। নগেন্দ্রনাথ স্রোতে গা ঢালিয়া দেন নাই; নিজেকে সংযত করিতে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তাঁহার প্রবৃত্তি তো শুধু অন্তরস্থ প্রবৃত্তিমাত্র নহে; ইহা দৈবশক্তির বাহন। সংযমেচ্ছার জন্ম বুদ্ধিতে কিন্তু নিয়তির গতি ফিরাইবার চেষ্টা বাতুলতা। মনোরমা ইহাকে তুলনা করিয়াছে মত্ত হস্তীর সঙ্গে:—"ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন; এক দাম্ভিক মত্ত হস্তী তাহার বেগ সংবরণ করিতে গিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহার অর্থ কি? গঙ্গা প্রেমপ্রবাহস্বরূপ.........যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, সেও প্রণয়কে মস্তকে ধারণ করিতে পারে.. ... দাম্ভিক হস্তী দম্ভের অবতারস্বরূপ, সে প্রণয়বেগে ভাসিয়া যায়।"

'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম যুগের শেষ উপন্যাস। 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'রাজসিংহ'—এই চারিখানি উপন্যাস দ্বিতীয় যুগের। 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গরীয়' ও 'রাধারাণী'—ইহাও এই যুগেই রচিত হইয়াছিল। এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্র মানবের শক্তিতে ক্রমশঃ আস্থাবান্ হইয়াছেন এবং নিয়তির অলঙ্ঘ্যতা সম্পর্কে তাঁহার বিশ্বাস যেন শ্লথ হইয়া উঠিয়াছে। 'ইন্দিরা', 'রাধারাণী', 'রজনী' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ নিয়তির পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং শেষোক্ত গ্রন্থে ভ্রমর নিজেই ভবিষ্যতের ঘটনার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন। 'তুমি আবার আসিবে, আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব'—ইহা খণ্ডিতা নায়িকার অভিশাপ নয়, সতীনারীর দিব্যদৃষ্টি। সূর্য্যমুখী ভ্রমরের মত অভিমানিনী নহেন, কিন্তু তাঁহার এই দিব্যদৃষ্টি নাই। 'যুগলাঙ্গরীয়'কে জনৈক বিদগ্ধ সমালোচক 'ফলিত জ্যোতিষ'

আখ্যা দিয়াছেন। এই আখ্যা অসম্পূর্ণ। 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে 'সীতারাম' পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়খানি উপন্যাসে জ্যোতির্গণনার কথা লিখিয়াছেন, প্রত্যেকখানিতেই দেখা যায় যে সেই গণনা সফল হইয়াছে। 'যুগলাঙ্গরীয়' গল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে, যে বিপদের সম্ভাবনা ছিল জ্যোতিষী ও প্রণয়িযুগলের শুভানুধ্যায়ীরা কৌশল করিয়া তাহা এড়াইয়া গিয়াছেন। যাহা ট্র্যাজেডি হইতে পারিত তাহা রোমান্সে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এই যুগের রচনার মধ্যে 'চন্দ্রশেখর' ও 'রাজসিংহ' উপন্যাসের বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। এই দুইখানিতে জ্যোতিষগণনা ও নিয়তির অনিবার্য্যতার চিত্র আছে। কিন্তু এই চিত্রে এই যুগের রচনার বৈশিষ্ট্যও মুদ্রিত রহিয়াছে। প্রথম দেখিতে পাই মূল কাহিনীতে নিয়তির পদক্ষেপ শোনা যায় না; প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের কাহিনী বিশেষ-ভাবে তাহাদেরই কাহিনী; রাজসিংহ নিজের শৌর্য্যের বলেই যুদ্ধ করিয়াছেন, তিনি দৈবশক্তির বাহন নহেন। দৈবশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে মবারক ও দলনী, যাহারা উপন্যাসে অপেক্ষাকৃত অপ্রধান। তাহাদের কাহিনীও পশুপতি-মনোরমা বা নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর কাহিনী হইতে বিভিন্ন। দলনী যে যুদ্ধের সময়ে বিষ খাইয়া মরিল ইহার কারণ নবাবের অপরিসীম ব্যস্ততা। নিয়তি নবাব বা দলনীর কোন দুর্ব্বার প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করে নাই, অবস্থাবিপর্য্যয়ের সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে। নবাব চেষ্টা করিলে এই দুর্ভাগ্যের প্রতিরোধ করিতে পারিতেন না এমন নহে; তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন এবং বিশ্বাসঘাতকের ব্যবহার আলোচনার অবকাশ পান নাই। মবারক-দরিয়া-জেবউন্নিসার কাহিনীও

এইরূপ। মবারক দুর্দমনীয় প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়াছিল। সে দরিয়াকে পরিত্যাগ করিতে চাহে নাই এবং যে অবস্থায় সে বাদশাহজাদীকে বিবাহ করিল তাহা তাহার আয়ত্তের অতীত ; তাহার মৃত্যুও আসিল একান্ত অতর্কিতভাবে।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে—শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত। শৈবলিনী প্রতাপকে যেরূপ ভালবাসিত, সেইরূপ ভালবাসার তুলনা বিরল। কিন্তু ইহার সঙ্গে নিয়তির কোন সম্বন্ধ নাই এবং যে শৈবলিনী প্রতাপকে পাইবার সুদূর সম্ভাবনায় ফষ্টরের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়াছিল সে-ই প্রতাপকে ছাড়িয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিতে শিখিল। মানুষের ক্ষমতায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশ্বাস নবলব্ধ। লবঙ্গ-লতার সন্ন্যাসী যোগবলে শচীন্দ্রকে রজনীতে আসক্ত করিয়াছিলেন এবং চিকিৎসা বিদ্যার সাহায্যে অন্ধকে চক্ষুদান করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর এই যোগবলও মানুষের বিদ্যা, কেহ বলিবেন ইহা মেস্‌মেরেজিম্। রামানন্দ স্বামীর শক্তি নিয়তিকে মানিয়া লইয়া সুপ্ত প্রণয়কে জাগ্রত করে নাই, অসংযত প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়াছে, বিরূপতাকে অনুরাগে রূপান্তরিত করিয়াছে। কিন্তু এই শক্তি কি অলৌকিক যোগবল না psychic force ? ইহাও দেখি যে শৈবলিনীকে প্রায়শ্চিত্তের যে বিধি দেওয়া হইয়াছিল তাহার মধ্যে অতি-প্রকৃত কিছুই নাই ;—তাহা আত্মসংযমের সহজ, সরল পথ। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এইখানে বলিতেছেন, "মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ—বাঁধিয়া একটি পথ ছাড়িয়া দেও—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে ? সেই একপথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টির এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি? নিয়তির সঙ্গে মানব-প্রবৃত্তির ঐক্য বঙ্কিমচন্দ্র দেখিতে পাইয়াছিলেন কল্পনার সাহায্যে। ইহার পর তিনি বুদ্ধি দিয়া এক ধর্ম্মতত্ত্বের সন্ধান পাইলেন যাহাতে বিচারহীন বিবেচনাহীন নিয়তির নিষ্ঠুরতা পরিত্যক্ত হইল। তাঁহার ভগবদ্ভক্তি দৃঢ় হইল। তিনি জ্ঞান, নিষ্কাম কর্ম্ম ও ভক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেন। অভিরাম স্বামী ও মাধবাচার্য্যের জ্ঞান ও শক্তি অসম্পূর্ণ; কিন্তু রামানন্দ স্বামীর ক্ষমতার অবধি নাই; তিনি মানুষের মনের গতিও ফিরাইতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু যে ভক্তিবাদী তাহাই নহে; তাঁহার মনে নিরীশ্বর কোমৎদর্শনও গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। তাই রামানন্দ স্বামী সন্ন্যাসী হইয়াও ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করেন না, নিজে জ্যোতিষগণনা পর্য্যন্ত করেন না, পরলোকসম্বন্ধে অজ্ঞতা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম্মের নিষ্কাম কর্ম্ম ও ভক্তিতত্ত্ব এবং নিরীশ্বর কোমৎ দর্শনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার সৃষ্ট সন্ন্যাসী কর্ম্মী, কর্ম্মী নিষ্কাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় যুগের উপন্যাস তিনখানি 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'। ইহাদের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য সূচিত হইয়াছে। 'আনন্দমঠ' স্বদেশীর প্রবর্ত্তক; সন্তানসম্প্রদায় কোন বিশেষ লোকের সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টি দেয় নাই; তাহারা দেশের সন্তান। এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় দেখি যে মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন —ভক্তি। উপসংহারে চিকিৎসক বলিতেছেন মুক্তি পাওয়া যায়—জ্ঞানে। জ্ঞান ও ভক্তির তাৎপর্য্য লইয়া তর্ক উঠিতে পারে এবং বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদের সামঞ্জস্য করিতে পারিয়াছেন কিনা তাহাও বিচার-

সাপেক্ষ, কিন্তু একটি বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা বিচারহীন নিয়তিকে ছাড়িয়া দিয়া মানুষের শক্তিকে আশ্রয় করিয়াছে। এইবার মানুষ নিজেই তাহার ভাগ্যনিয়ন্তা হইবে।

'দেবী চৌধুরাণী'তে মানুষের শক্তিতে বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইয়াছে এবং ঈশ্বরে ভক্তির সঙ্গে এই বিশ্বাসের সমন্বয় করা হইয়াছে। প্রফুল্ল বাঙ্গালী ঘরের বৌ অথচ সে সাক্ষাৎ দেবী। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকে মানুষ বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন আবার মানবীকে দেবীর আসনে উন্নীত করিয়াছেন। প্রফুল্লর শক্তির সীমা নাই। সে রাজত্ব করিয়াছে আবার গৃহিণী হইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে জড়প্রকৃতি পর্য্যন্ত তাহার উদ্ধারের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে। কোমৎ জড়প্রকৃতির অস্তিত্ব ও উপযোগিতা স্বীকার করিতেন, কারণ এই বিরুদ্ধ শক্তির উপস্থিতির জন্যই মানব সমাজবদ্ধ হয় এবং পরের উপকারের জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন দেয়। কিন্তু তিনি কখনও মনে করিতেন না যে জড়প্রকৃতি কোন বিশেষ সময়ে কোন বিশেষ লোকের উপকারের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করে। বঙ্কিমচন্দ্রও পূর্ব্বে এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন না। 'কপালকুণ্ডলা'য় (ও 'মৃণালিনী'তে) দেখিতে পাই যে প্রকৃতির বিশালতা, উন্মুক্ততা ও ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্যের সংস্পর্শে আসিয়া মানুষের চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; প্রকৃতি তাহার ছাপ মানুষের মনে মুদ্রিত করিয়া ফেলে। তবু সেই প্রকৃতি অনুভূতিহীন, চৈতন্যহীন। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে দেখিতে পাই বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতির ঔদাসীন্যের কথা বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। কিন্তু 'দেবী চৌধুরাণী'তে দেখি যে প্রকৃতির তাণ্ডবনৃত্যও মানুষের

প্রয়োজনানুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। দেবীরাণী যে রক্ষা পাইল তাহার কারণ ঠিক সঙ্কট মুহূর্ত্তে ঝড় উঠিল এবং সিপাহীদের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। ইহা নিয়তির কঠিন নিয়ম নহে, ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধান। "সময়ে মেঘোদয় ঈশ্বরের অনুগ্রহ, অবশিষ্ট ভক্তের নিজ দক্ষতা।"

'সীতারাম' বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। এইখানে নিষ্কাম তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে জয়ন্তী ও শ্রীর বাক্য ও কর্ম্মে এবং উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি কেমন করিয়া মানুষকে পশুতে পরিবর্ত্তিত করে তাহারও চিত্র আঁকা হইয়াছে সীতারামের অধঃপতনে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে 'সীতারাম' তৃতীয় যুগের রচনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে প্রথম যুগের রচনার লক্ষণও আছে। জ্যোতির্গণনার সাফল্য এবং মানুষের বুঝিবার ভুল অতি বিশদভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। যাহাতে উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্র সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়াছেন এবং পাদটীকায় মূল সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীর সম্পর্কে দৈবজ্ঞ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল যে সে প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হইবে। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র 'প্রিয়' এই মনে করিয়া শ্রী স্বামীর নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু জ্যোতিষগণনা ব্যর্থ হইবার নহে; যে প্রিয়ের প্রাণহত্যার কারণ সে হইল সে প্রিয় তাহার স্বামী নহে, ভ্রাতা। জ্যোতিষগণনা অভ্রান্ত, ভ্রান্তি শুধু মানুষের বিচারে। অভিরামস্বামী মোগলসেনাপতি সম্পর্কে এবং মাধবাচার্য্য পশ্চিমদেশীয় বণিক সম্পর্কে যে ভুল করিয়াছিলেন এ ভুল তাহারই অনুরূপ। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ রচনা ও প্রথম রচনার মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। যে নিয়তি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া

আসিতেছিল তাহা পুনরায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। 'সীতারাম' উপন্যাসের একটি প্রধান ত্রুটিও এই যে এইখানে পরস্পর-বিরোধী ভাবধারার মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা হইয়াছে। সর্ব্বজয়ী নিষ্কাম ধর্ম্ম আর নিয়তির অনতিক্রম্য বিধান—ইহাদের মধ্যে কাহাকে কতটুকু মানিয়া লইব, মানবজীবনে ইহাদের কাহার স্থান কোথায় তাহা স্পষ্ট হয় নাই।

(৩)

বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্য্য বলিতে কি বুঝিতেন এবং তাহার সেই অনুভূতি কেমন করিয়া কাব্যে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহার বিচারের পরে সাহিত্যসৃষ্টির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য (তাঁহার মতে) সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। (লোকশিক্ষা বা মনুষ্যের চিত্তের উৎকর্ষসাধন কাব্যের অন্যতর প্রধান উদ্দেশ্য।) বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের মধ্য দিয়া ধর্ম্মতত্ত্বপ্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমতের বৈশিষ্ট্য কি? ভারতবর্ষ বহু ধর্ম্মাবলম্বীর দেশ। তাই (বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটি ধর্ম্ম প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন যাহা 'অসাম্প্রদায়িক', সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন।)* জলের যেমন কোন রং নাই, ঈশ্বরেরও তেমন কোন জাতি নাই। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার অনেক পথ আছে। কেহ কেহ পথকেই

---

* হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যে সমষ্টি তাহা পৃথিবীর লোকসংখ্যার অতি ক্ষুদ্রাংশ। জগদীশ্বর কি তাহাদের কোন ধর্ম্মবিহিত করেন নাই। কোটি কোটি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া কেবল ভারতবাসীর জন্য ধর্ম্মবিহিত করিয়াছেন আর সকলকেই ধর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন? ভগবদ্ভক্ত ধর্ম্ম কি হিন্দুর জন্যই, ম্লেচ্ছ কি তাঁহার সন্তান নহে?"

বড় করিয়া দেখেন, সেইজন্য ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে।' বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। প্রথমতঃ, তিনি সাকারবাদ, জাতিভেদ' প্রভৃতি অপচারকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ঈশ্বর নিরাকার, তিনি একক অথচ সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং সকল মানুষই তাঁহার কাছে সমান। দ্বিতীয়তঃ, বঙ্কিমচন্দ্র লোক বিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেও, কোন মানুষকে দেবতার অংশ বলিয়া ভজনা করার বিরোধী ছিলেন। ইহা হইতে অপর ধর্ম্মে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। খৃষ্ট ধর্ম্মের এই সঙ্কীর্ণতার কথা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন এবং ইসলামধর্ম্মমতাবলম্বীদের পরধর্ম্মবিদ্বেষেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য তিনি কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণকে আদর্শ মানুষ হিসাবে বিচার করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, তিনি শাস্ত্রোক্ত বিধিকে অভ্রান্ত বা অপরিবর্ত্তনীয় মনে করিতেন না। বৈদিক যাগযজ্ঞকে তিনি তাচ্ছিল্য করিয়াছেন এবং শাস্ত্রোক্তিকে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা হিসাবে বিচার করিয়াছেন, ধর্ম্ম বলিয়া শিরোধার্য্য করেন নাই। মল্লিনাথকে বড় করিয়া দেখিলে কালিদাস ছোট হইয়া পড়েন।

অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা সার্ব্বজনীন প্রবৃত্তি খুঁজিয়াছেন। তাহাই তাঁহার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার গোড়ার কথা। তিনি দেখিয়াছেন সবাই সুখের অন্বেষণ করে। সকল দেশে, সকল সময়ে, সকল অবস্থায় এই অন্বেষণ মানুষের মনকে বিচলিত করিয়াছে। যাহা সবাই খুঁজিতেছে, কেহই পাইতেছে না তাহার সন্ধান দিতে পারিলেই প্রকৃত ধর্ম্মেরও স্বরূপ আবিষ্কৃত হইবে। ধর্ম্ম তাহাকেই বলে যাহা অবলম্বন করিয়া

মানুষ বাঁচিতে চাহে। (বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়াছেন সকল মানুষই সুখ কামনা করে কিন্তু কেহই পায় না।) কেহই নিশ্চিত জানে না কিসে সে সুখী হইবে। তাই তিনি বিচার করিয়া দেখিয়াছেন কিসে মানুষ সুখী হইতে পারে। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই তিনি প্রশ্ন করিলেন, দুঃখ কি? দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় হইল, সুখ কি? তাঁহার উপন্যাসেও দেখি মতিবিবি আগ্রায় সুখান্বেষণে বিফলমনোরথ হইয়া সপ্তগ্রামে যাইয়া অতি দীনভাবে নবকুমারের প্রণয়ভিক্ষা করিতেছেন; মনে করিতেছেন, ইহাতেই সুখী হইবেন। কুন্দনন্দিনী ও নগেন্দ্রনাথ মনে করিয়াছিল যে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইলেই তাহারা সুখী হইবে, কিন্তু দেখিল যে সকল সুখেরই সীমা আছে। অধিকাংশ উপন্যাসেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই প্রশ্নেরই আলোচনা করা হইয়াছে যে কি উপায়ে মানুষ সুখী হইতে পারিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাকে খুব বেশী করিয়া সাড়া দিয়াছিল নিয়তির দুরতিক্রম্য বিধান আর নিয়তিকে তিনি সকল সময়েই মানুষের প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িত করিয়া দেখিয়াছেন। আকাশবিহারী দৈবশক্তি দুরতিক্রম্য হইতে পারে। কিন্তু তাহার যে অংশ মানবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহাকে কি বশীভূত করা যায় না? তাহা হইলে কি সুখ পাওয়া যায় না? এই প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রের মনে জাগরিত হইয়া থাকিবে। এই সমস্যার এই দিক্ তাঁহার মনকে দোলা দিয়াছে বলিয়াই তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের উপন্যাসে নিয়তির আবির্ভাব পূর্ব্বাপেক্ষা বিরল।

সুখ কি? এই প্রশ্ন শুধু বঙ্কিমচন্দ্রই আলোচনা করেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় বিশেষ করিয়া ইংরেজি নীতিদর্শনের

ইহা একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই প্রশ্নের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উত্তর এই যে সুখ প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি। কবি কবিতা লিখিয়া সুখী, মাতাল মদ খাইয়া সুখী, লম্পট ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে সুখী। এমনি করিয়া যাহার যাহাতে কামনার পরিতৃপ্তি হইবে সে তাহাই করিবে। কিন্তু এই সহজ উত্তরকে গ্রহণ করিলে সমস্ত নীতিদর্শনকে জলাঞ্জলি দিতে হয়। ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিলে সমাজ কেমন করিয়া চলিবে? রাম শ্যামের ধন কাড়িলে সুখী হইবে, শ্যাম রামের ধন কাড়িলে সুখী হইবে—ইহাতে সমাজের মঙ্গল রক্ষা হইবে কি? সমাজের কথা ছাড়িয়া দিয়া শুধু ব্যক্তির জীবনেও এই ব্যবস্থা মঙ্গলময় হইবে না। মাতাল অবিরত মদ্যপানে সুখী হয়। প্রত্যেক মাতালই মদ খায় সুখের জন্য এবং যখন মদ পায় না তখন অসুখী বোধ করে। তাহার পক্ষে মদ্যপান সুখকর কিন্তু কল্যাণকর নহে। কল্যাণ ও সুখ কি এক বস্তু? উনবিংশ শতাব্দীর হিতবাদীরা ব্যক্তিগত সুখ ও সামাজিক কল্যাণের সামঞ্জস্য করিয়াছেন এই বলিয়া যে প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখই জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই বন্দোবস্ত অগ্রাহ্য। কারণ ব্যক্তির সুখ ও সমাজের মঙ্গলের মধ্যে সংযোগ আছে কিনা ইহা তাঁহারা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। বেন্থাম বলিয়াছেন, আমোদ সমান হইলে, কাব্যের এবং পুশ্পিন খেলার একই দর! সুতরাং সুখের পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া চলিলে সমাজ অচল হইবে। এইজন্য শ্রেষ্ঠ হিতবাদীরা সুখের তারতম্য করিয়াছেন। সকল সুখ সমান দরের নহে। যে সুখে সমাজের মঙ্গল হয় তাহাই উঁচুদরের সুখ। মানবের মঙ্গলসাধনই

জীবনের উদ্দেশ্য।)এই তর্কে একটি মৌলিক ত্রুটি রহিয়া গেল। সুখ ব্যক্তিগত মনের অবস্থা। যাহাতে পরের মঙ্গল হয় তাহা যে আমার ভাল লাগিবেই এই কথা মনে করিবার কি কারণ আছে? যাহা একান্তভাবে নিজের অন্তরের জিনিষ তাহাকে বাহিরের মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলে চলিবে কেন? কোমৎ ঈশ্বরকে পরিবর্জ্জন করিয়া তাঁহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে মানবতাকে ঈশ্বরের স্থানে স্থাপিত করিয়া পুরোহিতের পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধির বিজয়-অভিযান এইভাবে বুদ্ধির পরাজয়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বাহিরের শক্তির কাছে ব্যক্তি নতশির হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র হিতবাদের সঙ্কীর্ণতা উপলব্ধি করিয়া অন্যভাবে এই সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছেন। (তিনি মনে করেন মানুষের সুখ মনুষ্যত্বের বিকাশে;) বৃত্তির স্ফূর্ত্তি আর প্রবৃত্তির চরিতার্থতা এক হইলেই সুখ। সামঞ্জস্যই সুখ। মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তি ছাড়া যে সুখ তাহা ভ্রান্তিমাত্র; তাহা রোগীর কুপথ্যে রুচির মতই অমঙ্গলকর ও পরবর্জ্জনীয়। সুতরাং তিনি সুখের মাপকাঠি মনের ভিতরেই খুঁজিয়াছেন; শৃঙ্খলা বা পরের মঙ্গলের কথা পরে আসিয়াছে। মানুষের সুখ মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তিতে এই কথা বলিলে সমস্যার সম্পূর্ণ উত্তর হইল না। কারণ ইহার পরেই প্রশ্ন উঠিবে, মনুষ্যত্ব কি? বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা দিয়াছেন এই বলিয়া যে(যাহাতে মানুষের সকল বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন হয় তাহাই সুখ—শরীর ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশেই মনুষ্যত্ব।) ইহা মানুষের সুখ এবং ইহাই তাহার ধর্ম্ম।

কিন্তু ইহাতেও ধর্ম্মতত্ত্ব স্পষ্ট হইল না, কারণ নানা প্রবৃত্তির

মধ্যে সামঞ্জস্য করিব কোন্ সূত্র অনুসারে? কে বলিয়া দিবে যে কতটুকু বিজ্ঞানচর্চ্চা করিলে ও কতক্ষণ শতরঞ্চ খেলিলে জ্ঞানার্জ্জনী ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইবে? এবং যে অনুশীলন রামের পক্ষে প্রযোজ্য তাহা কি শ্যামের পক্ষে ও সুসঙ্গত হইবে? ধর্ম্ম ব্যক্তিগত পার্থক্য স্বীকার করিয়া লইবে, কিন্তু তাহার মধ্যে কি এমন একটা বৈশিষ্ট্য থাকিবে না যাহা সার্ব্বজনীন? বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনের এমন কতকগুলি মাপকাঠি খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিয়াছেন যাহা সকল দেশে, সকল কালে, সকল লোকের উপরে প্রযোজ্য। প্রথমতঃ, তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী। ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় গুরু শিষ্যকে বলিতেছেন যে তিনি পরকাল মানিলেও তাঁহার আলোচনা হইতে পরকালের সুখদুঃখকে বাহিরে রাখিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু যদি শিষ্য ঈশ্বর না মানেন তাহা হইলে আলোচনা অচল। বঙ্কিমচন্দ্রের মত এই যে সকল কর্ম্মকে ঈশ্বরোদ্দিষ্ট করিতে হইবে। ঈশ্বরে ভক্তিই অনুশীলনের নিয়ামক হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বর আকাশ-বিহারী দেবতামাত্র নহেন, তিনি নিখিল বিশ্বের মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন, সকল মানবের চেতনার মধ্যে তিনি বিরাজমান। সুতরাং ঈশ্বরে ভক্তি পরিপূর্ণ হইলে সেই ভক্তি লোকপ্রীতি, দেশসেবা ও জীবে দয়ায় রূপান্তরিত হইবে। *

---

*এইখানে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। খৃষ্টানরা ঈশ্বরকে জগৎ হইতে পৃথক করিয়া দেখেন। সুতরাং তাঁহাদের ধর্ম্মে ঈশ্বরে ভক্তি ও লোকে প্রীতির মধ্যে কোন গভীর সংযোগ নাই। নিরীশ্বরবাদী কোমৎ-ধর্ম্ম মানবতাকে দেবতার আসনে বসাইয়াছে। কিন্তু এই মানবতা অস্পষ্ট; এই

বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মের ভক্তিমূলক যে সমাধান দিয়াছেন তাহার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। ঈশ্বরের বিচার এই জগতে খুব স্পষ্ট নহে, কাজেই শুধু তাহারই উপর নির্ভর করিতে হইলে পরকালের আশ্রয় নেওয়া দরকার হয়। অথচ আলোচনাকে যথেষ্ট বাস্তবতা, বিস্তৃতি ও স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র পরকালকে বাদ দিয়াছেন। পরকালকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের বিধানের উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করা সমীচীন হইবে না, বোধ হয় ইহাই মনে করিয়া তিনি তাঁহার ধর্মের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে ভক্তিমূলক করেন নাই; জ্ঞানের মধ্যেও ইহার ভিত্তি খুঁজিয়াছেন। জ্ঞান নিরপেক্ষ বিচারক। জ্ঞানের সাহায্যে সুখের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হইতে পারে এবং জ্ঞানই প্রকৃত মুক্তির সন্ধান দিতে পারে। জ্ঞানী ব্যক্তি দেখিতে পাইবেন যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে যে সুখ তাহা ক্ষণিক এবং পরে তাহা দুঃখেরই কারণ হইয়া পড়ে। সুতরাং সেই সুখই প্রকৃত যাহা স্থায়ী। তবে কি ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ করিতে হইবে? ইন্দ্রিয়ের পথ একেবারে রুদ্ধ করিলে মানুষের স্বাস্থ্যহানি হইবে, বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ব্যাহত হইবে এবং জগতের সৃষ্টি বাধা পাইবে। সুতরাং ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিলে চলিবে না; তাহাকে সংযত করিতে হইবে। কোন্ প্রবৃত্তির কতটুকু অনুশীলন করিলে মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি হইবে এবং কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট হইবে, কোন্ সুখ স্থায়ী, কোন্

ধর্ম্মের ভিত্তি অতিশয় দুর্ব্বল। মানবপ্রীতি কখনও আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হইতে পারে না। হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বরে ভক্তি ও লোকপ্রীতি অভিন্ন।

সুখ অস্থায়ী অথবা দুঃখেরই নামান্তর মাত্র তাহার নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে জ্ঞানমার্গে। সুখদুঃখের কোন বিশিষ্ট সত্তা নাই, ইহারা মনের বিশিষ্ট অবস্থামাত্র। আত্মার এমন অনুশীলন করিতে হইবে যাহার ফলে মঙ্গলকর কার্য্যই রুচিকর হইয়া পড়ে। সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইলেই আত্মার এই চরম পরিণতি সম্ভব। এই অনাসক্তি লাভ করিতে পারেন ভক্তিমান্ জ্ঞানী ব্যক্তি, যিনি সকল সুখেরই স্বরূপ চিনিতে পারিয়াছেন ও সীমা দেখিতে পাইয়াছেন এবং যিনি সকল স্বার্থ ঈশ্বরের কাছে বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছেন। ঈশ্বরে ভক্তি ও পরিপূর্ণ জ্ঞান উভয়েরই চরমাবস্থা—নিষ্কাম ধর্ম্ম।

এই ধর্ম্মে লৌকিক আচার, যাগযজ্ঞ প্রভৃতির স্থান নাই বলিলেই চলে। বঙ্কিমচন্দ্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের সন্ধান করিয়াছেন। সুতরাং কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপকে তিনি বড় করিয়া দেখিতে পারেন নাই। এই সকল আচার-অনুষ্ঠান কাম্য কর্ম্ম; অর্থাৎ পুণ্য-লোভী স্বর্গলাভের আশায় এই জাতীয় কর্ম্ম করেন। প্রকৃত ধর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের ধর্ম্ম, যাহা মানুষকে অনাসক্ত, যোগস্থ করে। কিন্তু শুধু ভক্তি ও জ্ঞানকে বড় করিয়া দেখিলেও ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবে। ভক্তি বৈরাগ্যের প্রশ্রয় দেয়। জ্ঞান কর্ম্মের মূল্য নির্দ্ধারণ করে, কিন্তু কর্ম্ম করিবার প্রেরণা জোগাইতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে কর্ম্মের প্রেরণা আসিবে 'স্বধর্ম্ম' হইতে। 'স্বধর্ম্ম' কথাটা গীতায় পাওয়া যায় এবং হিন্দুধর্ম্মে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সাহায্যে ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র স্বধর্ম্মের এক অভিনব সংজ্ঞা দিয়াছেন, কারণ তাঁহার মতে প্রকৃত ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন, অসাম্প্রদায়িক। তাঁহার মতে, যে যে সমাজে

ও যে কালে জন্মিয়াছে তাহার সেই সমাজের ও কালের উপযোগী কতকগুলি কর্ম্ম আছে ; তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম এবং জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে এই স্বধর্ম্মই তাহাকে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। স্বধর্ম্মের স্বরূপ নির্ভর করে সমাজের অবস্থার উপর। সুতরাং ইহার সম্যক্ অনুষ্ঠানের জন্য বহির্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক—পরিপূর্ণ অনুশীলনের জন্য ব্যবহারিক বিজ্ঞানের আলোচনা প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচারিত ধর্ম্মের যে বিশ্লেষণ ও বর্ণনা দেওয়া হইল তাহা হইতে দেখা যাইবে যে ইহার প্রধান লক্ষণ—সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য। ভক্তিমূলক বৈষ্ণবধর্ম্ম একদেশদর্শী—ইহা মানুষকে ভাববিলাসী, নির্জ্জীব নির্বীর্য্য করিয়া দেয়। জ্ঞানাশ্রয়ী ধর্ম্মের পরিচয় পাই সাংখ্যদর্শনে এবং ইয়োরোপীয় পজিটিভিজ্‌ম্ ও বিজ্ঞান চর্চ্চায়। অপবর্গপ্রয়াসী সাংখ্য দর্শনের ভিত্তি অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান, ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান বহির্বিষয়ক জ্ঞানের অনুসন্ধান করে। উভয় ধর্ম্মই ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে, সুতরাং উভয়ই অসম্পূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র এই তিন শ্রেণীর ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিতে চাহিয়াছেন। তিনি হিতবাদী, কিন্তু তাঁহার হিতবাদের মূলে রহিয়াছে সর্ব্বব্যাপী নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস। তিনি জ্ঞানের মহিমা প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু সাংখ্য প্রভৃতি যে সমস্ত দর্শন শুধু জ্ঞানাশ্রয়ী তাহাদের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে তিনি সচেতন। যে জ্ঞান কর্ম্মে—নির্বিচার আচারে নহে—অভিব্যক্তি পায় তিনি তাহাকেই শিরোধার্য্য করিয়াছেন। জ্ঞান ও কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হইবে ভক্তিতে, কর্ম্ম ও ভক্তির মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করিবে জ্ঞান। যেখানে এই যোগসূত্রের অভাব হইবে, সেই খানেই ভক্তি হইবে নির্জ্জীব আর কর্ম্মও তুচ্ছ, সঙ্কীর্ণ অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত

হইবে। এই সামঞ্জস্যমূলক ধর্ম্মের পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়াছে গীতায় এবং ইহার শ্রেষ্ঠ প্রতীক শ্রীকৃষ্ণ। গীতা হিন্দুর ধর্ম্ম এবং কৃষ্ণ হিন্দু। এই হিসাবে—এবং শুধু এই হিসাবেই—হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মে সঙ্কীর্ণতা নাই। ইহা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে প্রযোজ্য। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, ইহাকে কোন হিন্দু হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইবেন না।

(৪)

বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মের এইরূপ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এখন তাঁহার ধর্ম্মের অসম্পূর্ণতা ও ক্রটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। তিনি সুখ ও সামঞ্জস্যের উপর তাঁহার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার তর্ক এইরূপ:—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির যে সুখ তাহা প্রকৃত সুখ নহে। প্রকৃত সুখ বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলনে। সুসমঞ্জস অনুশীলনের মাপকাঠি খুঁজিতে যাইয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, স্থায়ী সুখ। এই তর্ক যেখানে আরম্ভ হইয়াছিল সেইখানেই শেষ হইয়াছে। সুখের ভিত্তি খুঁজিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনকে পরিক্রম করিয়া পুনরায় সুখকেই নির্দ্দেশ করিতেছেন। ন্যায়শাস্ত্রে ইহাকে বলে চক্রক; আর ইউরোপীয় তর্কশাস্ত্রে ইহাকে বলে বৃত্তের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ। শুধু স্থায়ী কথাটি যুক্ত হইয়াছে; প্রকৃত সুখ হইতেছে স্থায়ী সুখ। এখন প্রশ্ন হইবে কোন্ সুখ স্থায়ী? কতদিন পর্য্যন্ত ভোগ করিলে তাহাকে স্থায়ী বলা যায়? বঙ্কিমচন্দ্র ইহার কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। তিনি বলেন ইন্দ্রিয়জয়ে যে সুখ

তাহাই স্থায়ী। আবার সেই পুরানো জায়গায় ঘুরিয়া আসিলাম। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির সুখ স্থায়ী নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই তর্কে আর একটি মৌলিক ত্রুটি আছে। কামনার পরিতৃপ্তিতে সুখ ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু আপত্তি করিয়াছেন যে ইহা স্থায়ী নহে। কিন্তু নিবৃত্তিতে যদি পরিতৃপ্তি বোধ না হয় তাহা হইলে তাহাকে কি সুখ বলিব? বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে সুখ মানসিক অবস্থামাত্র। সুতরাং ইন্দ্রিয়জয়ে গৌরব থাকিতে পারে। তাহাতে দেশের ও দশের উপকার হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে মন যদি সুখ অনুভব করিতে না পারে তাহা হইলে উপায় কি? এই যুক্তির যাথার্থ্য অনুভব করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন যে দয়া, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতির পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলে তাহাদের সুখজনকতা বৃদ্ধি পাইবে। এই পুনঃ পুনঃ অনুশীলন কি অনেক সময়ে পুনঃ পুনঃ আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর নহে? যে কোন বিষয়ের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলে তাহা অপেক্ষাকৃত সহনীয় ও মনোরম হয়। ইহাকে সুখ বলা শব্দের অপপ্রয়োগ মাত্র। শোনা গিয়াছে দাসব্যবসায় যখন লুপ্ত করিয়া দেওয়া হইল, তখন অনেক দাস মুক্তিকে সানন্দে গ্রহণ করে নাই, তাহারা দাসত্বেই সুখী ছিল। দাসত্ব তাহাদের পক্ষে সুখকর ছিল, কিন্তু তাহাদের মঙ্গলের পরিপন্থী ছিল। ইহাই দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি। মঙ্গল ও সুখের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে যাওয়ার চেষ্টা ভ্রান্ত। ইহাদের মধ্যে প্রভেদ এই নহে যে একটি অল্পক্ষণ স্থায়ী এবং অপরটি বেশীক্ষণ স্থায়ী। ইহারা বিভিন্ন জগতের সামগ্রী।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের রচনা কি সাক্ষ্য দেয়? তিলোত্তমা সুখী হইয়াছিলেন, আয়েষা নিজের সুখ দুঃখ জগদীশ্বরে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কাহার জীবনের মূল্য বেশী? প্রতাপ ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছিলেন, সুখী হইয়াছিলেন কি? তাঁহার মৃত্যুর পর রামানন্দ স্বামী ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মহত্ত্বের প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারাও দাবী করিতে পারেন নাই যে প্রতাপ সুখী হইয়াছিলেন। প্রতাপের মৃত্যুর পর চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর জীবন হয়ত সুখময় হইয়াছিল কিন্তু যে সুখের জন্য এই বিরাট্ বিসর্জ্জনের প্রয়োজন তাহার মূল্য কতটুকু? আর প্রতাপের স্মৃতি কি ইহাদের মাঝখানে মধ্যবর্ত্তীর মত থাকিবে না? নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল ইন্দ্রিয়সুখ অন্বেষণ করিয়া দুঃখ পাইয়াছিলেন এবং এই দুঃখের প্রায়শ্চিত্তে কুন্দনন্দিনী ও রোহিণীর জীবন বলি দিতে হইয়াছে। ইঁহারা যদি ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিতেন তাহা হইলে বহু অকল্যাণ নিবারিত হইত; কিন্তু ইঁহারা সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারিতেন বলিয়া মনে করি না।

(৫)

বঙ্কিমচন্দ্র সুখকে শুধু কল্যাণের সঙ্গে মিলিত করেন নাই, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন এবং ইহার ফলে তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে সামাজিক অবস্থার দ্বারাই ব্যক্তিগত ধর্ম্ম নিয়মিত হয়। সামাজিক অবস্থা দেখিয়া সমাজ অনুমোদিত চতুর্ব্বিধ, পঞ্চবিধ কি ষড়বিধ কর্ম্মের মধ্যে যিনি যাহা গ্রহণ করেন তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, তাঁহার ডিউটি, তাঁহার

স্বধর্ম। এই ভাবে ব্যক্তির সুখ ও ধর্মকে তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিপূর্ণ স্ফূর্তিকে স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি বারংবার আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে তাঁহার আদর্শ মানব শ্রীকৃষ্ণ রিফর্মর ছিলেন না এবং মালাবারি প্রভৃতি রিফর্মরদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি নিজে সাম্যের পক্ষপাতী ছিলেন এবং এমন অনেক কথা বলিয়াছেন যাহা প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিরোধী। কিন্তু কোন লোক তাঁহার সমাজব্যবস্থার বিরোধিতা করিয়া স্বতন্ত্র হইয়া চলিলে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা অনুমোদন করিতে পারিতেন না। তাই তাঁহার আদর্শ নায়ক প্রতাপ সমাজব্যবস্থাকে মানিয়া চলিয়াছেন। প্রতাপ একবার শুধু সন্দেহ করিয়াছিলেন যে তাঁহার বিবাহ রূপসীর সঙ্গে না হইয়া শৈবলিনীর সঙ্গে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বিদ্রোহ করিবার সাহস তাঁহার হয় নাই। বিধবার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি থাকিলেও তিনি কুন্দনন্দিনী ও রোহিনীর জন্য পথ খুঁজিয়া পান নাই।

স্বধর্মের এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্রোহের অধিকারকে মানিয়া লইতে পারেন নাই। 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে তিনি রাজনৈতিক বিদ্রোহের কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু উভয় গ্রন্থেই শেষ কথা বিদ্রোহীর বিদ্রোহত্যাগ। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। বাস্তবিকপক্ষে সবাই যদি সমাজানুমোদিত কাজ করিল তাহা হইলে সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে কে? গুরু রাজভক্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করিলে শিষ্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে তাহা হইলে কি ঔরংজেবের বা দ্বিতীয় ফিলিপের মত নরাধম রাজার

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অসঙ্গত হইবে? উত্তরে গুরু বলিলেন, "কদাপি না।" কিন্তু বিদ্রোহের অধিকার কোথা হইতে আসিল, কাহার এই অধিকার বঙ্কিমচন্দ্র ইহা স্পষ্ট করেন নাই। শুধু তাহাই নহে। ঔরংজেবে হিন্দুর দেবমন্দির ধ্বংস করিতেন আর দ্বিতীয় ফিলিপ বিধর্ম্মীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেন। ইঁহাদের প্রজাপীড়ন খুব স্পষ্ট। সবাই একযোগে এই অত্যাচার সহ্য করে এবং একযোগে ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ বা বিদ্রোহ করিতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক পীড়ন অলক্ষিতে ব্যক্তির জীবনকে বিষময় করিয়া দেয়। খুব সূক্ষ্ম যাহাদের অনুভূতি তাহারাই ইহা উপলব্ধি করিতে পারে, তাহারাই সার্ব্বজনীন বিদ্রোহের অগ্রদূত। সমাজের বিরুদ্ধে বা রাজার বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযানই উন্নতির প্রথম সোপান। ইহার সমর্থন সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে মিলিবে কি করিয়া? বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রশ্নের কোন মীমাংসা করিতে পারেন নাই এবং অধিকাংশক্ষেত্রে ইহাকে এড়াইয়া গিয়াছেন।

বিদ্রোহের অধিকারকে বঙ্কিমচন্দ্র অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিতে পারেন নাই। ইহা বাদ দিলে তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক মতে অন্য কোন সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাই না। বঙ্কিমচন্দ্র রাজনীতিকে ধর্ম্মতত্ত্বের অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মতে, স্বাধীনতা সেই অবস্থা যাহা সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মাচরণের উপযোগী। কিন্তু তিনি কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে দেশপ্রীতিকে আবদ্ধ করিতে চাহেন নাই। তাঁহার কাছে ভারতবর্ষের প্রথম প্রশ্ন—একজাতীয়ত্বের প্রশ্ন। ঈশ্বর গুপ্তকে তিনি বিশেষ করিয়া প্রশংসা করিয়াছেন এই বলিয়া যে ঈশ্বর গুপ্তের এই বৃহত্তর

জাতীয়তাবোধ ছিল। যাহারা "আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি বা আপন আপন ধর্ম্মকে ভালবাসে" তাহাদের অনুরাগকে তিনি নিকৃষ্ট বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি নিজে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, কিন্তু হিন্দুরাজত্বের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রধান আপত্তি এই যে তথায় পীড়ন ছিল। তিনি হিন্দুর বাহুবল প্রমাণ করিতে বহু চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি চাহিয়াছেন সমগ্র ভারতবর্ষের ঐক্য। কমলাকান্ত এক জাতীয়ত্বের কথা বলিয়াছেন—সমগ্র হিন্দুজাতির ঐক্য। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি আরও প্রসারিত। তিনি মনে রাখিয়াছেন "ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদ, ভাষার প্রভেদ, বংশের প্রভেদ, ধর্ম্মের প্রভেদে নানা জাতি।" তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, "ঐক্যজ্ঞান কিসে থাকিবে?...বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাট, হিন্দু মুসলমান ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে?"

এই প্রশ্নের বঙ্কিমচন্দ্র একটা সদুত্তর দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহাকে আমরা স্বাধীনতা বলি তাহার প্রতি তিনি জোর দেন নাই। রাজা যে দেশীয়ই হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। তিনি মাপকাঠি করিয়াছেন—প্রজার সুখ। এই জন্য তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—আকবরের শাসনকালকে এবং বাঙ্গালার ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল সময় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর পাঠানশাসন। পাঠান ও মোগলদের আদিম বাসভূমি ভারতবর্ষ নহে এবং তাহারা হিন্দু নহে। কিন্তু ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি সঙ্কুচিত হয় নাই। বরং তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, যদি প্রথম জর্জ্জশাসিত ইংলণ্ডকে বা ত্রেজান শাসিত

রোমকে পরাধীন না বলা গেল তবে শাজাহাঁ শাসিত ভারতবর্ষকে বা আলিবর্দ্দী শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বলি কেন? তিনি মুসলমান রাজত্বের মধ্যে কুতবউদ্দিন ও ঔরংজেবের রাজত্বের নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার মতে তখন পরজাতিপীড়ন ছিল। ইংরেজ রাজত্বের বিচারও তিনি এই ভাবেই করিয়াছে। ইংরেজ রাজা বৈশ্যধর্ম্মাবলম্বী এবং তাহার ফলে দেশী বাণিজ্যের ক্ষতি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজরাজত্বে প্রধান রাজপুরুষগণ বিদেশী; সুতরাং উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাবান্ ভারতবাসীদের উন্নতির ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। তৃতীয়তঃ, ইংরেজ রাজত্বের কেন্দ্র ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ নহে। সুতরাং বিদেশের প্রয়োজনে ভারতবর্ষের অর্থ ব্যয়িত হয়। ইহা সত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ রাজত্বের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কারণ তিনি মনে করিতেন ইংরেজ রাজত্বে এ দেশীয় সাধারণ প্রজার সুখ বৃদ্ধি হইয়াছে। তাঁহার তর্কে ভুল থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহার মতের উদারতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই সাধারণ প্রজার সুখই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে মুখ্য জিনিষ। রাজনীতির আলোচনায় ইহাই তাঁহার মাপকাঠি। তিনি দুই একটি উচ্চশ্রেণীর লোকের শিক্ষা ও গৌরবকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আপামর জনসাধারণের উন্নতিকেই তিনি উন্নতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এই জন্য মুষ্টিমেয় লোকের আন্দোলন, তাহাদের গর্জ্জন, তাহাদের স্বাজাত্য বোধের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি ইহাকে বাবুদের মৃদু আস্ফালন বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। বাঙ্গালায় তিনি শিক্ষা ও সম্পদ্ দাবী করিয়াছেন শ্রমিক ও কৃষীর জন্য—হাসিম শেখ, রামা কৈবর্ত্ত ও

রামধন পোদের জন্য। শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের তিনিই প্রথম ও প্রধান নেতা। নীচশ্রেণীর প্রজারা বুদ্ধিতে নিকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীর অধিকারগত বৈষম্য থাকিতে পারে না—তিনি এই মত প্রমাণ ও প্রচার করিয়াছেন। প্রজার ভূমিতে অধিকার শাশ্বত; তাই তিনি দাবী করিয়াছেন জমীদার ও ধনীর সঙ্গে কৃষক ও প্রজার সমানাধিকার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে তিনি বঙ্গের চিরস্থায়ী কলঙ্ক বলিয়া মনে করিতেন এবং ইহার উচ্ছেদ না হইলে এ দেশের উন্নতি হইতে পারে না এই মত তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করিয়াছেন। ইয়োরোপে স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনটি স্তর দেখা যায়। প্রথম আসিয়াছে ধর্ম্মাচরণের স্বাধীনতা; এই আন্দোলনের চরম বিকাশ প্রটেষ্ট্যাণ্ট্ ধর্ম্মসংস্থাপনে। অতঃপর আসিয়াছে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চেষ্টা যাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাই ফরাসীবিপ্লবে এবং ইহার পরে আসিয়াছে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংগ্রাম। এই সংগ্রাম আজও চলিতেছে; ইহার প্রবলতম অভিব্যক্তি হইয়াছে সাম্যবাদে। বঙ্কিমচন্দ্র নিছক রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলনকে তুচ্ছ করিয়াছেন এবং 'লোকরহস্য' গ্রন্থে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের অসারতা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। তিনি চাহিয়াছেন ধর্ম্ম আচরণের স্বাধীনতা এবং আপামর সাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে এ দেশে তিনি বর্ত্তমান কালের সর্ব্বাপেক্ষা প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রধান অগ্রদূত। তিনি দেশবাৎসল্যের-উদ্গাতা, জন্মভূমি যে জননীর মত গরীয়সী এই কথা তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দেশবাৎসল্য ভাবুকের স্বপ্ন নহে, অভিজাতের প্রাধান্যলোভ নহে, জনসাধারণের কল্যাণকে তিনি

স্বদেশপ্রীতির মূলমন্ত্র করিয়াছেন। তাই তিনি দেশপ্রীতি ও লোক প্রীতির সামঞ্জস্য করিতে চাহিয়াছেন। বাঙ্গালা ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে নানা ধর্ম্ম ও নানা জাতির সম্মিলন হইয়াছে তাঁহাদের সমবেত আশা, আশঙ্কা, সুখ ও বেদনা তাঁহার সাহিত্যে ভাষা পাইয়াছে, তিনি দেশ মাতাকে এমন মূর্ত্তিতে কল্পনা করিতে চাহিয়াছেন যেখানে তিনি শুধু হিন্দুর দেবী হইবেন না অথবা শুধু উচ্চ শিক্ষিতের স্বপ্নবিলাসের সামগ্রী হইবেন না; যে মাতাকে তিনি বন্দনা করিয়াছেন তিনি সার্ব্বজনীন, তিনি সকলের আরাধনার সামগ্রী, সকলের পক্ষে তিনি সুখদা ও বরদা এবং সকলের বাহুবল আহরণ করিয়াই তাঁহার বল সঞ্চিত হইবে। মাতার এই সার্ব্বজনীন মূর্ত্তি আঁকিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তিনি আধুনিক স্বাদেশিকতার ঋষি; মাতাকে যে আমরা সমবেত কণ্ঠে, সম্মিলিত শক্তিতে বন্দনা করিতে শিখিয়াছি, শুধু তাহার ভাষা নহে তাহার প্রেরণাও আসিয়াছে তাঁহার নিকট হইতে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

মানবজীবনের কাহিনীর বর্ণনা ও বিবৃতি দেওয়া যায় কাব্যে, নাটকে ও উপন্যাসে। কাব্যকে বাদ দিলে উপন্যাস ও নাটকের উপযোগিতা লইয়া তুলনামূলক সমালোচনা চলিতে পারে। নাটক প্রত্যক্ষ বর্ণনা দেয়—যাহা ঘটিতেছে চোখের সামনেই ঘটিতেছে এবং পাত্রপাত্রীগণ নিজেদের মনের কথা নিজেরাই বলিতেছে। নাট্যকার দূর হইতে কাহিনীর সূত্র যোজনা করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যথাসম্ভব দূরে থাকেন, কারণ তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া গেলে নাটকের নাটকত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে। শেক্সপীয়রের নাটকের শ্রেষ্ঠত্বের একটি প্রধান লক্ষণ এই যে তাহার মধ্যে শেক্সপীয়রকে দেখা যায় না।

প্রত্যক্ষতা নাটকের প্রথম ও প্রধান গুণ। কিন্তু এই প্রত্যক্ষতা লাভের জন্য নাট্যকার ও নাট্যামোদীকে অনেকখানি ত্যাগ স্বীকারও করিতে হয়। প্রথমতঃ, নাটক অভিনীত হয় নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং যেহেতু অভিনেতার সংখ্যা অপরিমিত নয় সেই জন্য নাটকের পরিধি কখনও খুব বিস্তৃত হইতে পারে না। অভিনয়ে কোন একটি চরিত্রের শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত পরিণতি দেখান প্রায় অসম্ভব। তারপর নাটকের মধ্যে চরিত্রকে প্রত্যক্ষ করিতে যাইয়া নাট্যকার নিজে আড়ালে পড়িয়া যান। শুধু তাহাই নহে। বর্ণিত চরিত্র ছাড়া অন্য কোন শক্তিকেই নাটকে রূপ দেওয়া যায় না। গ্রীক্

নাটকে নিয়তি একটি সজীব চরিত্র, কিন্তু তাহাকে নাটকে আনা হইয়াছে প্রধানতঃ কোরাস-সঙ্গীতের মধ্য দিয়া। ইহাতে প্রত্যক্ষতাগুণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া পরবর্ত্তী যুগের নাটক কোরাস্‌কে বর্জ্জন করিয়াছে। টমাস্ হার্ডি The Dynasts নাটকে বহু অশরীরী শক্তির অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগকে মূল নাটকের অঙ্গীভূত করিতে পারেন নাই। শকুন্তলা ও মীরাণ্ডার চরিত্র প্রকৃতির প্রভাবে গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রভাব প্রত্যক্ষ হইতে পারে নাই। শকুন্তলা ও মীরাণ্ডার চরিত্রে অনন্যসাধারণ সারল্য ও সংসারানভিজ্ঞতার পরিচয় পাই এবং ইহার মূলে রহিয়াছে প্রকৃতির প্রভাব। ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃতি নাটকে দুষ্প্রাপ্য।

উপন্যাসের এই অসুবিধা নাই। উপন্যাসের কাহিনী বা চরিত্র নাটকের কাহিনী বা চরিত্রের মত প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু উপন্যাসের বিস্তৃতি অপরিসীম—ইহার মধ্যে পুরুষানুক্রমিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইতে পারে, একই সময়ে একাধিক চরিত্রের হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইতেছে তাহার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয় এবং সকল বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও চরিত্রকে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী ঔপন্যাসিকের নিজের; অথবা তিনি কোন একটি চরিত্রের মধ্যে নিজকে বিলীন করিয়া দিয়া তাহারই সাহায্যে অপরাপর নরনারী ও কাহিনীর অন্তর্গত ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস গ্রহণ করা যাইতে পারে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস হইতে শরৎচন্দ্রকে বাদ দেওয়া যায় না। তাঁহার অনেকগুলি উপন্যাস নাটকাকারে রূপান্তরিত

হইয়াছে, কিন্তু এই সকল নাটকের মধ্যে শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়া যায় না বলিয়া ইহাদিগকে বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টি মাত্র বলিয়া মনে হয়। তাঁহার উপন্যাসগুলির প্রধান গুণ তাহাদের ঐক্য এবং গ্রন্থকার ও পাঠকের মধ্যে নিবিড় পরিচয়। 'শ্রীকান্ত' বহু বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ঘটনার সমাবেশে সমৃদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এই ঘটনাগুলিকে রূপ দিয়াছে শ্রীকান্তের দৃষ্টিভঙ্গী—শরৎচন্দ্রের নিজের দৃষ্টি এখানে শ্রীকান্তের দৃষ্টির সঙ্গে একাত্মতা লাভ করিয়াছে।

কোন কোন ঔপন্যাসিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নাটকের বৈশিষ্ট্য মিশ্রিত করিতে চাহেন। তাঁহাদের নিজেদের যে বিশিষ্ট দৃষ্টি আছে তাহাকে যথাসম্ভব আড়ালে রাখিয়া তাঁহারা চরিত্রগুলিকে সমধিক স্পষ্ট করিতে চাহেন। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' এই রীতির অতি সুন্দর উদাহরণ। উপন্যাসের প্রারম্ভে মনে হয় শরৎচন্দ্র অচলার দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাহিনী বলিয়া যাইবেন; মহিম ও সুরেশকে আমরা অচলার চোখ দিয়া দেখিব। কিন্তু কয়েকটি পরিচ্ছেদ পরেই দেখি তিনি অচলার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন; সবগুলি চরিত্রই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাহাদের পরিণতি লাভ করিতেছে; গ্রন্থকার উপন্যাসের রীতির সঙ্গে নাটকের রীতির সামঞ্জস্য করিতেছেন।)

(২)

এই উপক্রমণিকার পর বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির আলোচনা আবশ্যক। কালানুক্রমিক বিচার করিলে তাঁহার উপন্যাসগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। (প্রথম যুগের উপন্যাস চারখানি:

(১) দুর্গেশনন্দিনী (২) কপালকুণ্ডলা (৩) মৃণালিনী (৪) বিষবৃক্ষ ? এই উপন্যাস কয়খানিতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়শঃ একটি বিশেষ দৃষ্টি অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার নিজস্ব নহে। শুধু 'মৃণালিনী'তে যবনবিজয়ের বর্ণনায় তাঁহার নিজের মতবাদ, নিজের বিশ্বাস প্রকট হইয়াছে। অন্যত্র তিনি কোন একটি চরিত্রের মারফতে সমস্ত ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, অথবা মানবভাগ্য বিধাতা একটি লোকাতীত শক্তির সঙ্গে নিজের বিচারবুদ্ধিকে মিশাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। ইহাই বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত অপরিণত রচনা; ইহার মধ্যে তিনি এই ঐক্যসূত্র খুঁজিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সন্ধান পান নাই। এখানে অভিরামস্বামীর জ্যোতিষ গণনায় নিয়তির আভাস আছে; কিন্তু সেই আভাস অতিশয় অস্পষ্ট। প্রথম অংশে তিনি বিমলার দৃষ্টি দিয়া সমস্ত ঘটনা দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিমলা পাত্রপাত্রীদের মধ্যে প্রধানা; কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম অপেক্ষা মুখ্য তাঁহার দৃষ্টি। আমরা প্রত্যেক চরিত্রকে চিনি তাঁহার মারফতে। শুধু আয়েষার সঙ্গে তাঁহার যোগ নাই। কিন্তু শেষের অংশে আয়েষাই প্রধান চরিত্র; সুতরাং এইখানে বিমলার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর কোন সার্থকতা নাই। এই অংশে এমন কোন চরিত্র নাই, যাহার সাহায্যে কাহিনী বা চরিত্রের বিচার চলিতে পারে। এই অংশ নাটকোচিত স্বাধীনতা পাইয়াছে, ইহা স্বয়ংবর্ণিত। এই ভাবে কাহিনী রচনা করিতে হইলে গ্রন্থকার থাকিবেন কাহিনী হইতে দূরে; অথচ প্রত্যেক চরিত্র সম্পর্কে তাঁহার

অন্তর্দৃষ্টি হইবে এত গভীর যে ইহাদের হৃদয়ের গোপন কথা আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে এই ক্ষমতার পরিচয় খুবই অস্পষ্ট। আয়েষা-ওসমান-জগৎসিংহ-তিলোত্তমার কাহিনীকে বঙ্কিমচন্দ্র নাটকের মত প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইয়াছে অতি-নাটকীয়। এই অংশে ঘটনার বর্ণনা আতিশয্যে পূর্ণ, কোথাও পাঠকের মনে বিশ্বাসের ছাপ পড়ে না। যদি বিমলার মত কোন মধ্যবর্ত্তীর সাহায্যে ইহা পাঠকের কাছে আসিত তাহা হইলে সেই মধ্যবর্ত্তীর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বিশ্বাসের গভীরতা হয়ত ইহাকে অপেক্ষাকৃত সরল, সহজ ও গ্রহণযোগ্য করিয়া দিতে পারিত।

'কপালকুণ্ডলা'য় বঙ্কিমচন্দ্র অতিশয় পরিণত রচনাকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। এখানে তিনি কোন একটি চরিত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই, প্রত্যেক চরিত্র স্বাধীন পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং পাঠকের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে এই উপন্যাসে নাটকের আর্টের পরিচয় রহিয়াছে, কিন্তু উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যও নষ্ট হইয়া যায় নাই। বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে একত্র গ্রথিত করিয়াছে একটি বিরাট্ লোকাতীত শক্তি—তাহা নিয়তি নহে, কিন্তু নিয়তির মতই অপ্রমেয়। ইহা হইতেছে নির্জ্জন প্রকৃতির শক্তি, বিশেষ করিয়া সমুদ্রের প্রভাব। কপালকুণ্ডলা সমুদ্রতীরে প্রতিপালিতা, কাপালিকের ভীষণতা সমুদ্রের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি। কপালকুণ্ডলা কখনও সমুদ্রের প্রভাব হইতে মুক্ত হয়েন নাই—গার্হস্থ্যজীবনে সর্ব্বদাই অনুভব করিয়াছেন যে সমুদ্রতীরে বনে বনে ঘুরিতে পারিলে তাঁহার সুখ হয়। নবকুমার তাঁহার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইলেও তিনি গৃহে ফিরিয়া

যাইতে চাহেন নাই। যে সমুদ্রের আহ্বান তাঁহাকে গৃহধর্মের প্রতি বিমুখ করিয়াছিল তিনি তাঁহারই কোলে বিলীন হইয়া গেলেন। এমনি করিয়া সমস্ত কাহিনীটিতে সমুদ্রের প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তাহারা সম্বদ্ধ হইয়াছে প্রকৃতির অঙ্গুলি সঙ্কেতে।

'মৃণালিনী'তে তিনটি কাহিনী আছে—বঙ্গ বিজয়, হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রেম ও পশুপতি-মনোরমার পরিণতি। প্রথমটির কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাহিনী দুইটির বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র পৃথক্ পৃথক্ রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। হেমচন্দ্র মৃণালিনীর প্রণয় কাহিনীকে তিনি কোন বিশেষ শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করান নাই, কোন বিশেষ দৃষ্টি ভঙ্গীতে ইহা তিনি দেখেন নাই। ইহাকে সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এইখানেও 'দুর্গেশনন্দিনী'র অপরিণতির চিহ্ন বর্ত্তমান—সেই মিথ্যা সন্দেহ, সেই আস্ফালন, সেই প্রত্যাখ্যান, সেই অহেতুক স্বীকারোক্তি, সেই অতিনাটকীয় আড়ম্বর। এইখানে মাধবাচার্য্য উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার সাহায্যে গল্পটিকে অপেক্ষাকৃত সরল ও বিশ্বাস-যোগ্য করিয়া উপস্থিত করা যাইত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহা করেন নাই। মাধবাচার্য্য বিমলার মত সহানুভূতিসম্পন্ন নহেন এবং প্রণয় ব্যাপারে তিনি একেবারে নির্ব্বোধ। অপর আখ্যায়িকায় (পশুপতি-মনোরমার) বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বিশিষ্ট পথটি চিনিয়া লইয়াছেন। আমরা সমস্ত ব্যাপারটা জ্যোতির্বিদ্যার দিব্য চক্ষু দিয়া দেখিতে পারি। পশুপতি ও মনোরমা স্বাধীন হইয়াও নিয়তির অধীন এবং নিয়তির

কঠিন শাসনে তাহাদের কাহিনী ঋজু হইয়াছে। তাই কোথাও বাক্ বাহুল্য নাই, অনাবশ্যক আড়ম্বর নাই, ইহাদের অন্তরের অপরাজেয় আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাহিরের অলঙ্ঘ্য নীতির সহজ সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

পরবর্ত্তী উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' অধিকতর নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। মনোরমা যখন পশুপতির প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয় তখন সে দৈবগণনার কথা জানিত না, আমরাও জানিতাম না। কিন্তু কুন্দনন্দিনীর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র আরও স্পষ্ট ও সাহসী হইয়াছেন; তিনি গ্রন্থের আরম্ভেই কুন্দনন্দিনীকে সতর্ক করিয়াছেন এবং আমাদিগকে সজাগ করিয়াছেন। যে অদৃশ্যলোকে কুন্দর মা বিরাজ করিতেছিল, প্রথম হইতেই আমরা সেইখানকার দিব্যদৃষ্টি লইয়া সমস্ত ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ ও বিচার করিতে পারি। কোথাও কিছু অস্পষ্ট নাই, কোন চরিত্রই একেবারে স্বাধীন নহে। জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার মত একটির পর একটি ধাপ আসিয়াছে, কেহ কাহারও জায়গা জুড়িয়া বসে নাই; কোন অবান্তর দৃশ্য বা চরিত্রের দ্বারা উপন্যাস ভারাক্রান্ত হয় নাই।

নিয়তি লোকাতীত, নীতিশাস্ত্র মানবের সৃষ্টি। ইহাদের মধ্যে কোন সংস্রব না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা অনেক সময়ই ইহাদের মধ্যে সম্পর্ক বাহির করি এবং বঙ্কিমচন্দ্রও করিয়াছেন। তাই নিয়তির যে কার্য্যকলাপ নগেন্দ্রনাথ, কুন্দনন্দিনী ও হীরার জীবনে অভিব্যক্তি পাইয়াছে তাহাকে তিনি আখ্যা দিয়াছেন—বিষবৃক্ষ। এই বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়াছে নিয়তি কিন্তু নগেন্দ্রনাথ, হীরা ও কুন্দনন্দিনীর অপ্রতিরোধনীয় প্রবৃত্তি এই বৃক্ষকে পল্লবিত ও মুকুলিত

করিয়াছে।) বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় যুগের উপন্যাসে নিয়তি গৌণ হইয়া আসিয়াছে, নীতি ক্রমশঃ প্রাধান্য পাইয়াছে। ইহা শুধু মতের পরিবর্ত্তন নহে; মতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে রচনারীতিরও পার্থক্য আসিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই যুগের প্রথম উপন্যাস 'চন্দ্রশেখর'কে গ্রহণ করা যাইতে পারে। মূল আখ্যায়িকায় নিয়তির স্পর্শ নাই। দলনীর জীবনে নিয়তির নিয়ন্ত্রণের চিহ্ন পাওয়া যায় বটে। কিন্তু নিয়তির সঙ্গে হৃদয়ের প্রবৃত্তির যে নিবিড় সংযোগ পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ এইখানে তাহার পরিচয় নাই। দলনীর বিষপান জ্যোতির্গণনার সাফল্য প্রমাণিত করিয়াছে—তবু এই পরিণতি অনিবার্য্য বলিয়া মনে হয় না। ঘটনাগুলি যেন আপনাদের স্রোতে, আপনাদের বেগে চলিতেছে, কোথাও সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা আছে, কোথাও নাই। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এই উপন্যাসের মধ্যে আসিয়াছেন, কিন্তু তিনিও সম্পূর্ণ সাহসী হয়েন নাই। রামানন্দ স্বামীর সাহায্যে তিনি শৈবলিনীর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত কাহিনী শৈবলিনীকে লইয়া নহে এবং রামানন্দ স্বামীও অবতীর্ণ হইয়াছেন উপন্যাসের শেষাংশে। এই কারণে উপন্যাসের খানিকটা অংশ অতিশয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে আবার খানিকটা অংশ অতিশয় অপ্রত্যাশিতভাবে বিসর্পিত হইয়াছে। দলনী ও শৈবলিনীকে লইয়া ইংরেজের ভ্রম, ফষ্টরের প্রাণরক্ষা, চরমসঙ্কটে তাহার উপস্থিতি, তকী খাঁর সঙ্গে নবাবের সাক্ষাৎ, ঠিক সময়ে কুল্‌সমের আগমন—এই সব কাহিনী অতিশয় অসংবদ্ধ আবার ইহাদের সরল উপসংহার ততোধিক বিস্ময়কর। কিন্তু যাহা বিস্ময়কর তাহা সকল সময় বিশ্বাসযোগ্য হয় না। গ্রন্থকার উপন্যাসের

বিশিষ্ট রীতির মধ্যে নাটকের স্বাধীনতা আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার এই প্রয়াস সম্পূর্ণ সফল হয় নাই।)

'রজনী' এই যুগের দ্বিতীয় উপন্যাস। ইহাতে গ্রন্থকার নিজেও বক্তা হয়েন নাই, আবার কোন একটি চরিত্রের অনুভূতিকেও তিনি মাপকাঠি করেন নাই। প্রধান পাত্রপাত্রীরা এইখানে বক্তা হইয়াছে। এই রীতির সুবিধা-অসুবিধা সময়ান্তরে আলোচনা করা যাইবে। 'রজনী'র অব্যবহিত পরে লিখিত হইয়াছে 'রাজসিংহ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। ইহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র নাট্কীয় রীতির অবতারণা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। হিন্দুদের বাহুবলের অভাব ছিল না—ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি 'রাজসিংহ' রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা মনে করিতে পারি যে যে বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া এই উপন্যাস রচিত হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য অনুসারে সমস্ত ঘটনা সজ্জিত হইবে এবং আমরা সর্ব্বদা গ্রন্থকারের উপস্থিতি অনুভব করিব। শেষের দিকে গ্রন্থকার সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজমান। কিন্তু প্রথম অংশে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক কাহিনীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইতিহাসের প্রতি তিনি সুবিচার করিয়াছেন কিনা এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে তাঁহার রচনার মূল্য কি সেই আলোচনা যথাসময়ে করা যাইবে। এখানে শুধু রচনাভঙ্গীর বিচার করা যাইতে পারে। সেই দিক্ হইতে মনে হয় যে এই আখ্যায়িকা অতিমাত্র বিশৃঙ্খলভাবে বর্ণিত হইয়াছে—কার্য্যকারণ সম্বন্ধ তেমন স্পষ্ট হয় নাই, যুদ্ধের এক পর্ব্বের পর আর এক পর্ব্ব কি ভাবে আসিল তাহা ভাল করিয়া বোঝা যায় না। মোগল-রাজপুতের যুদ্ধে নানা শক্তির সংঘর্ষ ও সম্মিলন

হইয়াছে, কিন্তু এই সংঘর্ষ ও সম্মিলনের বর্ণনা সুসংবদ্ধ নহে। কোন কোন বিষয়কে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে আবার কোন কোন বিষয়কে একেবারে ছোট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে যুদ্ধ অনেক সময় ছেলেখেলায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ঔরংজেবের পরধর্ম্মবিদ্বেষের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি সেই দিক্ হইতে সমস্ত বিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলিকে সজ্জিত করিতে পারিতেন। অথবা হিন্দুদিগের বাহুবল প্রমাণ করিতে চাহিলে মাড়বার, মেবার, মালব ও মহারাষ্ট্রে হিন্দুর যে অভ্যুত্থান এই সময়ে হইয়াছিল তাহার সুবিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল বর্ণনা দিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া তিনি ঐতিহাসিক আখ্যায়িকাকে সম্পূর্ণ বাধাহীন করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—এই উপন্যাস দুইখানিতে বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। উভয় উপন্যাসেই সতী নারীর স্বামীর রূপোন্মাদ, অন্য রমণীতে আসক্তি এবং সেই আসক্তির ভয়াবহ পরিণামের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য থাকিলেও উভয় উপন্যাসের বলিবার ভঙ্গীতে পার্থক্য খুব বেশী। নগেন্দ্রনাথের কাহিনী যেন পূর্ব্ব হতেই পরিণতি লাভ করিয়া সম্পূর্ণ হইয়া ছিল; আমাদের সম্মুখে তাহার আবরণ অপসারিত হইল মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র নিয়তির প্রসারিত দৃষ্টির দ্বারা সকল ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। রোহিণী ও ভ্রমরের কাহিনী বর্ণনায় তিনি অন্য রীতির অবতারণা করিয়াছেন। উপন্যাসের প্রথম অংশে আখ্যায়িকাকে নাটকোচিত স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ রোহিণীর চরিত্রকে কোন একটি ছাঁচে ফেলিবার বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। রোহিণী দুঃসাহসিকা

কামার্ত্তা, পাপপুণ্যজ্ঞানহীনা আবার তাহার মধ্যে আত্মসুখবিসর্জ্জনেচ্ছু গভীর প্রণয়েরও উন্মেষ দেখা যায়। প্রথম অংশে এই ভাবে রোহিণীর হৃদয়ে বিচিত্র সম্ভাব্যতার আভাস দেওয়া হইয়াছে। রোহিণীর অন্তরস্থ কোন্ প্রবৃত্তি সমধিক বিকাশ লাভ করিবে তাহার ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সুনিশ্চিত নির্দ্দেশ নাই। মনে হয় অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের উপর এই পরিণতি নির্ভর করিবে। নাটকের ইহাই বিশিষ্ট রীতি।

বঙ্কিমচন্দ্র যে রীতিতে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আরম্ভ করিয়াছিলেন দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা বজায় রাখেন নাই। দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি ভ্রমরের দৃষ্টিতে সমস্ত কাহিনীটিকে দেখিতে চাহিয়াছেন। ইহাতে উপন্যাসের স্বরূপ বদলাইয়া গিয়াছে। গোবিন্দলাল যখন ভ্রমরকে পরিত্যাগ করেন, তখন ভ্রমর বলিয়াছিল, "·········আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আমার জন্য কাঁদিবে।" এইখানে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত। ইহার পর ভ্রমর সাত বৎসর বাঁচিয়াছিল—এই সাত বৎসরের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে। এইখানে গোবিন্দলাল, রোহিণী, মাধবীনাথ, সোনা, রূপো প্রভৃতির কথা আছে। কিন্তু এই খণ্ডে গোবিন্দলাল রোহিণী ও অন্যান্য সবাই গৌণ হইয়া গিয়াছে; তাহাদিগকে দেখিতে হইবে ভ্রমরের দিব্যদৃষ্টি দিয়া। প্রথম খণ্ডের অধ্যায়গুলির কোন শিরোনামা নাই, কারণ কোন ঘটনা বা চরিত্র কোনরূপ প্রাধান্য পায় নাই; নাটকীয় রীতির ইহাই বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় খণ্ডে এই রীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কারণ ইহা বিশেষভাবে ভ্রমরের সাত বৎসরের ইতিহাস। ইহাকে ভাগ করা হইয়াছে এই ভাবে:—প্রথম বৎসর, দ্বিতীয় বৎসর, পঞ্চম বৎসর, ষষ্ঠ বৎসর, সপ্তম বৎসর।

গোবিন্দলাল-রোহিণী সংবাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। ইহা ভ্রমরের দ্বিতীয় বৎসরের ইতিহাসের অন্তর্ভূত। এই জন্য ইহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং এই জন্যই নিশাকর—রোহিণীর সম্ভাষণ ও রোহিণীর মৃত্যু অনেক পাঠকের মনে খট্‌কা লাগায়। গোবিন্দলাল ও রোহিণীর মধ্যে যে প্রণয়সঞ্চার হইয়াছিল তাহাকে দীর্ঘ করিয়া দেখান হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের বিচ্ছেদের কাহিনী খুবই হ্রস্ব। ভ্রমরের ইতিহাসে ইহার যতটুকু প্রকাশ পাওয়া দরকার শুধু তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। "ভ্রমর মানসচক্ষে ধূমময় চিত্রবৎ এ কাণ্ডের শেষ যাহা হইবে তাহা দেখিতে পাইল।" এই ধূমময় চিত্রকে স্পষ্ট করা দ্বিতীয় খণ্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য।

'আনন্দমঠ' তৃতীয় যুগের প্রথম উপন্যাস। এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি নিজেই বক্তা হইয়াছেন। এই উপন্যাসে (ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে) নাটকীয় রীতির স্বাধীনতা নাই। আখ্যায়িকার মূল্য গ্রন্থকার নিজেই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অনুশীলনতত্ত্বের মাপকাঠিতে তিনি সমস্ত বিষয়গুলি বিচার করিয়াছেন। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে কাহিনী খুব দ্রুতগামী এবং মনে হয় প্রত্যেক চরিত্র আপনার পথ আপনি খুঁজিয়া লইতেছে। প্রধান তিন কর্ম্মকর্ত্তা সত্যানন্দ, ভবানন্দ, ও জীবানন্দ একই সম্প্রদায়ের লোক; কিন্তু চরিত্রের বিভিন্নতার জন্য প্রত্যেকে পৃথক্ পরিণতি লাভ করিলেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থখানি মোটেই নাটকীয় রীতিতে লিখিত নহে। গ্রন্থের উপক্রমণিকায়, মধ্যদেশে ও উপসংহারে এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছেন। এই মহাপুরুষের দৃষ্টি দিয়া দেখিলে

গ্রন্থের স্বরূপ বদলাইয়া যায়, তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয় সম্পূর্ণ নূতন মাপকাঠি দিয়া। এই মহাপুরুষ বঙ্কিমপ্রচারিত নিষ্কামধর্ম্মের প্রতীক। 'দেবীচৌধুরাণী'তেও বঙ্কিমচন্দ্র এই রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এইখানে তিনি সকল আবরণ পরিত্যাগ করিয়া নিজেই উপন্যাস মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনিই আখ্যায়িকাকে সাজাইয়াছেন এবং তাঁহার নিজের দৃষ্টি দিয়াই গ্রন্থবর্ণিত ঘটনা ও চরিত্রের বিচার করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রফুল্লকে অবতার বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

'সীতারাম' বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশেষ উপন্যাস। ইহাতে তিনি সীতারাম ও জয়ন্তীর প্রেমের ইতিহাস বর্ণনা দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে হিন্দুর রাজ্যপ্রতিষ্ঠাচেষ্টার চিত্র আঁকিয়াছেন। প্রেমের চিত্র আঁকিতে যাইয়া তিনি নিষ্কাম ধর্ম্মের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইহার ফলে সীতারাম ও শ্রী একটু আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে; তাহাদের মাঝখানে রহিয়াছে সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী। দুই একবার শ্রী এই আড়াল ভেদ করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। কিন্তু সে দুই একবার মাত্র। সন্ন্যাসিনী প্রায় কখনও তাহাকে ছাড়ে নাই এবং যখন সে একা রহিয়াছে তখনও তাহার উপরে সন্ন্যাসিনীর প্রভাব অতিশয় প্রবল। যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি অন্যান্য ঘটনার মধ্যেও সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাই, কিন্তু সেইখানে সে কিছুই নিয়ন্ত্রিত করে নাই, শুধু তাহার নির্দ্দিষ্ট অংশ অভিনয় করিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ গ্রন্থের এই অংশটি অনেকটা নাটকীয় রীতিতে রচিত। প্রত্যেকেই আমাদের সম্মুখে যথাসম্ভব স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে; কাহারও সাহায্যে কাহাকেও

চিনিতে হয় না; যাহার যে কাজ সে করিয়া গিয়াছে; কেহ কাহাকে ও ম্লান করে নাই। এমন কি রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে আপনাদের মত ব্যক্ত করিয়াছে, তাহাদের চরিত্রও আপনা হইতে ব্যক্ত হইয়াছে, অন্য কাহারও সাহায্যে তাহাদিগকে চিনিতে হয় না। আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। এই উপন্যাসে জ্যোতিষগণনার সাফল্যের কথা লিখিত হইয়াছে। এই সফলতার বর্ণনায়ও নাটকোচিত স্বাধীনতা আছে। শুধু যে শ্রী ও তাহার অভিভাবকগণই 'প্রিয়' শব্দের তাৎপর্য্য ঠিক বুঝিতে পারে নাই, তাহা নহে। যে ভাবে শ্রী গঙ্গারামের হত্যার কারণ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার মধ্যেও কাহিনীর অতি স্বাধীন গতির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রী জ্যোতিষগণনাকে নিষ্ফল করিবার জন্য স্বামী সীতারাম হইতে দূরে রহিয়াছে। এই সম্পর্কে গঙ্গারামের কথা তাহার মনেও আসে নাই। গঙ্গারাম রমাকে কামনা করিয়াছে; বিচারে শাস্তি পাইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। ঘটনাচক্রের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে ভগিনী ভ্রাতার প্রাণহন্ত্রী হইয়াছে।

(৩)

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নাটকের ও উপন্যাসের রীতির কিরূপ সামঞ্জস্য হইয়াছে তাহার আলোচনার পর উপন্যাস-রচনার আর একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তাহা হইতেছে উপন্যাসের মধ্যে জটিল আখ্যায়িকার বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্য সন্ধান করিবার এবং সরল আখ্যায়িকাতে বৈচিত্র্যসৃষ্টির কৌশল। কতকগুলি উপন্যাসে

বঙ্কিমচন্দ্র একটিমাত্র কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের আখ্যান ভাগ সরল। আবার কতকগুলি উপন্যাসে একাধিক কাহিনী মিশ্রিত হইয়াছে। ইহাদের আখ্যানভাগ জটিল। 'রাধারাণী' 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'ইন্দিরা' ছোট গল্প; বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদের নাম দিয়াছেন 'উপকথা'। 'ইন্দিরা' পূর্ব্বে ছোট ছিল, পরে বড় হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা একটি সরল উপাখ্যান ছিল; পরে র-বাবু, সুভাষিণী প্রভৃতিকে প্রাধান্য দেওয়াতে খানিকটা জটিলতা আসিয়াছে। তবু র-বাবু, সুভাষিণী ইন্দিরার স্বামিলাভের সহায় মাত্র। সুতরাং ইহাদের অবতারণাসত্ত্বেও এই কাহিনী ছোট গল্পই রহিয়া গিয়াছে। এই উপকথাগুলিকে বাদ দিলে যে এগার খানা সম্পূর্ণাবয়ব উপন্যাস থাকে তহাদিগের মধ্যে 'কৃষ্ণকান্তের উইল,' 'আনন্দমঠ' 'দেবী চৌধুরাণী' সরল, 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী' ও 'রাজসিংহ' জটিল অথবা মিশ্র। 'সীতারাম' এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী—ইহাতে উভয় জাতীয় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য আছে।

এই যে শ্রেণীবিভাগ করা হইল ইহা হইতে দেখা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে জটিল আখ্যায়িকার পক্ষপাতী ছিলেন, পরে সরল, অমিশ্র কাহিনীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি যায়। প্রথম যুগের সব কয়খানি উপন্যাস, দ্বিতীয় যুগের এক 'কৃষ্ণকান্তের উইল' * ছাড়া অন্য সব উপন্যাস জটিল। এই জটিল উপন্যাসগুলির আখ্যায়িকা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়ই একটি চরিত্রের মারফতে বিচ্ছিন্ন আখ্যানকে

* নিশাকর-সংবাদকে আর একটু দীর্ঘ করিলে এই উপন্যাসের আখ্যায়িকাও জটিল হইত।

একত্রিত করিয়াছেন।) সেই চরিত্র উভয় কাহিনীতেই প্রধান, সুতরাং তাহার সাহায্যে অতি সহজে বিভিন্ন কাহিনী একত্রিত হইয়াছে। (ইহা ছাড়া অন্য উপায়েও ঐক্য আনা যায়। এমন হইতে পারে যে দুই বিভিন্ন কাহিনীর পাত্রপাত্রীগণ একই স্থানে সমবেত হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই জাতীয় ঐক্য চরিত্রগত ঐক্যের মত সরস ও জীবন্ত হইতে পারে না। মনে হয় গ্রন্থকার যেন জোর করিয়া বিভিন্ন চরিত্র ও বিচ্ছিন্ন আখ্যানকে একত্রিত করিয়াছেন। থ্যাকারে লিখিত Vanity Fair সম্পর্কে এই আপত্তি প্রযোজ্য।) দুইটি মেয়ে একই ইস্কুলে পড়িত—ইহাই তাহাদের মধ্যে একমাত্র সংযোগসূত্র। তারপর যে যাহার পথ বাহিয়া চলিয়াছে থ্যাকারে আর তাহাদিগকে একত্র করিতে পারিতেছেন না। তাই তিনি ওয়াটারলু যুদ্ধকে তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে আনিয়া ফেলিলেন। ওয়াটারলু যুদ্ধ ইংলণ্ডীয় নরনারী প্রায় সবাইকে স্পর্শ করিয়াছিল এবং উপন্যাসের পাত্রদের মধ্যে একাধিক সৈনিক ছিল। কাজেই ওয়াটারলুর ক্ষেত্রে সবাই সমবেত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র চেষ্টা করিয়াছেন একটি প্রধান পাত্রের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন কাহিনীকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিতে। কোন একটি লোক একাধিক ঘটনা বা উপাখ্যানে অবতীর্ণ হইবে ইহা স্বাভাবিক, কারণ মানুষের ভাগ্য ও চরিত্র অনন্ত বৈচিত্র্যময় এবং তাহাকে কেন্দ্র করিলে আপনা হইতেই ঐক্য আসিয়া পড়িবে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে এইরূপ চরিত্র জগৎ সিংহ। জগৎ সিংহ তিলোত্তমার স্বামী, আয়েষার প্রণয়ভাজন এবং ওসমানের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহা সত্ত্বেও 'দুর্গেশনন্দিনী'তে আখ্যানভাগের সংস্থান নির্দ্দোষ নহে, কারণ প্রথম অংশের প্রধান চরিত্র বিমলা দ্বিতীয় অংশে

গৌণ হইয়া গিয়াছেন' এবং দ্বিতীয় অংশের প্রধান চরিত্র আয়েষাকে প্রথমাংশে দেখাই যায় না। বিমলা ও আয়েষার মধ্যে কোন সংযোগ-সূত্র নাই। মনে করা যাইতে পারে যে উপন্যাসের কেন্দ্র কোন চরিত্রে নহে, গড়মান্দারণ দুর্গবিজয়ে। কিন্তু এই ভাবে দেখিতে গেলে আমাদের অনুভূতির উপর অবিচার করা হয়। প্রত্যেক পাঠকই লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে এই উপন্যাসের সব চেয়ে বড় বিষয় কোন ঘটনা নহে, কতকগুলি পরমাশ্চর্য্য চরিত্রের সৃষ্টি। কোন একটি ঘটনাকে বড় করিয়া দেখিলে বিমলা, আয়েষা, ওসমান, জগৎ সিংহ প্রভৃতি ছোট হইয়া পড়েন। 'মৃণালিনী'তেও অনুরূপ ত্রুটি বর্ত্তমান। হেমচন্দ্র মৃণালিনীর স্বামী, মাধবাচার্য্যের শিষ্য, যবনের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং মনোরমার ভাই। সুতরাং হেমচন্দ্র শুধু নায়কই নহেন, তিনিই বিভিন্ন কাহিনীকে একত্র করিয়াছেন। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে এক মৃণালিনী-সংবাদ ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। তিনি বক্তিয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু দেখা গেল কার্য্যকালে তিনি কিছুই করিতে পারিতেছেন না। পশুপতির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন এবং দুই একটি পাঠানকে নিহত করিয়াই তিনি অবসর গ্রহণ করিলেন। মনোরমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ আকস্মিক এবং মনোরমা তাঁহাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিলেও তাহার নিজের জীবনের গূঢ়রহস্য ইঁহার কাছে ব্যক্ত করে নাই এবং হেমচন্দ্র নিজেকে যবনের চিরশত্রু বলিয়া পরিচিত করিলেও মনোরমা তাঁহাকে পশুপতির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে হুসিয়ার করে নাই। সুতরাং তাঁহার মারফতে যে ঐক্য পাই তাহা নিতান্ত ভাসা-ভাসা।

'কপালকুণ্ডলা' ও 'বিষবৃক্ষ' সম্পর্কে এই আপত্তি খাটে না। এই দুই উপন্যাসের ঐক্য অতিশয় গভীর ও নিবিড়। কপালকুণ্ডলা আয়তনে ছোট। ইহার কাহিনীও বড় নহে; তবু ইহাতে জটিলতা ও বিস্তৃতি আছে। এই কাহিনীতে দুইটি পরমাশ্চর্য্য রমণী আছে যাঁহারা পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইঁহারা একত্র হইয়াছেন নবকুমারের জন্য। নবকুমারের ব্যক্তিত্ব খুব প্রখর নহে, কিন্তু তাঁহার সংস্পর্শে যে দুইটী রমণী আসিয়াছেন তাঁহারা অনন্যসাধারণ এবং তাঁহাদের সাহায্যে নবকুমারের চরিত্রও প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মতিবিবি ও কপাল-কুণ্ডলার চরিত্রের পার্থক্য স্থানান্তরে আলোচিত হইয়াছে। ইঁহাদের সঙ্গে নবকুমারের সম্পর্ক প্রণয়ের সম্পর্ক, কিন্তু তাহাতেও একটু প্রভেদ আছে। নবকুমার কপালকুণ্ডলার প্রণয়াভিলাষী, কিন্তু কপাল-কুণ্ডলা তাঁহাকে চাহেন না। মতিবিবি নবকুমারের প্রতি আসক্ত, কিন্তু নবকুমার তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। এই বৈপরীত্যকে স্পষ্ট করিতে হইলে এই দুই রমণীর বিস্ময়কর অতীত ইতিহাস জানা দরকার। কপালকুণ্ডলার জীবনযাত্রার রীতি মতিবিবির জীবনযাত্রার রীতি হইতে পৃথক্ আর ইঁহাদের মাঝখানে রহিয়াছেন নবকুমার। মতিবিবি ও কপালকুণ্ডলার যে প্রথম মিলন হইয়াছিল তাহা আকস্মিক; কিন্তু আকস্মিক ঘটনাকে কোন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকই প্রাধান্য দেন না। পরে যে ইঁহাদের দেখা হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন আকস্মিকতা নাই; মতিবিবি কপালকুণ্ডলার কাছে আসিয়াছেন নিজের প্রবৃত্তির প্রবল তাড়নায়। আর এক দিক্ হইতে দেখিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের গঠনকৌশলের মাহাত্ম্য অনুমিত হইবে। নবকুমার মতিবিবি ও কপালকুণ্ডলা অপেক্ষা

নিষ্প্রভ, কিন্তু তিনিই কেন্দ্রস্থ চরিত্র। সুতরাং নায়িকাদের জীবনের যে অংশে নবকুমারের স্থান নাই তাহা খুব সংক্ষেপে, যথাসম্ভব আভাসে বর্ণিত হইয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'মৃণালিনী'তে এই সংযম ও ঐক্য নাই। বিমলার বাল্য ও যৌবনের ইতিহাস চিত্তাকর্ষক, কিন্তু জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-আয়েষার কাহিনীর সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ গৌণ। মনোরমার কাহিনী ও মৃণালিনীর কাহিনী একেবারে অসম্পৃক্ত।

'বিষবৃক্ষ' ও সর্ব্বাংশে উচ্চ কলাকৌশলের পরিচয় দেয়। এই উপন্যাসের দুইটি প্রধান চরিত্র নগেন্দ্রনাথ ও হীরা। হীরা নগেন্দ্রনাথের বাড়ীর দাসী, দেবেন্দ্র দত্ত নগেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার। তবু শুধু এই সম্পর্ককে অবলম্বন করিয়াই যদি বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের বিষবৃক্ষের সঙ্গে হীরার বিষবৃক্ষকে সংযুক্ত করিয়া দিতেন তাহা হইলে এই উপন্যাস 'মৃণালিনী'র পর্য্যায়ভুক্ত হইত। কিন্তু দেবেন্দ্র দত্ত কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মত্ত; হীরা দেবেন্দ্রের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী এবং হীরার এই দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া দেবেন্দ্র তাহার সাহায্যে কুন্দনন্দিনীকে হস্তগত করিতে চাহেন। হীরা ক্ষণিক আবেগের মোহে বিবশা হইলেও প্রখরবুদ্ধিশালিনী; সুতরাং এই কপটতা বুঝিতে পারিয়া সে কুন্দ ও দেবেন্দ্রের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই ভাবে কুন্দনন্দিনী দুইটি বিষবৃক্ষকে একত্র করিল।

দ্বিতীয় যুগের প্রথম উপন্যাস 'চন্দ্রশেখর'। এইখানেও দুইটি কাহিনী একত্রিত হইয়াছে: একটি প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের আর একটি নবাব-দলনী-গুরগন্ খাঁ প্রভৃতির এবং উভয় কাহিনীর পট-ভূমিকায় রহিয়াছে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ।

বঙ্কিমচন্দ্রের পটভূমিকা রচনা-পদ্ধতির আলোচনার স্থান এইখানে নাই। তবে তখনকার রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা কেমন করিয়া নবাব হইতে সাধারণ প্রজার গ্রাম্য জীবনযাত্রায় পর্য্যন্ত প্রতিফলিত হইয়াছিল তাহার চিত্র আঁকিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দলনী ও শৈবলিনীর ভাগ্যকে এক সূত্রে গাঁথিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শুধু পটভূমিকার মারফতে যে ঐক্য আসে তাহা লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সন্তুষ্ট থাকেন নাই। মনে হয় কাহিনী দুইটি অনাবশ্যক ভাবে দীর্ঘ হইয়া যাইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া তিনি অন্য কতকগুলি সূত্র খুঁজিয়াছেন। (কোন বিশেষ চরিত্রের মধ্য দিয়া এই কাহিনী দুইটিকে একত্র করা সম্ভব হইবে না দেখিয়া তিনি আকস্মিক মিলনের সাহায্য লইয়াছেন। দেশে যখন কোন প্রবল রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয় তখন অভ্যস্ত জীবনযাত্রার সীমারেখা অস্পষ্ট হইয়া যায়। যাহাদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ তাহারা পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, আর যাহারা কোন কালে পরিচিত হইত না তাহারা একত্রিত হয় কিন্তু একত্রিত হইয়াও একে অপরের মনের কথা বুঝিতে পারে না। এই অপ্রত্যাশিত বিচ্ছেদ ও সম্পর্কের কাহিনীকে বঙ্কিমচন্দ্র নানা বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন।) দলনী বেগম থাকিত নবাবের অন্তঃপুরে যেখানে চন্দ্র সূর্য্য প্রবেশ করিতে পারিত না। অবস্থার বিপর্য্যয়ে সে আশ্রয়হীন হইয়া নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইল, নবাবের অন্তঃপুরে আর ফিরিতে পারিল না। শৈবলিনী ছিল গ্রাম্য কুলবধূ। কুঠিয়াল সাহেব তাহাকে ছিনাইয়া আনিল। তাহার পর সে ইংরেজকে বিফল মনোরথ করিয়াছে, নবাবের সঙ্গে চাতুরি করিয়াছে, গঙ্গাবক্ষে সাঁতার দিয়া পলায়ন করিয়াছে, পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া নিদারুণ

প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। এই সমস্ত বিচিত্র ও পরমাশ্চর্য্য ঘটনার সম্মিলনে দুই একটি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে ; যথাস্থানে তাহার বিস্তৃত বিচার করা যাইবে। কিন্তু ইহাদের সমাবেশে যে অসাধারণ কলানৈপুণ্যের পরিচয় রহিয়াছে তাহা অতি সহজেই অনুমিত হইবে। বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব তাঁহার রাজ্য হারাইতে বসিয়াছেন ; ইংরেজ বণিক ক্রমশঃ রাজদণ্ড গ্রহণ করিতেছে। এই সংঘর্ষে যে প্রলয়ের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ঢেউ আসিয়া পড়িয়াছে বেদগ্রামের এক নিরীহ ব্রাহ্মণ-পরিবারের উপর। এই ভাবে ইতিহাসের বিরাট্ আখ্যায়িকা ও সামাজিক জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনী একত্র মিলিত হইয়াছে।

'রজনী' এই যুগের দ্বিতীয় উপন্যাস। 'রজনী'র বক্তা চার জন, ইহাদের মধ্যে দুই জন পুরুষ এবং তাহারা উভয়েই রজনীর পাণিপ্রার্থী। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল চরিত্র ললিত-লবঙ্গলতা। তাহার একটু পূর্ব্ব ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাসের নায়ক অমরনাথ। দুইটি কাহিনী একত্র সংযুক্ত হইয়াছে অমরনাথের মারফতে, সে উভয় জায়গায়ই প্রধান। অমরনাথ ও লবঙ্গলতার ইতিহাসে শচীন্দ্রনাথ ও রজনীর কোন স্থান নাই। কাজেই সেই ইতিহাসের ধারাবাহিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা নাই। তাহা চকিতে আসিয়া পড়িয়াছে এবং উল্লিখিত হইয়াছে আভাসে। কিন্তু সেই আভাসগুলি অতিশয় ইঙ্গিতময় এবং তাহার সাহায্যে প্রধান কাহিনীকে সহজে বুঝিতে পারি। লবঙ্গলতার অস্বাভাবিক বাৎসল্য, অপরিসীম স্বামিসেবা ও অত্যধিক সন্ন্যাসি-ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি এবং অমরনাথ যে অতি সহজে সকল ত্যাগ করিয়া গেল তাহারও সম্পূর্ণ

ব্যাখ্যা পাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দুইটি কাহিনীকে একত্র করিবার জন্য শুধু অমরনাথেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই একটি রহস্যময় উত্তরাধিকার-সূত্রও আবিষ্কার করিয়াছেন। শচীন্দ্রনাথ রজনীর সম্পত্তি ভোগ করিতেছিল এবং অমরনাথ তাহা উদ্ধার করিয়া দিল। এই রহস্য গ্রন্থের মূল বিষয়, কাজেই ইহা না থাকিলে এই গ্রন্থ কিরূপ হইত অনুমান করা কঠিন। কিন্তু ইহাতে গ্রন্থের অনেকটা মূল্যহানিও হইয়াছে। হঠাৎ উত্তরাধিকারের নিষ্পত্তি হৃদয়ের আদানপ্রদান অপেক্ষা প্রাধান্য পাইয়াছে। উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য চরিত্রসৃষ্টি, তাই বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরাধিকার সমস্যাকে যত দূর সম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। তবু একবার যে প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন তাহাকে এড়ান মুস্কিল এবং তাহার জন্যই নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়। রজনী শচীন্দ্রনাথের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল প্রথম হইতেই; কিন্তু শচীন্দ্রের মনে অনুরাগের সঞ্চার হয় নাই। এমন সময় বিষয় লইয়া গোলযোগ উপস্থিত। তখন যদি শচীন্দ্র রজনীর প্রতি আসক্ত হয় তাহা হইলে তাহার নীচতা ধরা পড়ে। শচীন্দ্রনাথ সুশিক্ষিত ও মার্জ্জিতরুচি; টাকার জন্য অন্ধ মেয়েকে বিবাহ করিলে অথবা ভালবাসিতে আরম্ভ করিলে তাহার সঙ্গে গোপাল অথবা হীরালালের পার্থক্য থাকে না। সুতরাং অলৌকিক উপায়ে তাহার মনে অনুরাগ সঞ্চারিত হইতে হইবে। বলা বাহুল্য ইহাই উপন্যাসের মৌলিক ত্রুটি।

'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাস হইতে বঙ্কিমচন্দ্র যে কাহিনী পাইয়াছিলেন তাহা খুব দীর্ঘ ও প্রশস্ত। তিনি সেই কাহিনীকে খুব ছোট করিয়া লইয়াছেন। কোন কোন ঘটনা একেবারে বাদ

দিয়াছেন, আবার কোথাও ইতিহাসকে উপন্যাসের অঙ্গীভূত না করিয়া শুধু সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বিগ্রহের সঙ্গে একটি কাল্পনিক আখ্যায়িকাও যোগ করিয়া দিয়াছেন। ঐতিহাসিক ব্যাপারের প্রধান ব্যক্তি ঔরংজেব ও রাজসিংহ এবং তাহাদের যুদ্ধ প্রধান ঘটনা। কাল্পনিক আখ্যায়িকার নায়িকা ঔরংজেবের কন্যা এবং তাঁহারই পরামর্শে ও কৌশলে রূপনগরের রাজকুমারীকে আনিবার জন্য বাদশাহ সৈনা পাঠান এবং এই সৈন্যের একজন নায়ক জেব্‌উন্নিসার প্রণয়ী মবারক। এই সম্পর্কই যথেষ্ট নয় মনে করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মবারককে শেষযুদ্ধেও প্রাধান্য দিয়াছেন; তাঁহার কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই ঔরংজেব অতিশয় দুর্দ্দশাপন্ন হইলেন এবং রাজসিংহ সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে মবারককে আনিয়া কাহিনীর উপসংহার করিয়াছেন তাহার প্রশংসা করা যায় না। (ঐতিহাসিক উপন্যাসে কাল্পনিক আখ্যায়িকা থাকে; গ্রন্থকার দেখাইতে চেষ্টা করেন যে সমাজের দৈনন্দিন জীবনের উপরেও ইতিহাস তাহার বিশাল ছায়া ফেলে।) ইহাই ঐতিহাসিক উপন্যাসের রীতি। বঙ্কিমচন্দ্র এই রীতিকে উল্টাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই উপন্যাসে কাল্পনিক চরিত্র আসিয়া ইতিহাসের ঘটনাকে রূপান্তরিত করিয়াছে। মবারকের কাহিনী শুধু যে অবিশ্বাস্য তাহাই নহে, ইহার অনধিকার প্রবেশের ফলে ঐতিহাসিক উপন্যাস রূপকথায় পরিণত হইয়াছে।

('সীতারাম' বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশেষ উপন্যাস। আখ্যান ভাগের বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহার আলোচনা এইখানেই করিতে হইবে। সীতারামের প্রণয়কাহিনী এবং তৎসঙ্গে রাজ্যস্থাপনা ও রাজ্যনাশ এই গ্রন্থের

বর্ণনীয় বিষয়। তোরাব খাঁ, মৃণ্ময়, চন্দ্রচূড় প্রভৃতির চরিত্রে বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু তাহারা প্রত্যেকেই মূল কাহিনীর অন্তর্গত। সেই হিসাবে এই কাহিনী সরল ও অমিশ্র। অবশ্য গঙ্গারাম নিজে একটি ছোট কাহিনী রচনা করিয়াছে। কিন্তু এই কাহিনীকে মূল আখ্যান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা মুস্কিল। গঙ্গারাম যাহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল সে সীতারামের স্ত্রী, সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে সীতারামের সঙ্গে এবং তাহার হত্যার কারণ হইয়া শ্রী জ্যোতিষগণনা সার্থক করিয়াছে। কাজেই 'সীতারাম' বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিবিধ উপন্যাসের সীমারেখায় রহিয়াছে, ইহা সরল হইয়াও জটিল এবং জটিল হইয়াও সরল। ইহার আখ্যানভাগের আলোচনা করিলে সরল ও জটিল উপন্যাসের প্রভেদ অনুমিত হইবে। জটিল উপন্যাসে অন্যূন দুইটি আখ্যায়িকা থাকিবে এবং যে সূত্রের সাহায্যে তাহারা একত্রিত হইয়াছে তাহা উঠাইয়া দিলে তাহারা একে অপরের নিকট হইতে সরিয়া যাইবে—নবকুমার সরিয়া গেলে কপালকুণ্ডলা থাকিবেন উড়িষ্যার উপকূলে আর মতিবিবি থাকিবেন আগ্রার রাজপ্রাসাদে। কিন্তু সরল উপন্যাসে শুধু একটি মাত্র আখ্যায়িকা থাকিবে এবং তাহার অতিরিক্ত কোন কাহিনী থাকিলে তাহা যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করা হইবে এবং তাহা যে সর্ব্বতোভাবে মূল কাহিনীর অন্তর্গত তাহা সূচিত হইবে।

এই শ্রেণীর উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী'। রোহিণীর সঙ্গে হরলালের ও নিশাকরের প্রণয়সম্ভাষণ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বর্ণনায় গ্রন্থকার কালক্ষেপ করেন নাই।

আনন্দমঠে বহু সন্ন্যাসী থাকিতেন কিন্তু কেহ আখ্যায়িকায় প্রাধান্য লাভ করেন নাই, এই উপন্যাসের নায়ক আনন্দমঠ অথবা মহাপুরুষ চিকিৎসক। 'দেবী চৌধুরাণী'তেও তাই। ভবানীপাঠক, রঙ্গরাজ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া কোন কাহিনী গড়িয়া উঠে নাই। তাহারা প্রফুল্লের অনুচর মাত্র। এই জাতীয় উপন্যাসে সাধারণতঃ একটি দোষ থাকে। সমস্ত ঘটনা একটি কাহিনীতে সঙ্কুচিত হয় বলিয়া এই শ্রেণীর উপন্যাস নীরস হইয়া পড়ে। সুতরাং গ্রন্থকার চেষ্টা করেন কেমন করিয়া উপন্যাসের সরলতা নষ্ট না করিয়া বৈচিত্র্য আনা যায়। জটিল আখ্যায়িকায় গ্রন্থকার চেষ্টা করেন কেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে এক সূত্রে গাঁথিবেন আর এইখানে তাঁহার উদ্দেশ্য হয় কেমন করিয়া মূল কাহিনীর শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া সরসতা আনিবেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর মনের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দিয়াছেন। কেমন করিয়া কলঙ্কে বন্ধনে তাহার প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ হইল, কেমন করিয়া গোবিন্দলাল তাহার প্রতি আসক্ত হইলেন, কেমন করিয়া সরলা ভ্রমর সর্পীর কাছে পরাস্ত হইল তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়াছেন। রোহিণীর হৃদয়ের রহস্য নানা পর্দ্দার আড়ালে লুকাইয়া ছিল, গ্রন্থকার একটি একটি করিয়া সেই আবরণ সরাইয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থকার ভ্রমরের দৃষ্টি দিয়া সমস্ত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাহার ফলে রোহিণী গৌণ হইয়া গিয়াছে। অথচ ভ্রমরের মন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, তাহা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। তাই গ্রন্থকার এইখানে প্লটকে একটু ঘোরাল

করিয়াছেন। এই জন্য মাধবীনাথের আবির্ভাব, পোষ্টমাষ্টারের পরাজয়, ব্রহ্মানন্দের হাবু ডুবু খাওয়া।

'আনন্দমঠ' কোনও বিশেষ লোকের কাহিনী নহে। প্রত্যেক সন্ন্যাসীই এক সম্প্রদায়ের সভ্য মাত্র। * সুতরাং এই উপন্যাস সহজেই একঘেঁয়ে হইয়া যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র দুইটি উপায়ে বৈচিত্র্য আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি তিনটি যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন; প্রথম যুদ্ধ গৌণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুদ্ধই প্রধান। কিন্তু এই সকল যুদ্ধে কোন বৈচিত্র্য নাই; একটির বর্ণনা অপরটির রূপান্তর মাত্র। কাজেই এই চেষ্টা সার্থক হইল না। আর একটি উপায় প্রধান সেনাপতি ভবানন্দ ও জীবানন্দের পার্থক্য বর্ণনা। ইঁহারা উভয়েই ব্রতচ্যুত, উভয়েই প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। কিন্তু এক যুদ্ধে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন না। প্রথম প্রায়শ্চিত্ত করিলেন ভবানন্দ, তারপর করিলেন জীবানন্দ। বাস্তবিক পক্ষে ইহাই দুইটি যুদ্ধের মধ্যে বৈচিত্র্য

* জীবানন্দ ও শান্তির একটু পূর্ব্ব ইতিহাস ছিল। কিন্তু গ্রন্থকার তাহাকে অতিশয় সংক্ষেপে বলিয়াছেন। এই সামান্য বিষয়টি লক্ষ্য করিলেও এই জাতীয় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বুঝা যাইবে। শান্তি জীবানন্দকে ছাড়িয়া গিয়াছিল; তিনি তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন শুধু তাহার কথার উপর বিশ্বাস করিয়া। শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের নিকট হইতে অপহৃত হইয়াছিল। তাহাকে চন্দ্রশেখর যাহাতে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারেন, এই জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইয়াছে এবং সে যে ফষ্টরের উপপত্নীরূপে বাস করে নাই ইহা দেখাইবার জন্য বিস্তর সাক্ষ্য প্রমাণের সমাবেশ করা হইয়াছে। শান্তি শৈবলিনী অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির রমণী; কিন্তু যে দুই উপন্যাসে ইহাদের কথা বলা হইয়াছে তাহাদের কাহিনীও সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের।

আনিয়া দিয়াছে ; নচেৎ এই দুই যুদ্ধের বর্ণনার মধ্যে আর বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু এই বৈচিত্র্যও মৌলিক নহে ; ইহাকে যেন জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 'দেবী চৌধুরাণী'তেও গ্রন্থকার এই অসুবিধা বোধ করিয়াছেন। তজ্জন্য ভবানীপাঠক প্রভৃতিকে গ্রন্থভুক্ত করা হইয়াছে। তাহারা খানিকটা বৈচিত্র্য আনিয়াছে বটে। কিন্তু ভবানীপাঠক ও তাহাদের সম্প্রদায়ের কোন প্রত্যক্ষ চিত্র পাই না। ভবানীপাঠক যে ঠিক কি করিত, তাহার সম্প্রদায় কোন্ নীতিতে কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় নাই। যদি তাহা হইত তাহা হইলে প্রফুল্ল কল্যাণীর মত আড়ালে পড়িয়া যাইত; আমরা আর একখানা 'আনন্দমঠ' পাইতাম।

'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'—এই তিনখানি সরল ও অমিশ্র উপন্যাসের আলোচনার ফলে দেখিতে পাইলাম যে শেষের দুইখানিকে সরস ও বৈচিত্র্যময় করিবার চেষ্টা সার্থক হয় নাই ; এই দিক্ দিয়া 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (বিশেষ করিয়া তাহার প্রথম খণ্ড) অনেক শ্রেষ্ঠ। মোটামুটিভাবে ইহার একটি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। সরল উপন্যাসকে সজীব করিতে হইলে বিশ্লেষণের আশ্রয় গ্রহণ করা প্রশস্ত। যদি শুধু ঘটনার বৈচিত্র্য আনিবার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে হয় উপন্যাসের সরলতা নষ্ট হইবে অথবা যে অবান্তর ঘটনার অবতারণা করা হইবে তাহা একেবারে অবান্তরই থাকিয়া যাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুর্গেশনন্দিনী—কপালকুণ্ডলা—মৃণালিনী—বিষবৃক্ষ

(১)

'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস। ইহার পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে যে সকল উপন্যাস রচিত হইয়াছিল তাহা ইহার তুলনায় অতিশয় নগণ্য, তন্মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলাল' ছাড়া অন্য কাহারও নামোল্লেখও অনাবশ্যক। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে কোথাও কোথাও অপরিণতির লক্ষণ দেখা যায় বটে, কিন্তু মোটের উপর ইহা অতি উচ্চাঙ্গের উপন্যাস। ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে ৯৯৭ বঙ্গাব্দে নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ যে পথে একাকী গমন করিতেছিলেন বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসে তাহাই রাজপথ।

'দুর্গেশনন্দিনী' মোগল পাঠানের যুদ্ধের এক খণ্ডাংশ লইয়া রচিত। ইহাতে পাঠান কর্ত্তৃক গড়মান্দারণ বিজয়, পাঠান নবাব কতলুখাঁর মৃত্যু ও মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে সাময়িক সন্ধির উল্লেখ আছে। শশিশেখর ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণের দুই জারজ কন্যা ছিল। ইঁহাদের একজন ব্রাহ্মণকন্যা আর একজন শূদ্রী গর্ভজাত। ইঁহারা উভয়েই কালক্রমে গড় মান্দারণ দুর্গাধিপ বীরেন্দ্রসিংহের পত্নী হয়েন। প্রথমা একটি সন্তান প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। এই সন্তান দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমা গ্রন্থের নায়িকা। দ্বিতীয়া স্ত্রী বিমলা শূদ্রীকন্যা বলিয়া বীরেন্দ্রসিংহের গৃহে পরিচারিকারূপে বাস করিতেন। তাঁহার সঙ্গে

বীরেন্দ্রের প্রকৃত সম্বন্ধ সাধারণ লোকের জানা ছিল না। শশিশেখর ভট্টাচার্য্য সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া অভিরামস্বামী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গড়মান্দারণে বাস করিতেছিলেন।

মোগল পাঠানের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে অভিরামস্বামীর পরামর্শানুসারে বীরেন্দ্র মোগলের পক্ষাবলম্বন করিলেন। একদিন শৈলেশ্বরের মন্দিরে মোগল সেনাপতি মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের সহিত বিমলা ও তিলোত্তমার সাক্ষাৎ হয়; সেই ক্ষণিক সাক্ষাতেই জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার মধ্যে গভীর প্রণয় সঞ্চারিত হয়। পক্ষকাল পরে রাত্রিতে জগৎসিংহ বিমলার সঙ্গে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন এবং বিমলার অসাবধানতার সুবিধা পাইয়া পাঠান সেনাপতি ওসমান সসৈন্যে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন। দুর্গ পাঠানদের অধিকারে আসিল। জগৎসিংহ যুদ্ধ করিতে করিতে আহত হইয়া বন্দী হইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ, তিলোত্তমা, বিমলাও বন্দী হইলেন।

পাঠান শিবিরে জগৎসিংহ এবং নবাব কতলুখাঁর কন্যা আয়েষার তত্ত্বাবধানে রহিলেন। বিমলা ও তিলোত্তমাকে কতলুখাঁর উপপত্নীদের আবাসে রাখা হইল। বীরেন্দ্রসিংহের বিচার হইল—তিনি বিদ্রোহীর চরমদণ্ড পাইলেন। ওসমানের দয়ায় বিমলা অন্তিমকালে বধ্যভূমিতে উপস্থিত ছিলেন। ওসমান আয়েষার প্রণয়ী কিন্তু আয়েষা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি ওসমানকে ভ্রাতা বলিয়া স্নেহ করেন এই পর্য্যন্ত। আয়েষার যত্নে জগৎসিংহ আরোগ্যলাভ করিলেন এবং আয়েষা তাঁহার প্রতি আসক্ত হইলেন। জগৎসিংহ শুনিতে পাইলেন তিলোত্তমা কতলুখাঁর উপপত্নী; ইহা শোনা মাত্র

নিজের হৃদয় হইতে তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন। আরোগ্য লাভ করার পর জগৎসিংহ কারাগারে নীত হইলেন এবং সেইখানে কতলুখাঁর জন্মোৎসব রাত্রিতে তিলোত্তমা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কারাগারে ওস্‌মানের সমক্ষে আয়েষা মুক্তকণ্ঠ হইয়া তাঁহার প্রণয় ব্যক্ত করিলেন। সেই রাত্রিতেই বিমলা কতলুখাঁকে হত্যা করিয়া স্বামিবধের প্রতিশোধ লইলেন। মৃত্যুকালে কতলুখাঁ জগৎসিংহকে মুক্তি দিয়া সন্ধি-স্থাপনের জন্য অনুরোধ করিলেন এবং তিলোত্তমার সতীত্বের সাক্ষ্য দিয়া গেলেন।

ইহার পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। জগৎসিংহ প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ইহা জানিয়া ওস্‌মান তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। যুদ্ধে জগৎ সিংহের জয় হইল কিন্তু তিনি ওস্‌মানের কোন ক্ষতি করিলেন না। জগৎসিংহের সঙ্গে তিলোত্তমার বিবাহ হইল।

এই উপন্যাস ঘটনাবহুল; কিন্তু ইহাতে বর্ণিত সময় খুব কম। প্রথম খণ্ডে যে সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহাতে মাত্র চৌদ্দ দিন সময় লাগিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যায়িকার গতি আরও ক্ষিপ্র। জগৎসিংহের আরোগ্যলাভের পূর্ব্বে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে মাত্র দুই দিন গিয়াছে। ইহার পর একটি পরিচ্ছেদে সময়ের গতি অনির্দ্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শুধু জানাইয়াছেন যে জগৎসিংহের আরোগ্যলাভ হইতে কিছু সময় লাগিয়াছিল। আরোগ্য-লাভের পর কতলু খাঁর জন্মোৎসব পর্য্যন্ত যে সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহাতে আরও দুই দিন গিয়াছে। এই জন্মোৎসবের রাত্রিটি অতিশয় ঘটনা বহুল এবং ইহাই ছয়টি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার

পরই জগৎসিংহের কারামুক্তি এবং সন্ধিবিগ্রহ। "সন্ধি সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ও শিবির ভঙ্গোদ্যোগ করিতে কিছুদিন গত হইল।" সন্ধির পর জগৎসিংহ-ওস্মানের যুদ্ধ ও তিলোত্তমার বিবাহ। ইহাতে মাত্র পাঁচ দিন সময় লাগিয়াছিল। জগৎসিংহের আরোগ্যলাভ করিতে ও সন্ধি সম্বন্ধ করিতে কত দিন অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা নির্দিষ্ট হয় নাই। এই সময়ের কোন মূল্যও নাই, কারণ এই সময়ের মধ্যে চরিত্রে অথবা ঘটনা সংস্থাপনে কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। যে কয়দিন জগৎসিংহ আয়েষার কাছে ছিলেন সেই কয়দিনে তিনি আয়েষার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তিলোত্তমাকে ভুলিতে পারিতেন অথবা দুই পরস্পরবিরোধী প্রেমে তাঁহার চিত্ত দীর্ণ হইতে পারিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেই পরিণতিকে এড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি যে সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন তাহা ঘটিতে চব্বিশ দিনও লাগে নাই।

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রেমের উপন্যাস। কিন্তু প্রেমের কাহিনীর পট-ভূমিকায় রহিয়াছে মোগল-পাঠানের যুদ্ধ। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে 'দুর্গেশনন্দিনী' ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে, তবু তিনি ইতিহাসের আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। শুধু যে ইতিহাসের ঘটনারই যথাযথ বর্ণনা দিয়াছেন তাহা নহে, মোগল-পাঠান ও হিন্দুমুসলমানের সম্পর্কের চিত্র আঁকিয়া ব্যক্তিগত কাহিনীকে ইতিহাসের বিশালতা দান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম উপন্যাসেই এই সময়কার আখ্যায়িকা নির্ব্বাচন করার একটা কারণ বোধ হয় এই যে বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চদশ ও যোড়শ শতাব্দীর পাঠানশাসনকে বাঙ্গালার আদর্শ যুগ বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং এই সময়কার ইতিহাস যে বঙ্কিমচন্দ্রের

কল্পনাকে সর্ব্ব প্রথমে আলোড়িত করিবে ইহা স্বাভাবিক। ওস্‌মান পাঠানকুলতিলক ; তাঁহার বুদ্ধি, চতুরতা, আত্মসম্মানবোধ, পরের মর্য্যাদা ও অবস্থার প্রতি বিবেচনা অতুলনীয়। তাঁহার গুণের অবধি নাই ; সর্ব্বোপরি তাঁহার এমন একটি culture (বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন' ইহার খাঁটি প্রতিশব্দ হইবে না) আছে যাহা সভ্যতার চরম পরিণতির পরিচায়ক। আয়েষার মহত্ত্বের কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। * বঙ্কিম জগৎসিংহকেও সর্ব্বাংশে ওস্‌মানের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। রাজপুত জাতি ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের শীর্ষ স্থানীয়। জগৎসিংহ রাজপুতকুলগৌরব।

কিন্তু এই ঐতিহাসিক চিত্র আঁকিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটি অসুবিধায় পড়িয়াছেন। পাঠানদের সভ্যতার কথা তিনি নানা বিক্ষিপ্ত নিদর্শন হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। তখনকার সামাজিক জীবনের কোন বিশদ্‌ ও বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা নাই। যে সামাজিক অবস্থায় মোগল বাদশাহের একজন রাজপুত সেনাপতি বন্দী হইয়া অনায়াসে শত্রুর অন্তঃপুরে নবাবনন্দিনীর কাছে সহোদরাধিক যত্ন পাইয়াছিলেন সেই অবস্থার কোন স্পষ্ট চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ছিল না। তিনি ইহার

* অবশ্য কতলু খাঁ ইঁহাদের মত নহেন। কিন্তু উপন্যাসে তাঁহার নিকৃষ্টতাই প্রতিপন্ন করার প্রয়োজন হইয়াছে। নচেৎ জগৎসিংহের মনে সহসা সন্দেহ জাগরণ করা যাইবে না এবং বিমলার জিঘাংসার ও একাধিক কারণ দেখান প্রয়োজন। যে নবাবের ওস্‌মানের মত সেনাপতি থাকে এবং যাঁহার অন্তঃপুরে শত্রু রাজসিক শুশ্রূষা পাইতে পারে তাঁহার ব্যক্তিগত পৈশাচিকতায় পাঠান সভ্যতা কলঙ্কিত হয় না। অবশ্য তাঁহার বহু উপপত্নী ছিল। কিন্তু মানসিংহ প্রভৃতি রাজপুতবীরগণও বহুবল্লভ।

কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু সেই কল্পনাকে রূপ দিতে হইলে যে মাল-মশলার দরকার তাহা তিনি পান নাই। সুতরাং তাঁহাকে জোর দিতে হইয়াছে ওস্‌মান ও আয়েষার ব্যক্তিগত মহত্ত্বের উপর। এই কারণে তাঁহার চিত্র সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হয় নাই। ইহা পুরোপুরি রোমান্স, ইহার মধ্যে রূপকথার প্রভাবও লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

আখ্যানের পরিবেশকে বিস্তৃত করিতে পারা যাইবে না মনে করিয়া গ্রন্থকার ইহাকে অতিশয় ঘটনাবহুল করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রথম খণ্ডের প্রধান চরিত্র বিমলা। আখ্যায়িকাটিকে সমগ্র ভাবে দেখিলে বিমলার প্রাধান্য চলিয়া যায়। সুতরাং অংশ বিশেষে তাঁহাকে এইরূপ মুখ্য করায় উপন্যাসের গঠন একটু বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এই মৌলিক ত্রুটি ছাড়িয়া দিলে প্রথমাংশের রচনাভঙ্গীতে অপূর্ব্ব কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার প্রথমে এক রহস্যের সৃষ্টি করিয়াছেন; তারপর আভাসে ইঙ্গিতে সেই রহস্যকে স্পষ্ট করিয়াছেন; কিন্তু এই ইঙ্গিতগুলি নূতন রহস্যের সঙ্কেত দিয়াছে। শেষে বিমলার পত্রে সকল রহস্য স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই বিষয়ের একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখি যে জগৎসিংহ আত্মপরিচয় দেওয়া মাত্র মন্দিরের পূজারিণীরা চমকিয়া উঠিলেন। ইহার পর দেখি যে তিলোত্তমা বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা; তাঁহার মাতা অতিশয় দরিদ্রা ছিলেন এবং বিমলা তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করেন। বিমলা কে? বিমলা সধবা না বিধবা? ইহার পরে দেখি অভিরাম স্বামী বলিতেছেন যে বীরেন্দ্রসিংহ অপেক্ষাও তিনি তাঁহার

কন্যা তিলোত্তমাকে অধিক স্নেহ করেন এবং মানসিংহ একবার বীরেন্দ্রকে ঘোরতর অপমান করিয়াছিলেন। বিমলার সঙ্গে অভিরাম স্বামীর যে আলাপ হইল তাহা হইতে বুঝা যায় যে বীরেন্দ্রসিংহের বংশে নীচ জাতীয় কন্যার বিবাহ হইয়াছে এবং এইরূপ বিবাহে বিমলার নিকট সম্বন্ধ আছে; ইহাও বুঝা গেল যে অভিরামস্বামী ও বিমলার মধ্যে সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। বীরেন্দ্রসিংহের সঙ্গে বিমলাব যে কথা হইল তাহা হইতে মনে হয় যে বিমলা বীরেন্দ্রসিংহের প্রণয়-ভাজন। তবে বিমলা কি? উপপত্নী?—উপপত্নীর এইরূপ প্রাধান্য সম্ভবেনা। পত্নী?—তাহা হইলে সে কথা স্পষ্ট করা হয় না কেন? আরও একটি সন্ধান পাওয়া গেল। বিমলার সহচরী আশমানী কুমার জগৎসিংহকে জানে এবং তাহার বিশ্বাস যে কুমারও তাহাকে চিনিতে পারিবেন। আরও দেখা গেল, পূর্ব্বে কোন একটা গোপনীয় ব্যাপারে আশ্‌মানী বিমলাকে সাহায্য করিয়াছে এবং "সেকালে" সে কোন প্রশ্ন না করিয়াই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছে। তবে সেই গোপনীয় ব্যাপারের সঙ্গে কি বীরেন্দ্রসিংহের অপমানের সম্বন্ধ আছে? আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। রহস্য যাহাই থাকুক তাহা কেবল অভিরামস্বামী, বীরেন্দ্রসিংহ ও বিমলাই জানেন, কারণ ইহাদের মন্ত্রণায় অন্য কেহ যোগদান করিতে পারে না এবং এই রহস্যের সঙ্গে তিলোত্তমাও বোধ হয় জড়িত আছেন, কারণ তিলোত্তমা বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা এবং সর্ব্বত্যাগী অভিরামস্বামী ও চতুরা বিমলা তাঁহার প্রতি অত্যধিক স্নেহশীল। এমনি করিয়া তিলে তিলে আমাদের কৌতূহল জাগরিত হইয়াছে; এবং একটি প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আর

একটি প্রশ্নের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। অতঃপর যখন দেখা যাইতেছে যে কাহিনী এই পথে আর অগ্রসর হইবে না তখন বিমলার পত্রে সকল কথা স্পষ্ট হইয়াছে।

রহস্যের সৃষ্টি ও উদ্ঘাটনের রীতি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে 'দুর্গেশনন্দিনী' ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাসেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাহা নহে। এই গ্রন্থে অনেকগুলি প্রখর ব্যক্তিত্বশালী চরিত্র একত্রিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের চতুরতা, দৃঢ়তা ও প্রবৃত্তির প্রাবল্যেই আখ্যান এত জটিল হইয়াছে। ওস্‌মান ও বিমলার বুদ্ধিমত্তা অনন্যসাধারণ এবং উভয়েই একবার করিয়া অপরের চোখে ধূলি দিয়াছে। বীরেন্দ্রসিংহ হয়ত খুব বুদ্ধিমান্‌ নহেন কিন্তু দৃঢ়চিত্ত। অভিরামস্বামীর জীবন ও চরিত্র সাধারণ সন্ন্যাসীদের জীবন ও চরিত্র অপেক্ষা অনেক বেশী বিচিত্র। তিলোত্তমা বিমলার জন্য একটু আড়ালে পড়িয়াছেন। ইহা এই উপন্যাসের একটি ত্রুটি। কিন্তু একটি দৃশ্যে তিলোত্তমা এই আড়াল ভেদ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন এবং সেইখানে বঙ্কিমচন্দ্র অনন্যসাধারণ কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণতঃ বঙ্কিমচন্দ্র প্রবৃত্তির অনাবৃত রূপ আমাদের চোখের সাম্‌নে ধরেন না। অন্য কাহারও দৃষ্টির সাহায্য গ্রহণ করেন অথবা একপাশ হইতে তাহার উপর আলো ফেলেন। এই গ্রন্থেও তিলোত্তমার সংবাদ আমরা বিমলার নিকট হইতেই পাই। তারপর তিলোত্তমা অতিশয় লজ্জাশীলা; কাজেই মনের কথা স্পষ্ট করিয়া বলা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু একটি অসাবধান মুহূর্তে তাঁহার গুপ্তপ্রেম লজ্জা ও সংযমকে ফাঁকি দিয়া প্রকাশ পাইল এবং

অজ্ঞাতসারে তিনি এক খণ্ড কাগজে কুমার জগৎসিংহের নাম লিখিয়া ফেলিলেন। তিলোত্তমা সেই লেখাকে জল দিয়া ধুইয়া মুছিতে অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তবু মনে হইল যে সে লেখা কিছুতেই মুছিয়া যায় না। তিলোত্তমা বুঝিতেছেন না যে ঐ লেখা দুরপনেয় হইয়া বিরাজ করিতেছে তাঁহার মনে; তাই কাগজে যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা অন্যের পক্ষে অদৃশ্য হইলেও তাঁহার কাছে অতিশয় স্পষ্ট। সকল আড়াল ভেদ করিয়া অনুভূতির অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষগোচর করার এই যে ক্ষমতা ইহা প্রথম শ্রেণীর শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় দেয়।

দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভেই এইরূপ চাতুর্য্যের আর একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। জগৎসিংহ আয়েষার কাছে বলিলেন যে স্বপ্নে তিনি এক দেবকন্যাকে দেখিয়াছেন যিনি তাঁহার শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা করিয়াছেন এবং প্রশ্ন করিলেন, "সে তুমি না তিলোত্তমা?" শুশ্রূষা কে করিয়াছেন তাহা আয়েষা বেশ জানিতেন। কিন্তু ইহাও তাঁহার স্পষ্ট প্রতীতি হইল যে অচৈতন্য অবস্থায় রাজকুমারের মুখ হইতে যে রমণীর নাম বাহির হইয়াছিল, তাঁহার হৃদয় সেই রমণীর কাছেই বিক্রীত। আয়েষা চিত্তসংযম করিতে শিখিয়াছিলেন, জগৎসিংহের হৃদয়ে নিজের স্থান গ্রহণ করিবার জন্য তিনি তিলোত্তমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গেলেন না। তিনি অতি অল্প কথায় নিজেকে আড়ালে সরাইয়া দিলেন। তিনি কহিলেন "আপনি তিলোত্তমাকে স্বপ্নে দেখিয়া থাকিবেন।" কথা অল্প, অথচ অপরূপইঙ্গিতপূর্ণ। আয়েষার সংযমের চিত্র অতি কৌশলের সহিত আঁকা হইয়াছে।

কিন্তু এই সংযমের অন্তরালে যে প্রণয়বিধুর বেদনাকাতর হৃদয় ছিল তাহাকেও প্রকাশ করিতে হইবে। এই অংশে বিমলার ন্যায় কোন চরিত্র নাই। তাই আয়েষাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। যে সময়ে আয়েষা ও জগৎসিংহ একত্র ছিলেন তখন্ বঙ্কিমচন্দ্র এই অন্তঃসলিলা বেদনাকে রূপ দিতে পারেন নাই। পরে কারাগারে আয়েষা, ওস্‌মান ও জগৎ-সিংহের যখন সাক্ষাৎ হইল তখন উপন্যাসের গতি অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছে। আয়েষা এখন ক্রমশঃ অদৃশ্য হইবেন। তাই এইখানে ওসমানের ব্যঙ্গোক্তির উত্তরে আয়েষাকে মুক্তকণ্ঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে দিয়া গোপন গভীর ভালবাসা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়াইলেন। ইহা অতিশয় অশোভন; আয়েষার সহজ সংযমের সঙ্গে এই প্রগল্‌ভতার সঙ্গতিও নাই। ওস্‌মানের প্রশ্নের উত্তরে ঠিক ইহার পূর্ব্বেই আয়েষা বলিয়াছেন, "আমার কার্য্য উত্তম কি অধম সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই·········যখন পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তখন তাহার উত্তর দিব। তোমার চিন্তা নাই।" ইহার পর ওস্‌মান ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "আর যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি?" যে রমণীর সংযম এই ব্যঙ্গোক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অটুট রহিয়াছে, ইহার উত্তরে তাঁহার কিছুই বলিবার থাকে না। কিন্তু আয়েষা দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া নিজের প্রণয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই প্রণয় বিজ্ঞাপন অতিনাটকীয়। মনে হয় আয়েষা শুধু ওস্‌মান বা জগৎ-সিংহকেই বলিতেছেন না, পাঠককেও উদ্দেশ করিতেছেন। অতি নাটকোচিত রচনার ধর্ম্মই এই যে তাহা প্লটের প্রয়োজন মানিয়া

চলে না, গ্রন্থকারের মত ব্যাখ্যানকেই মুখ্য করে; আর পাত্রপাত্রীগণ শুধু পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়াই কথা বলে না, পাঠক (অথবা দর্শক)-কেও উদ্দেশ করিয়া থাকে। ইহার পর আয়েষা আর একবার নিজের মনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিলোত্তমার নিকট বিদায় লইবার সময়, জগৎসিংহের বর্ণনা করিতে যাইয়া আয়েষা বলিতেছেন, "·········আর আমার—তোমার সাররত্ন হৃদয় মধ্যে রাখিও।" 'তোমার সাররত্ন' বলিতে আয়েষার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল···।" "আমার" ও "তোমার"—ইহার মধ্যে গণ্ডগোল এবং এই কণ্ঠরোধ পূর্ব্ববক্তৃতার মত অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু ইহা অকিঞ্চিৎকর।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "যেমন উদ্যান মধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনি আয়েষা।" কিন্তু এই অসামান্য রমণীর হৃদয়ের অভিব্যক্তি দিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বত্র কাঁচা হাতের পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমতঃ আয়েষাকে আমরা কখনও একাকী দেখিতে পাই না। তাঁহার নীরব অনুভূতির কোন চিত্র নাই। আয়েষার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গ্রন্থবর্ণিত ঘটনার কোন সংস্রব নাই; আয়েষা ঘটনাচক্রকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই অথবা কোন উল্লেখযোগ্য নূতন ঘটনার প্রবর্ত্তন করেন নাই। ইহা দ্বিতীয় প্রধান ত্রুটি। আয়েষা না থাকিলেও জগৎসিংহের শুশ্রূষা হইত এবং আয়েষা কারামুক্তির যে প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন তাহা জগৎসিংহ গ্রহণ করেন নাই। শুধু একটি ঘটনার সঙ্গে তাঁহার চরিত্রের সংযোগ আছে—ওস্মান ও জগৎসিংহের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ গ্রন্থের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বিষয়। যুদ্ধের ফল সম্পর্কে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। ওস্মান যুদ্ধ করিয়াছিলেন উন্মত্ত হইয়া,

জগৎসিংহ তখন বীতরাগভয়ক্রোধ। কাজেই এই সময় যুদ্ধে জগৎসিংহের জয় হওয়া স্বাভাবিক। বাহুবল প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে চরিত্র-গৌরবের সম্বন্ধ নাও থাকিতে পারে। উপন্যাসের আরম্ভ হইতে এই মল্লযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ওসমান বুদ্ধি, হৃদয়ের প্রশস্ততা ও মার্জ্জিত রুচির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে এইরূপ বর্ব্বরতা শুধু যে অশোভন তাহা নহে, অবিশ্বাস্যও। যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া প্রণয়িনীকে লাভ করিবার চেষ্টা বিরল নহে। কিন্তু ওসমান সেই শ্রেণীর মানুষ নহেন। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ওসমান আত্মবিশ্বাস পরায়ণ হইলেও দাম্ভিক নহেন। বরং একবার জগৎসিংহ আস্ফালন করিবার চেষ্টা করিলে তিনি সহজেই তাঁহাকে থামাইয়া বলিলেন,— "রাজপুত্র আমরা পরস্পর সন্নিধানে এরূপ পরিচিত আছি যে, মিথ্যা বাগাড়ম্বর কাহারও উদ্দেশ্য হইতে পারে না।" সেই ওসমান জগৎসিংহকে পদাঘাত করিয়া যুদ্ধে প্ররোচিত করিবেন এবং উভয়ে বাগ্‌যুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত হইবেন ইহাতে বড়ই খট্‌কা লাগে। প্রণয় বা অন্য কোন প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ হঠাৎ বেমানান কাজ করিতে পারে। কিন্তু প্ল্যান করিয়া চিন্তা করিয়া কাজ করিতে গেলে বুদ্ধি ও রুচির সঙ্গে বোঝাপাড়া করিতে হয়। এই মল্লযুদ্ধের দৃশ্যটি কারাগারের দৃশ্যের অনুরূপ। সেইখানে আয়েষা অসংযতকণ্ঠ, এইখানে ওসমান বাক্যে ও কার্য্যে অসংযত।

এই গ্রন্থে প্রকৃত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র বাহিরে ওসমান ও জগৎসিংহের যুদ্ধে নহে, জগৎসিংহের হৃদয়ে। আয়েষা জগৎসিংহের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে দেখা গেল যে কুমারের হৃদয় তিলোত্তমা

অধিকার করিয়া রহিয়াছেন অমনি সেই সংযতচরিত্র রমণী ভিড় না করিয়া সরিয়া দাঁড়াইবেন ইহা অস্বাভাবিক নহে। জগৎসিংহের পক্ষে সেকথা খাঁটে না। তাঁহার সঙ্গে তিলোত্তমার সাক্ষাৎ হইয়াছে দুই দিন অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু আয়েষার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে অনেক দিন ধরিয়া অতি ঘনিষ্ঠভাবে এবং আয়েষার মনের কথাও তিনি জানিয়াছেন। আয়েষা স্পষ্ট করিয়া তাহা জানাইয়া দিয়াছেন, না জানাইলেও তাহা অনুমান করা অসম্ভব নহে। সুতরাং তাঁহার হৃদয় বলিয়া কোন বস্তু থাকিলে এই দুই পরস্পর বিরোধী আকর্ষণের মধ্যে দ্বন্দ্ব হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যাইতেছে তিনি তিলোত্তমা সম্পর্কে উন্মত্ত এবং আয়েষার সম্পর্কে নির্ব্বিকার। এমন কি যখন তিলোত্তমাকে বিসর্জ্জন দিতেছেন তখনও আয়েষার কথা তাঁহার মনে রেখাপাত করিতে পারিতেছে না। বাস্তবিক পক্ষে জগৎসিংহের চরিত্র চিত্রণ এই উপন্যাসের সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ত্রুটি। সমস্ত বিষয়েই ইহা অপরিণত শিল্পকৌশলের পরিচয় দেয়। তিলোত্তমাকে জগৎসিংহ দেখিয়াছিলেন এক মুহূর্ত্তের জন্য; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তের দেখাতেই তাঁহার মন এমন চঞ্চল হইল যে তিনি কোথাও স্থির থাকিতে পারিলেন না এবং যে রমণীকে পাইবেন না স্থির জানিয়াছেন তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্যই তিনি ব্যগ্র হইলেন। ইহা শিল্পীর সুন্দরকে দেখিবার ইচ্ছা না কামুকের ক্ষণিক চরিতার্থতার আকাঙ্ক্ষা? ইহার পরের ব্যাপারে জগৎসিংহ আরও ছোট হইয়া পড়েন। তিলোত্তমার স্খলনের কথা তিনি শুনিলেন গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের কাছে যাঁহার কথায় কোন বুদ্ধিমান্ লোকই আস্থা স্থাপন করিবেনা। ওস্‌মান অবশ্য দিগ্‌গজের

কথার সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে অতি সাধারণভাবে। জগৎসিংহ অন্য কোন প্রমাণ না পাইয়াই প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইলেন। ইহা প্রকৃত প্রণয়ীর ধর্ম্ম নহে। ইহার পরের ঘটনা আরও আশ্চর্য্য। তিলোত্তমা জগৎসিংহের নিকট আসিয়া কারাগারে উপস্থিত হইলেন; জগৎসিংহ তাঁহার কোন কথা না শুনিয়া, তাঁহাকে কর্কশকণ্ঠে বিদায় দিলেন। একবার ভাবিয়া দেখিলেন না যে দিগ্‌গজের কথা সত্য হইলে তিলোত্তমা ঐ সময় ঐ অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন কেন? কতলুখাঁর অন্তিমকালের বর্ণনা একেবারে অবিশ্বাস্য। বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তাঁহার অবরোধে ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে নবাবের সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হয় নাই। বীরেন্দ্রসিংহের স্ত্রীর পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে প্রাণহন্ত্রীর নাম করিয়া যাইবেন ইহাই স্বাভাবিক। জগৎসিংহের সঙ্গে বীরেন্দ্রসিংহের কন্যার কি সম্পর্ক তাহা তিনি জানিতেন এমন কোন প্রমাণ গ্রন্থে নাই। অথচ মরিবার পূর্ব্বে তিনি বীরেন্দ্রসিংহের যে কন্যাকে দেখেন নাই তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের সাধুবাদ জানাইতেই ব্যস্ত। যে আগ্রহ ও দুশ্চিন্তা অভিরাম স্বামীতে স্বাভাবিক হইত তাহাই কতলুখাঁতে আরোপিত হইয়াছে।

উপন্যাসের এই অংশে আরও অনেক ত্রুটি আছে এবং অধিকাংশ ত্রুটিই জগৎসিংহের চরিত্রচিত্রণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। জগৎসিংহ বীর; কিন্তু গ্রন্থমধ্যে তাঁহার বীরত্ব অপেক্ষা আস্ফালনের পরিচয় অনেক বেশী। দেবমন্দিরে অসহায় রমণীদের কাছে, বিজয়ী শত্রুর সম্মুখে, শত্রুশিবিরে রোগশয্যায়, পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর বক্ষোপরি আসীন হইয়া—সর্ব্বত্রই তিনি স্বীয় বীরত্ব অথবা ঔদার্য্যের আস্ফালন

করিয়াছেন। একথা বলা যাইতে পারে যে গ্রন্থের নায়ককে নির্দোষ-চরিত্র হইতে হইবে এমন কোন বিধি নাই। কিন্তু জগৎসিংহের চরিত্র যে কিরূপ শূন্যগর্ভ সেই সম্পর্কে কেহ সচেতন এমন মনে হয় না। মানসিংহের পুত্রগৌরব ও তিলোত্তমার প্রণয়বিহ্বলতা মার্জ্জনীয়। বিমলা চতুরা, কিন্তু জগৎসিংহকে সম্পূর্ণ চিনিতে পারেন নাই। বিমলা বহুদিন অম্বর রাজগৃহে পরিচারিকা ছিলেন, কাজেই অম্বরের যুবরাজের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধা তাঁহার পক্ষে অশোভন নহে। আয়েষা বুদ্ধিমতী কিন্তু জগৎসিংহ সম্পর্কে অন্ধ। মনে হয় গ্রন্থকার নিজেই জগৎসিংহকে অনেক বেশী মূল্য দিয়া ফেলিয়াছেন। তাই গ্রন্থের বহুস্থানে পরিমাণবোধের অভাব দেখা যায়।

'দুর্গেশনন্দিনী'র আলোচনায় গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের কথা না বলিলে তাঁহার দেহের দৈর্ঘ্য ও বুদ্ধির গাঢ়তার প্রতি অবিচার করা হইবে। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমের হাস্যরসের উপর অধিকারেরও আলোচনা করিতে হইবে। হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কূট ও গভীর তর্কগুলি ছাড়িয়া দিয়া মোটামুটি ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে যাহাকে লইয়া আমরা রসিকতা করিয়া থাকি তাহার চরিত্রে দুই একটি দুর্ব্বলতা থাকে এবং তাহাই আমাদের রসিকতার লক্ষ্য। অনেক ক্ষেত্রে এই দুর্ব্বলতা খুব স্পষ্ট এবং সহজেই ইহাকে চরিত্রের অন্যান্য দোষগুণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায়। কোন কোন হাস্যরসিক এইরূপ আলগাভাবে দৃষ্টিপাত করেন। তাঁহাদের রসিকতা একটু নীচ শ্রেণীর, কারণ জীবনের গভীরতর স্রোতের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কম। 'আলালের ঘরের দুলাল' এই জাতীয় বহু চরিত্রে পরিপূর্ণ। যাহাতে সহজেই রসিকতার বিষয়টি ধরা পড়ে

এই জন্য কেহ কেহ শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্যকেও লক্ষ্য করেন। টেকচাঁদ ঠাকুর অঙ্কিত অধিকাংশ চরিত্রের অঙ্গভঙ্গী হাস্যোদ্দীপক। ডিকেন্সেও এই জাতীয় রসিকতার প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলিতে গভীরতর অনুভূতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। মিক'বার সর্ব্বদা ভবিষ্যতের অলীক স্বপ্ন দেখিত এবং সেই সম্পর্কে একটি কথারই বারংবার পুনরাবৃত্তি করিত। কিন্তু এই অলীক স্বপ্ন দেখা শুধু যে একটা বাতিক তাহা নহে; জীবনের বৃহত্তর সংগ্রাম মিক'বারের পক্ষে সহনীয় হইয়াছিল এই স্বপ্নের জন্যই এবং একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে আমরা সবাই কখনও না কখনও মিক'বারের অস্ত্র দিয়া বর্ত্তমানের দুঃখ ও বিপদ্‌কে ঠেকাইয়া রাখি। শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকগণ সর্ব্বত্র হাস্যোদ্দীপক দুর্ব্বলতার সঙ্গে চরিত্রের গভীরতর সুরের সংযোগ দেখান। বঙ্কিমচন্দ্রের গজপতি বিদ্যা দিগ্‌গজে এই গভীরতর সংযোগের পরিচয় পাই না। তাঁহার দেহের দৈর্ঘ্য, নাসিকার মাংসবহুলতা, বুদ্ধির স্বল্পতা ও অর্থহীন রসিকতার এত পরিচয় পাই যে তাঁহাকে একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ বলিয়াই মনে হয় না। তাঁহাকে জড়পদার্থ বলিয়া ভ্রম হয়। এই চরিত্রসৃষ্টিতে টেকচাঁদী ঢঙের পরিচয় পাওয়া যায়।

আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করিয়া 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিচার শেষ করিব। এই গ্রন্থের প্রকাশের পর হইতেই কেহ কেহ অনুমান করিয়াছিলেন যে ইহার উপর স্কটের আইভ্যান হো'র প্রভাব আছে। উভয় উপন্যাসে দুর্গ অবরোধের কথা আছে, রাজবংশসম্ভূতা রোয়েনা ও দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমার মধ্যে সাদৃশ্য আছে, রেবেকার সেবানিরত

রুদ্ধ প্রেম আয়েষার প্রেমের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, উভয় গ্রন্থের শেষের দৃশ্যে বিবাহ ও ব্যর্থ প্রণয়িনীর করুণ বিদায় বর্ণিত হইয়াছে। যেখানে সাদৃশ্য এত স্পষ্ট সেইখানে প্রভাব অনুমান করা অসম্ভব নহে। বঙ্কিমচন্দ্রকে এই কথা বলা হইলে তিনি উত্তরে জানাইয়াছিলেন যে 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিবার পূর্ব্বে তিনি 'আইভ্যান হো' পড়েন নাই। ইহার পর সাক্ষাৎ প্রভাবের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। স্কট ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই রোমাণ্টিক ঔপন্যাসিক, উভয়েই প্রাচীন কালের কাহিনীকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং ইঁহাদের কল্পনার গতি একই রকমের হইবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। এই সাদৃশ্য প্রতিভার সার্ব্বভৌমিকতাই প্রমাণ করে।

কিন্তু কোন কোন বিষয়ে মিল থাকিলেও এই দুই গ্রন্থের মধ্যে প্রভেদও অনেক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ইতিহাসের মাল মশলা ছিল খুবই কম এবং তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে কল্পনার উপর। এই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, প্রণয়ের আদানপ্রদানের চিত্রের উপর জোর দিয়াছেন, ব্যক্তির অন্তরালে সমাজের যে জীবন আছে তাহা তাঁহার উপন্যাসে প্রস্ফুট হয় নাই। স্কট্ ইতিহাসের তথ্য পাইয়াছিলেন প্রচুর। আইভ্যান্ হো ও রোয়েনার কাহিনী উপলক্ষ্য করিয়া তিনি নর্ম্ম্যান্ ও স্যাক্সন্, য়িহুদী ও ক্রীশ্চ্যান; রাজা রিচার্ড ও তাঁহার ভ্রাতা জন্—ইহাদের সংঘর্ষ ও সম্মিলনের চিত্র আঁকিয়াছেন। মধ্য যুগের আমোদপ্রিয় ধর্ম্মযাজক, মদোদ্ধত নর্ম্ম্যান্ যোদ্ধা ও জমিদার, উচ্ছৃঙ্খল রবিন্‌হুড্ ও তাহার সম্প্রদায়—ইহদের চিত্র আঁকিয়া তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসকে

সম্পূর্ণতা দান করিয়াছেন। ' সর্ব্বত্র যে ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন তাহা নহে। কিন্তু তাঁহার চিত্র যেমন বিস্তৃত তেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ, এমনকি নর্ম্যান্ ও স্যাক্সনদের ভাষাগত প্রভেদ এবং সে প্রভেদ কেমন করিয়া সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার বর্ণনাও খুব প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের এইরূপ বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র আঁকিতে পারেন নাই ; এইজন্য তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার উপন্যাসে ব্যক্তিগত কাহিনী অধিকতর স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। 'আইভ্যান হো'তে বিমলার মত কোন চরিত্র নাই। আয়েষা ও রেবেকার মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা পার্থক্যই বেশী। রেবেকা নির্য্যাতিত য়িহুদীর কন্যা ; তাহার পক্ষে আইভ্যান হো'র মত শ্রেষ্ঠ খৃষ্টান যুবকের প্রণয় প্রার্থনা করা বাতুলতামাত্র। কিন্তু আয়েষা নবাবনন্দিনী, বিজেতার কন্যা—জগৎসিংহ তাঁহার বন্দী। অথচ আয়েষা জগৎসিংহের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াও নিজ সুখদুঃখ জগদীশ্বরের চরণে সমর্পণ করিলেন, জগৎসিংহকে জয় করিতে চেষ্টা করিলেন না। এই আত্মবিসর্জ্জন রেবেকার ত্যাগ হইতে বিভিন্ন। এইখানে বঙ্কিম-চন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্বের আভাস আছে। কাহিনীর গঠনেও 'দুর্গেশনন্দিনী' অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ। আইভ্যান্ হো নিজ গৃহে ফিরিলেন কিন্তু কেহই বুঝিল না, এই আগন্তুক কে। রাজা রিচার্ডকেও কেহ চিনিতে পারিতেছে না। এই সব ব্যাপার একেবারে অবিশ্বাস্য ; অথচ উপন্যাসের অনেকখানি নির্ভর করিয়াছে এই সকল অবিশ্বাস্য ঘটনার উপরে। এই কারণেই 'আইভ্যান্ হো' কিশোর কিশোরীর উপন্যাস।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে বহু ত্রুটি আছে, কিন্তু তাহার সম্পর্কে এই কথা বলা চলে না।

(২)

'কপালকুণ্ডলা'র বর্ণিত কাহিনী আকবর বাদশাহের রাজত্বের শেষ সময়ে আরম্ভ হইয়াছে। সপ্তগ্রামনিবাসী নবকুমার শর্ম্মার শ্বশুর মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আগ্রায় চলিয়া গিয়াছিলেন। নবকুমারের স্ত্রীও সেই সঙ্গে গিয়াছিলেন। সুতরাং নবকুমার বিবাহিত হইয়াও বিপত্নীক। একবার নবকুমার তীর্থদর্শনে যাইয়া সঙ্গীদের দ্বারা সমুদ্রের জনহীন উপকূলে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। সেইখানে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল এক তান্ত্রিক কাপালিকের। কাপালিক তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন কিন্তু পরদিনই নিজ সাধনার সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কাপালিকের সঙ্গে কপালকুণ্ডলা নামে এক যুবতী বাস করিতেন। ইঁহার সাহায্যে নবকুমার মুক্ত হইলেন এবং ইঁহারই সঙ্গে পলায়ন করিয়া তিনি এক অধিকারীর গৃহে আশ্রয় পাইলেন। অধিকারীর পরামর্শে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিলেন। প্রকৃতিপ্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলা বিবাহ প্রভৃতি লৌকিক আচার সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। তিনি না বুঝিয়াই সম্মত হইলেন এবং স্বামীর সঙ্গে সপ্তগ্রাম যাত্রা করিলেন।

পথে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার সঙ্গে এক পরমাশ্চর্য্য মুসলমান রমণীর দেখা হইল। ইনি আগ্রার রঙমহলের একজন প্রধানা নায়িকা; রাজকার্য্যে উড়িষ্যা হইতে আগ্রা ফিরিতেছিলেন। নবকুমার

বুঝিতে পারিলেন না যে এই মুসলমানীই তাঁহার প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী। এখন ইহার নাম হইয়াছে মতিবিবি। ইনি নবকুমারকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। মতি সংবাদ পাইলেন যে আকবর বাদ্‌শাহের মৃত্যু হইয়াছে এবং সেলিম বাদ্‌শাহ হইয়াছেন। মতি সেলিমের বেগম না হইলেও অনুগৃহীতাদের মধ্যে প্রথমা এবং বাদ্‌শাহের প্রধানা মহিষী হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল। পথে কণ্টক শের আফগানের পত্নী তাঁহার বাল্যসখী মেহের উন্নিসা। মেহের উন্নিসার সঙ্গে দেখা করিতে মতি বর্দ্ধমানে গেলেন এবং তথায় যাইয়া বুঝিলেন যে মেহের উন্নিসা সেলিমের প্রতি গভীর ভাবে অনুরক্ত। সুতরাং প্রধানা বেগম হইবার ভরসা তাঁহার রহিল না। ইতিমধ্যে তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষাও বিলুপ্ত হইতে লাগিল। আগ্রার রাজপ্রাসাদে মতিবিবি কামনার পরিতৃপ্তি খুঁজিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত প্রণয়ের সন্ধান পান নাই। নবকুমারকে দেখিয়া তাঁহার মনে গভীর অনুরাগ সঞ্চারিত হইল। তিনি আগ্রায় ফিরিয়া বাদ্‌শাহের নিকট বিদায় লইয়া সপ্তগ্রামে চলিয়া আসিলেন নবকুমারকে লাভ করিবার জন্য। নবকুমার তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। মতির মনে হইল যে নবকুমারকে কপালকুণ্ডলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে তাঁহার পথ সহজ হইবে। এই কাজে তাঁহার এক অপ্রত্যাশিত সহায় জুটিল। সেই সমুদ্রতীরবাসী কাপালিক স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন যে কপালকুণ্ডলাকেই দেবীর কাছে উৎসর্গ করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে পরামর্শ হইতে লাগিল। মতির ইচ্ছা কপালকুণ্ডলার নির্ব্বাসন; কাপালিকের উদ্দেশ্য—বধ।

ইহাদের পরামর্শের মধ্যে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে ব্রাহ্মণ বেশধারী

মতিবিবির সাক্ষাৎ হইল। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের গৃহিণী—এখন লৌকিক আচার কিছু কিছু শিখিয়াছেন। কিন্তু সংসারে তাঁহার মন বসে নাই। তাঁহার মনে এখনও প্রকৃতির আকর্ষণ রহিয়াছে। তিনি ননদ শ্যামাসুন্দরীর জন্য স্বামীকে বশ করিবার ঔষধ আনিতে বনে যাইয়া ব্রাহ্মণ-বেশীর সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহার আচার ব্যবহারে বিশেষ করিয়া একটা চিঠির জন্য নবকুমারের সন্দেহ হইল যে ব্রাহ্মণবেশী তাঁহার উপপতি এবং কাপালিকের সঙ্গে নবকুমারের সাক্ষাৎ হইলে কাপালিক সেই সন্দেহ দৃঢ় করিয়া দিলেন। কাপালিকের হাত ভাঙিয়া গিয়াছিল; কাজেই কপালকুণ্ডলাকে বধ করিবার জন্য একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন। নবকুমার স্ত্রীকে বধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। বনে সমুদ্রতীরে বধের আয়োজন হইল। কপালকুণ্ডলার সঙ্গে দুই একটি কথা বলিয়াই নবকুমার বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার সন্দেহ কত অলীক। কিন্তু কপালকুণ্ডলা আর গৃহে ফিরিতে চাহিলেন না। ইঁহাদের কথোপকথন শেষ হইতে না হইতেই যে ভূমিতে ইঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা সমুদ্রগর্ভে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইঁহারাও সেই সমুদ্রতরঙ্গে কোথায় চলিয়া গেলেন ?

'কপালকুণ্ডলা' অপূর্ব্ব সৃষ্টি। চরিত্রসৃষ্টি, গঠনকৌশল, ভাষার ওজস্বিতা ও সাবলীলতা—যে দিক্ দিয়াই বিচার করা যাক্, ইহার গুণের অবধি নাই। শেক্স্‌পীয়রের কোন নাটকও এত নিখুঁত নহে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যে সকল ত্রুটি লক্ষ্য করা গিয়াছিল 'কপালকুণ্ডলা'য় তাহার একটিও নাই। প্রথম সময়ের গতির কথাই ধরা যাক্। 'কপালকুণ্ডলা'য় যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে এক বৎসর লাগিয়াছে।

সময়ের গতি এই উপন্যাসে অতি সুকৌশলে সূচিত হইয়াছে। সময়ের গতি দুই ভাবে দেখান যাইতে পারে। এক বাহিরের কোন যন্ত্রের সাহায্যে—যেমন ঘড়ির কাঁটার আবর্ত্তন অথবা অনুরূপ কোন ব্যাপারের দ্বারা। আর একটি উপায় হইতেছে চরিত্রের পরিবর্ত্তনের সাহায্যে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে 'পক্ষ', 'একদিবস', 'দুই দিবস', 'অপরাহ্ণ', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি শব্দের ছড়াছড়ি; তবু কালের গতি স্পষ্ট হয় নাই। 'কপালকুণ্ডলা'য় শব্দের বাহুল্য নাই; অথচ সময়ের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই এবং যে দুইটি উপায়ের কথা উল্লিখিত হইল সেই দুইটিই অবলম্বিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে দেখি মতিবিবি উড়িষ্যা হইতে আগ্রা যাত্রা করিয়াছেন; গ্রন্থের শেষে দেখি মতিবিবি আগ্রার বাস উঠাইয়া উড়িষ্যার সমীপবর্ত্তী সপ্তগ্রামে উপনীত হইয়া তাঁহার কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। সেই আমলে আগ্রা হইতে উড়িষ্যায় আসিতে তিন চারি মাস লাগিত। তাঁহার যাতায়াতে ছয় আট মাস লাগিয়া থাকিবে। তাহার পর তাঁহার বাদ্‌শাহের নিকট বিদায় লইতে, আগ্রার বাস উঠাইতে, সপ্তগ্রামে আসিয়া বাসস্থান ঠিক করিয়া নবকুমারের সঙ্গে দুই একবার সাক্ষাৎ করিতে কয়েক মাস লাগিয়াছে। সর্ব্বসমেত প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া থাকিবে। চতুর্থ খণ্ডের প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, "লুৎফ-উন্নিসার আগ্রা-গমন করিতে এবং তথা হইতে সপ্তগ্রাম আসিতে প্রায় এক বৎসর গত হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলা প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল নবকুমারের গৃহিণী।" আর এক দিক্ হইতেও এই পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া যায়। গ্রন্থের যখন আরম্ভ তখন সেলিম সত্ত বাদ্‌শাহ হইয়াছেন; এমন কি যিনি পরে বাদ্‌শাহের

ও বাদশাহ হইয়াছিলেন তিনিও এই সংবাদ পান নাই। মতি যখন আগ্রা ত্যাগ করেন তখনও জাঁহাগীর বাদশাহ মেহের উন্নিসাকে সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হ'ন নাই, কিন্তু তাঁহার কৌতূহলে ভবিষ্যতের কার্য্যকলাপ সূচিত হইয়াছে। ইতিহাসের এই আভাস খুব স্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট নহে, কিন্তু ইহাও অন্যান্য প্রমাণকে সমর্থিত করে।

এই গেল বাহিরের বিচার। এই এক বৎসরে চরিত্রের পরিবর্ত্তনও কম হয় নাই। চটিতে যে মতিবিবিকে দেখিয়াছিলাম তাঁহার বুদ্ধি, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও আত্মগরিমা অনন্যসাধারণ। সপ্তগ্রামে যাঁহাকে দেখি তাঁহার পূর্ব্ব তেজ, সাহস অটুট রহিয়াছে কিন্তু সেই চটুলতা নাই, আত্মগরিমার সঙ্গে মিশিয়াছে আত্মাবমাননা, করুণ প্রণয়ভিক্ষা। কপালকুণ্ডলার চরিত্র এত সহজে পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। তিনি প্রকৃতিপালিতা, এক বৎসরে সমাজ তাঁহার উপর তেমন গভীর রেখাপাত করিতে পারে নাই। তাঁহার স্বাধীনতা প্রিয়তা, ধর্ম্মভীরুতা ও পরোপচিকীর্ষা অটুট রহিয়াছে, কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান হইয়াছে। পূর্ব্বে যে রমণী বিবাহ কাহাকে বলে তাহাই জানিতেন না এখন তিনিই 'সতীত্ব' 'অবিশ্বাসিনী' প্রভৃতি কথার মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। এইরূপ পরিবর্ত্তন এক বৎসরে সাধ্য।

সময়ের পরিবর্ত্তন শুধু যে মোটামুটি ভাবেই দেখান হইয়াছে তাহা নহে। এই এক বৎসরের মধ্যে নায়িকাদের জীবনে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাদের উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার কালের গতির সঙ্গে ঘটনার গতির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক দেখাইয়াছেন। কপালকুণ্ডলার উপর সমাজের প্রভাব কম। সুতরাং তাঁহার কথা কয়েকটি সঙ্কেতময় দৃশ্যে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম

ভিক্ষুককে গহনা দান, তারপর শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কথোপকথন। এখন পর্য্যন্ত সমাজের রীতিনীতি তিনি বুঝিতে পারেন নাই; এমন কি স্বামীকেও "এই ব্রাহ্মণ-সন্তান" বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এই দুইটি দৃশ্য সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে মতির চটি ত্যাগ ও বর্দ্ধমানে উপস্থিতির মাঝখানে। তখন মেদিনীপুর হইতে বর্দ্ধমানে যাইতে কয়েক মাস সময় অতিবাহিত হইত। মতিবিবিকে যাত্রা করাইয়া গ্রন্থকার কপালকুণ্ডলার কিছু পরিচয় দিয়া লইলেন। ইহার পর মতিবিবির জীবনে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে খুব দ্রুতগতিতে; কপালকুণ্ডলার সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তাহাও অর্দ্ধ-অলক্ষিতে। গ্রন্থকার মতিবিবিকে লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন; কিন্তু পরে মতিবিবি, কাপালিক, নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা সকলে মিলিয়া কাহিনীর অনিবার্য্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হইবার ঠিক প্রাক্কালে একটি ক্ষুদ্র দৃশ্যে কপালকুণ্ডলার পরিচয় দিয়া লইলেন। এই সময় মতিবিবি ও কাপালিক জল্পনা করিতেছিলেন এবং একটু পরেই তাঁহারা শেষ সঙ্কল্পে উপনীত হইবেন। সুতরাং গ্রন্থকার এই পরিচয়কে দীর্ঘ না করিয়া মতিবিবির সঙ্গে কপালকুণ্ডলার ও নবকুমারের সঙ্গে কাপালিকের সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। মতিবিবির কাহিনীতেও এই পরিমাণবোধ ও নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। নবকুমারকে দেখিয়াই মতিবিবির হৃদয় আলোড়িত হয়। কিন্তু এক দিনেই তাঁহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আসে নাই। প্রথম তিনি মেহের উন্নিসার মন বুঝিয়া লইলেন। যদি মেহের উন্নিসার মনের গতি অন্য প্রকার হইত তাহা হইলে হয়ত নবকুমার-সন্দর্শন তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবনের একটি চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা হইয়া থাকিত, তিনিই বাদশাহের

প্রধানা বেগম হইতেন। কিন্তু নবকুমারের প্রতি আকর্ষণ ও আগ্রার ভরসা লোপ একই সঙ্গে আসিল। মতিবিবির মত বুদ্ধিমতী রমণী সমস্ত অভিজ্ঞতাকেই যাচাই করিয়া লইবেন ইহাই স্বাভাবিক এবং ইহার জন্য কিছু সময় ও নিঃসঙ্গ চিন্তার প্রয়োজন। বর্দ্ধমান হইতে আগ্রা তিন মাসের পথ। এই সময় সমস্ত দিক্ ভাবিয়া তিনি আপন মন ঠিক করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন, "·········কেন যে এমন চিত্তপ্রসাদ জন্মিল তাহা মতি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আগ্রার পথে যাত্রা করিলেন। পথে কয়েক দিন গেল। সেই কয়েক দিনে আপন চিত্ত-ভাব বুঝিলেন।"

ঘটনার সন্নিবেশেও এই অপরূপ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিমলার ন্যায় মতিবিবিরও একটা পূর্ব্ব ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাস আগ্রার রাজপ্রাসাদের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই ইতিহাসকে খুব লম্বা অথবা জটিল করেন নাই; কারণ তাহা হইলে মতি অপেক্ষা তাঁহার কাহিনী প্রাধান্য পাইত। শুধু তাহাই নহে, পূর্ব্ব ঘটনাকে বড় করিয়া দেখাইলে মূল আখ্যায়িকার গতি বাধা পাইতে পারে। মতিবিবির সব চেয়ে গভীর রহস্য তাঁহার হৃদয়ে, বাহিরের ঘটনায় নহে। কাজেই বাহিরের রহস্যের সমাধান বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই করিয়া দিয়াছেন। মতিবিবির পূর্ব্ব কাহিনী এমন ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে তাহা আখ্যায়িকার অংশ হইয়া গিয়াছে অথবা আখ্যায়িকার যেখানে ফাঁক ছিল তাহা পূরণ করিয়াছে। প্রথমে অধিকারীর প্রশ্নে নবকুমার যখন বলিলেন যে তাঁহার এ পর্য্যন্ত এক সংসার মাত্র তখন সেই কথাটা বিশদ্‌ভাবে বুঝাইয়া বলার জন্য

পদ্মাবতীর কথা উত্থাপন করিতে হইল। কিন্তু নবকুমার যতটুকু জানিতেন তদধিক গ্রন্থকার একটি কথাও প্রকাশ করিলেন না। পরে নবকুমারের সঙ্গে মতিবিবির যখন সাক্ষাৎ হইল তখন মতিবিবির ব্যবহারে আমাদের সন্দেহ হইল যে এই প্রকৃতিচপলা যোষিৎ পদ্মাবতী। আমাদের সন্দেহ মতিবিবি অগৌণে দূর করিয়া বলিলেন, 'মেরা খসম্।' তখন আমাদের কৌতূহল হইল যে কেমন করিয়া পদ্মাবতী মতিবিবিতে রূপান্তরিত হইলেন। মতিবিবি যখন বর্দ্ধমান অভিমুখে রওনা হইলেন তখন গ্রন্থের একটি যতি পড়িল। ইহাকে গ্রন্থকার ভরিয়া ফেলিলেন কপালকুণ্ডলার অভ্যর্থনা প্রভৃতির বর্ণনা দিয়া আর মতিবিবির পূর্ব্ব-ইতিহাস জ্ঞাপন করিয়া। লুৎফ উন্নিসা আগ্রা ত্যাগ করার সঙ্কল্প করার বর্ণনা পাই তৃতীয় খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে, পরপরিচ্ছেদেই দেখি তিনি নবকুমারের নিকট প্রত্যাখ্যান পাইতেছেন এবং এ সাক্ষাৎই প্রথম সাক্ষাৎ নহে। পাঠকের মনে প্রশ্ন হইতে পারে যে আগ্রাত্যাগ ও সপ্তগ্রামে এই প্রত্যাখ্যানের মধ্যে অনেকটা সময় চলিয়া গিয়া থাকিবে। তাহার কোন উল্লেখ নাই কেন? স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও কপাল-কুণ্ডলার সামান্য পরিবর্ত্তনে তাহার ইঙ্গিত আছে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। বঙ্কিমচন্দ্র এইখানে অন্যরূপ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া থাকিবেন।* গ্রন্থের চরম পরিণতি বর্ণিত হইয়াছে চতুর্থখণ্ডে সেইখানে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে অতি দ্রুত বেগে। তখনকার প্রত্যেকটি ভঙ্গী, প্রত্যেকটি কথা ও কার্য্য অনিবার্য্যবেগে ট্র্যাজেডির দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। মতিবিবির আগ্রা ত্যাগ ও সপ্তগ্রামে আসার মাঝখানে যে ফাঁক আছে তাহা শেষ দুই দিনের দ্রুত পরিণতিতে

ভরিয়া গিয়াছে। অন্য কোন বর্ণনা বা কাহিনীর আরও কোন জটিলতা আনিলে শেষের এই পরিণতির তীব্রতা নষ্ট হইয়া যাইত। এই জন্য কাপালিকের ইতিহাসও এই দুই দিনের ঘটনার বর্ণনার মধ্যেই সংক্ষেপে সন্নিবেশিত হইয়াছে; তাহার জন্য কোন পৃথক্ স্থান নির্দ্দেশ করা সম্ভব হয় নাই।

(এই উপন্যাসে দুই একটি আকস্মিক ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে এবং তাহারা মূল কাহিনীতে অতি সুন্দরভাবে মিশিয়া গিয়াছে। বড় আখ্যায়িকায় কখনও কখনও আকস্মিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখাইতে হয়। মনুষ্যজীবন যে জ্যামিতির রেখার মত সরল নহে, তাহার মধ্যে যে বহু দুর্জ্ঞেয় শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে তাহা এই সকল আকস্মিক ঘটনার অভ্যাগমে সূচিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই জাতীয় ঘটনাকে প্রাধান্য দিলে জীবন ও আর্টের তাৎপর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। শেক্সপীয়র এই বিষয়ে পরিমাণ-বোধের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। একটি উদাহরণের সাহায্যে তাঁহার কৌশলের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। ডেস্‌ডিমোনা খুব সঙ্কটমুহূর্ত্তে তাহার রুমাল হারাইল আর সেই রুমাল পড়িল গিয়া ইয়াগোর হাতে; ইহার সাহায্যে ইয়াগো ওথেলোর মনে পূর্ব্ব সন্দেহ দৃঢ় করিয়া দিল। ঐ রুমাল-হারান ডেস্‌দিমোনার দুর্ভাগ্যের অন্যতম কারণ; কিন্তু ইহা মুখ্য কারণ নহে। ইয়াগো পূর্ব্বেই ওথেলোর মনে সন্দেহের বিষ ঢুকাইয়া দিয়াছিল; ইহা সেই সন্দেহকে আরও পাকা করিয়া দিল মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রও এইরূপ রীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা এক জাতীয় না হইলে তাঁহাদের বিবাহ হইতে পারিত না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই আকস্মিক

ঐক্যকে খুব গৌণ করিয়া দেখিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা বাস্তবিকপক্ষে ব্রাহ্মণকন্যা কিনা এবং নবকুমারের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রসঙ্গত কিনা সেই বিষয়ে নবকুমার বা তাঁহার মা কোন অনুসন্ধান করেন নাই। অধিকারীও তেমন ব্যস্ত হয়েন নাই; এবং যদিও সেই দিন বৈবাহিক যোগ ছিল না তবু গোধূলিলগ্নে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কাপালিক বালিয়াড়ির শিখর হইতে পড়িয়া যাইয়া হাত ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং ইহার সঙ্গে আখ্যায়িকার যোগ আছে। কিন্তু তাঁহার হাত ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন এবং অধিকারীর নিকট তাঁহারা এক দিনের বেশী থাকেন নাই। এইরূপ আকস্মিক ব্যাপারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও তাৎপর্য্যময় হইতেছে কপালকুণ্ডলা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণবেশীর চিঠি হারান। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে পাইয়াও পান নাই, চিনিয়াও চিনিতে পারেন নাই। অব্যবহিত পূর্ব্ব রাত্রে তাঁহার নিষেধ অবহেলা করিয়া কপালকুণ্ডলা গভীর রাত্রিতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন এবং সেইখানে অপর কাহার সঙ্গে কি কথা হইয়াছে তাহা তিনি স্বামীকে বলেন নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণবেশীর পত্র পড়িয়া নবকুমার "প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না; পরে সংশয়, পরে নিশ্চয়তা, শেষে জ্বালা।" ঘটনা যত ক্ষুদ্রই হউক, কখনও আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হইতে পারে না; তাহার শাখা-প্রশাখা থাকিবেই। এই চিঠি-হারান কেবল যে সন্দেহ জাগাইয়া তুলিল তাহাই নহে। চিঠি খুঁজিতে যাইয়া কপালকুণ্ডলা কবরী খুলিয়া সমস্ত চুল আলুলায়িত করিলেন এবং বাহিরে যাইবার সময় অনূঢ়াকালের মত কেশমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী হইয়া চলিলেন। ইহার ফল হইল এই যে যখন

তিনি ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন তখন তাঁহার অবিন্যস্ত কেশের রাশি ব্রাহ্মণবেশীকে স্পর্শ করিয়াছে। দূর হইতে নবকুমার ইঁহাদের কথা শুনিতে পান নাই, কিন্তু একজনের চুল অপরের দেহে প্রসারিত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ মাত্র রহিল না যে কপালকুণ্ডলা অসতী। এমনি করিয়া একটি অতি তুচ্ছ ব্যাপার ইহাদের জীবনে চরম অনর্থের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এইখানে শেক্সপীয়রের রীতির (বিশেষ করিয়া ডেসডিমোনার রুমাল হারান ব্যাপারের) প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে এই ক্ষুদ্র ঘটনাকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং ইহার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছেন তাহার তুলনা শেক্সপীয়রের নাটকেও বিরল।))

চরিত্রাঙ্কনেও এইরূপ মাত্রাবোধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের সম্ভাবনা আবিষ্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে তিনটি চরিত্র অতি নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে কপালকুণ্ডলা, মেহের উন্নিসা ও মতিবিবি। মতিবিবির চরিত্রে গভীর পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার চরিত্র আঁকিয়াছেন এই পরিবর্ত্তনের প্রত্যেক ধাপকে স্পষ্ট করিয়া। তিনি সমস্ত বিষয়ের কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেমন করিয়া একটি স্তর হইতে আর একটি স্তরে উপনীত হইতে হইবে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়াছেন। নবকুমার, কপালকুণ্ডলা, মেহেরউন্নিসা, কাপালিক— ইঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সাক্ষাতে তাঁহার মনে নূতন প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হইয়াছে। এইখানে শুধু দুই একটি বিষয়ে উল্লেখ করিতে হইবে। মতিবিবি উচ্চশিক্ষিতা, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ অপরিণত। তাঁহার আসক্তি খুব গভীর, কিন্তু কোনও নিয়ম মানিয়া

চলে না। যে সেলিমের তিনি প্রণয়ভাগিনী তাঁহারই বিরুদ্ধে তিনি ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। আবার সেই ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হইয়া গেলে, জাহাঙ্গীর বাদশাহের প্রধানা মহিষী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই ব্যবহারে আগ্রার নন্দননরকের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই নন্দননরকের সংস্রব ছাড়িলেই মতি অতি সুশিক্ষিত মনের পরিচয় দেন। কপালকুণ্ডলাকে তিনি যে গহনা দান করিয়াছিলেন ইহা ধনীর নির্ধনকে দান নহে, ইহা রূপগর্ব্বিতার পরাজয়ের নমস্কার। উত্তরকালে এই কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন হইল। কিন্তু নিরপরাধ কপালকুণ্ডলাকে নিজ প্রয়োজনেও হত্যা করিতে তাঁহার সুশিক্ষিত মন কিছুতেই সায় দিল না। ভয়ঙ্কর স্বভাব কাপালিকের সঙ্গে এইখানেই তাঁহার প্রভেদ। কাপালিক জানিতেন যে নবকুমারের সন্দেহ অলীক; কিন্তু নরঘাতীর কাছে সত্যাসত্যের কোন মূল্য নাই। মতিবিবির বুদ্ধি ও রুচি সর্ব্বত্র সজাগ। প্রণয়ের অভ্যাগমে তাঁহার সমবেদনা আশ্চর্য্য তীক্ষ্ণতা পাইয়াছে।'

ইতিহাসবিশ্রুত মেহেরউন্নিসার চরিত্র আঁকা হইয়াছে অন্য রীতিতে। এখানে কোন পরিবর্ত্তন নাই, সুতরাং মন্থর বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ফটোগ্রাফারের কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। একটি মুহূর্ত্তে মেহেরউন্নিসার মনের কপাট খুলিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র যেন ক্যামেরা লইয়া অলক্ষিতে উপস্থিত ছিলেন; মেহেরউন্নিসার হৃদয়ের গোপন কথার প্রতিচ্ছবি লওয়া হইয়া গেল। এই মুহূর্ত্তটি ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু ইহার মধ্যে মেহের উন্নিসার চরিত্র সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি পাইয়াছে। মেহের

উন্নিসার রূপের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই জাহাঙ্গীর বাদশাহ তাঁহার নাম দিয়াছিলেন নূরজাহান। রঙমহালের অধিকাংশ রমণীই রূপসী, সুতরাং শুধু রূপের ঐশ্বর্য্য মেহেরউন্নিসাকে এত বিশ্ববিশ্রুত করিতে পারিত না। রূপের আলো হইতে অধিকতর উজ্জ্বল ছিল তাঁহার মনের আলো এবং ইহারই জন্য তিনি বাদশাহেরও বাদশাহ হইতে পারিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই মনের আলো তাঁহার উপন্যাসে প্রতিফলিত করিয়াছেন। দুই একটি কথাতে মেহের উন্নিসার হৃদয়ের বিস্তৃতি, কল্পনার লীলা ও মতিবিবি হইতে তাঁহার পার্থক্য সূচিত হইয়াছে। মতিবিবি মেহেরউন্নিসার রূপের প্রশংসা করিয়া দুঃখ করিয়া বলিলেন যে উপযুক্ত চিত্রকরের অভাবে তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের প্রতিচ্ছবি থাকিবেনা। মেহেরউন্নিসা মতির মত চটুল স্বভাবা বা প্রগল্‌ভা নহেন। মতির চতুর প্রশংসা তিনি চতুরতর প্রশংসার দ্বারা ফিরাইয়া দিলেন না। তিনি খুব সহজ সাধারণভাবে উত্তর করিলেন, "কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে।" এই সরল অৰ্দ্ধ-অন্যমনস্ক উত্তরে মেহেরউন্নিসার হৃদয়ের বিস্তৃতির পরিচয় রহিয়াছে। তিনি শুধু শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিলেন না, সৌন্দর্য্যের সীমানা সম্পর্কেও তাঁহার মন খুব সচেতন ছিল। এই মাত্রা বোধ ছিল বলিয়াই ভারতশাসনে তাঁহার অচলকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং শেষ জীবনে এই মাত্রা বোধ চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই তিনি শাহজাদা খুরমের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

সেলিমের প্রতি মেহেরউন্নিসার মনোভাবও অতি কৌশলের সহিত ব্যক্ত হইয়াছে। ইতিহাসে কথিত আছে যে শের আফগানের সহিত

বিবাহের পূর্ব্বেই মেহেরউন্নিসা সেলিমের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তখনই সেলিম তাঁহার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। শের আফ্‌গানের বধের পর মেহেরউন্নিসা যখন রাজপ্রাসাদে আসিলেন তখন অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তিনি স্বামিহন্তাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। তাহার পরে তিনি জাহাঙ্গীরের বেগম হইলেন এবং শাহ্‌জাদা খুরম প্রধান হওয়া পর্য্যন্ত তিনিই ভারতের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিণতির অতি অপরূপ পূর্ব্বাভাস দিয়াছেন। এই উপন্যাসে দেখিতে পাই যে মেহেরউন্নিসা কায়মনোবাক্যে পতিপ্রাণা; তিনি সদর্পে ঘোষণা করিতেছেন যে স্বামিহন্তাকে তিনি কখনও ক্ষমা করিবেন না। কিন্তু তাঁহার অলক্ষিতে সেলিমের প্রতি তাঁহার গোপন প্রণয় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ তিনি শুনিতে পাইলেন যে সেলিম দিল্লীর বাদ্‌শাহ হইয়াছেন। এই সংবাদটি মনের সঙ্গে যাচাই করিয়া লইবার সময় পাইলেন না। কল্পনা বুদ্ধির পূর্ব্বগামী; মানসচক্ষে তাঁহার যৌবনের স্বপ্ন ও তাহার পরিণতির চিত্র খেলিয়া গেল। তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে বলিয়া ফেলিলেন, "সেলিম দিল্লীর সিংহাসনে আর আমি কোথায়?" মতিবিবির কাছে ভবিষ্যতের চিত্র স্পষ্ট হইয়া পড়িল; তিনি বুঝিলেন যে হৃদয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষার কাছে বুদ্ধি ও নীতিকে এক দিন হার মানিতেই হইবে। মেহেরউন্নিসা ও মতিবিবি উভয়েই প্রখরবুদ্ধিশালিনী, কিন্তু উভয়ের বুদ্ধিতে পার্থক্যও প্রচুর। মতিবিবির বুদ্ধির প্রখরতা দেখা যায় অতি সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে। তাঁহার হৃদয়ে কোন প্রশস্ত, উদার কল্পনার স্থান নাই। সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে মতিবিবির জয় হইল বটে; কিন্তু

মেহেরউন্নিসা যে তাহার অপেক্ষা কত্র্ব বড় তাহাও প্রমাণিত হইল।

✓কপালকুণ্ডলার চরিত্র আঁকিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই রীতিই বারংবার প্রয়োগ করিয়াছেন। মেহেরউন্নিসার ফটো লইয়াছেন একটি মাত্র ভঙ্গীতে যেখানে তাঁহার মনের কথা স্পষ্ট হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা রহস্যময়ী, তদুপরি গ্রন্থের নায়িকা। কাজেই তাঁহাকে নানা ভঙ্গীতে রাখিয়া তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করা হইয়াছে। এক ব্যক্তি নানা ভঙ্গীতে বসিলে বা দাঁড়াইলে ফটোশিল্পী তাহার ছবি তোলেন; বিভিন্ন ফটো বিভিন্ন ভঙ্গীর কিন্তু আসল মানুষটি এক। কপালকুণ্ডলার চরিত্রে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন নাই, নানা অবস্থায় চরিত্রের যে ভঙ্গী গুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাদের চিত্র আঁকা হইয়াছে ঠিক এমনি রীতিতে। নূতনের মধ্যে পুরাতনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। নবকুমারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে পরিচয় পাইলাম তাঁহার সাহস, দয়া ও ক্ষিপ্রতার। তারপর অধিকারীর সঙ্গে আলাপে দেখি কপালকুণ্ডলা লৌকিক আচার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এমন কি বিবাহ কাহাকে বলে তাহাই জানেন না ইহার পর মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ। নবকুমারকে প্রথম দেখিয়া কপালকুণ্ডলা বিস্মিত হয়েন নাই, কারণ অনুরূপ পুরুষমূর্ত্তি তাঁহার চোখে আরও পড়িয়াছে। কিন্তু মতিবিবিকে দেখিয়া তাঁহার কিছু বিস্ময় হইল। হয়ত দুই একটি রমণী ইহার পূর্ব্বে তাহার চোখে পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু তাঁহাদের সাজসজ্জা এমন অপরূপ নহে, তাহাদের অলঙ্কারের এত ঐশ্বর্য্যও থাকিতে পারে না। সুতরাং এই মূর্ত্তি রমণীর মূর্ত্তি হইলেও তাঁহার কাছে অপূর্ব্ব। যে বিস্ময় নবকুমারকে দেখিয়া

জাগে নাই এইবার তাহাই তাঁহাকে নির্ব্বাক করিয়া দিল। নবকুমার ও মতিবিবিকে প্রথম দেখিয়া কপালকুণ্ডলার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহার মধ্যে একটু পার্থক্য দেখাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র অতি উচ্চাঙ্গের কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। ইহার পরে গহনা দান। কপালকুণ্ডলা গহনা দান করিয়া ফেলিবেন এইরূপ আন্দাজ করা কঠিন নহে; এবং কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক এই কথা বলিয়াই থামিয়া যাইতেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে কপালকুণ্ডলার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য গহনা দানে নহে, ভিক্ষুকের ব্যবহারে তাঁহার বিস্ময়ে। "কপালকুণ্ডলা ভাবিলেন, "ভিক্ষুক দৌড়িল কেন?"—সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে তাঁহার অজ্ঞতার ইহাই চরম দৃষ্টান্ত। অপরাপর দৃশ্যের কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সবাই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে একটি দৃশ্য হইতে অপর একটি দৃশ্যে কোন পরিণতির লক্ষণ নাই, কোথাও মৌলিক পরিবর্ত্তন নাই; শুধু ভঙ্গীটি বদলাইয়াছে।

কপালকুণ্ডলা প্রকৃতিপালিতা। অন্যান্য শ্রেষ্ঠ লেখকও দুই একটি রমণীর চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন যাহারা সামাজিক বিধিনিষেধ সম্পর্কে অনেকটা অজ্ঞ এবং তাহাদের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার তুলনামূলক সমালোচনা করার চেষ্টা কেহ কেহ করিয়াছেন। এই জাতীয় চরিত্র শকুন্তলা, নৌসিকায়া ও মীরাণ্ডা। নৌসিকায়াকে প্রথমেই বাদ দেওয়া যাইতে পারে, কারণ নৌসিকায়া একজন রাজকন্যা এবং তাহার দেশবাসিগণ গ্রীকদের ন্যায় সুশিক্ষিত ও সুসংস্কৃত না হইলেও তাহাদের ও একটা সমাজ আছে এবং সেই সামাজিক বন্ধনের ছাপ নৌসিকায়ার উপরে আছে। শকুন্তলা ও মীরাণ্ডার সঙ্গে কপালকুণ্ডলার তুলনা

করিলে এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকৌশলের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে। শকুন্তলা ও মীরাণ্ডা সমাজ হইতে অনেক দূরে মানুষ হইয়াছে, তবু সেই খানকার প্রধান ব্যক্তি প্রস্পেরো ও কণ্বমুনি লোকাচারে অভিজ্ঞ।* শকুন্তলার দুইটি বান্ধবী আছে এবং ঋষি রমণীরাও রহিয়াছেন। শকুন্তলা, হংসপদিকা বা অন্যান্য পুরনারীদের মত চতুরিকা না হইতে পারে, কিন্তু লোকাচার সম্পর্কে অজ্ঞ নহে। নর নারীর প্রেম, বিবাহ, একনিষ্ঠ অনুরক্তি—এই সম্পর্কে তাহার স্পষ্ট ধারণা আছে। দুষ্মন্ত যে এত সহজে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন তাহার একটি কারণ তাহার সরলতা, অপর কারণ এই যে সংসার সম্পর্কে তাহার মোটামুটি জ্ঞান আছে। দুষ্মন্তের প্রণয় সম্ভাষণ কপালকুণ্ডলার উপর ব্যর্থ হইয়া যাইত। কারণ তাহার অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে কপালকুণ্ডলার অনেক সময় লাগিত। মীরাণ্ডা সম্পর্কেও সেই কথা খাটে। মীরাণ্ডা পূর্ব্বে বোধহয় কোন পুরুষ চোখে দেখে নাই (তাহার পিতা ছাড়া), তাই ফার্ডিন্যাণ্ডকে দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ফার্ডিন্যাণ্ডের প্রণয়সম্ভাষণ সে সহজেই বুঝিতে পারিল এবং খানিকক্ষণ পরেই সে ফার্ডিন্যাণ্ডকে প্রশ্ন করিল, "My husband, then?" হয়ত ক্যালিবানের হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্পেরো তাহাকে এই বিষয়ে অনেকটা শিক্ষা দিয়া

---

* শেক্সপীয়র ও কালিদাস নাটক লিখিয়াছিলেন। নাটকে প্রকৃতির প্রভাবকে রূপ দেওয়া খুব কষ্টকর; প্রকৃতিকে পাত্রপাত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এই জন্যই বোধ হয় কণ্বমুনি ও প্রস্পেরো প্রভৃতির অবতারণা আবশ্যক হইয়াছে।

ছিলেন এবং প্রশ্নেরো নিজের যে ইতিহাস তাহার কাছে বলিয়াছেন তাহা হইতে সে জাগতিক রীতির পরিচয় পাইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়ে অনেকখানি সাহস দেখাইয়াছেন। তিনি কপালকুণ্ডলার এক মাত্র সহচর করিয়াছেন দুরন্ত নরঘাতী কাপালিককে। তাঁহার কাছে লৌকিক আচার শিখিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কপালকুণ্ডলা আর মিশিয়াছেন অধিকারীর সঙ্গে যিনি একা একা থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গে কপালকুণ্ডলার স্নেহের আদান প্রদান ছিল, কিন্তু তাঁহার কাছেও পৃথিবীর রীতিনীতি শিখিবার সম্ভাবনা খুব বেশী ছিল না। অধিকারী ও কাপালিক উভয়েই পূজারী, এবং কাপালিক তদুপরি তান্ত্রিক। সাইহার ফলে কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে ধর্ম্মবিশ্বাস খুবই গভীর হইয়াছে এবং কাপালিকের কাছে নরবলি দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে যে তাঁহার নিজ জীবনের বিশেষ কোন মূল্য নাই। এই জন্যই নবকুমারকে পৌছাইয়া দিয়া কপালকুণ্ডলা সেই দুরন্ত কাপালিকের কাছে যাইতে চাহিয়াছেন; ইহার মধ্যে সঙ্কোচহীনার সাহস ও আশ্রয়-হীনার দীনতা আছে; কিন্তু আত্মজীবন সম্পর্কে ঔদাসীন্যও আছে। তবে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে বাঁচাইতে চাহিলেন কেন? অন্যান্য মানুষের বলি তাঁহার চোখের সামনেই হইয়াছে; তাহাদের আর্ত্তনাদ তাঁহার কানে গিয়াছে। সুতরাং কাপালিকের ধর্ম্মের এই দিক্‌টার বিরুদ্ধে তাঁহার মনে বিদ্রোহ হইয়াছে। পরোপচিকীর্ষা হইতে এই বিদ্রোহ, না বিদ্রোহ হইতে এই পরোপচিকীর্ষা তাহা লইয়া তর্ক হইতে পারে। * কিন্তু পরের উপকার করিবার ইচ্ছা কখনও লুপ্ত হয় নাই;

* বঙ্কিমচন্দ্র মনে করিতেন যে পরোপচিকীর্ষা প্রকৃতি পালিত মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।

কাহিনীর চরম ট্র্যাজেডির মূলেও শ্যামার উপকার করিবার ইচ্ছা। সমুদ্রতীরবাসিনীর দ্বিতীয় অনমনীয় প্রবৃত্তি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। এই স্বাধীনতার পক্ষচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়াই গৃহধর্ম্মে তাঁহার এত অনাসক্তি। প্রকৃতির তৃতীয় দান নিঃসঙ্কোচ সাহস। ভয়ের মূলে লৌকিক ভালমন্দ বোধ। যাহার সেই ভালমন্দবোধ নাই, তাহার পক্ষে সঙ্কোচেরও কোন কারণ নাই। লোকালয়ে আসিয়া কপালকুণ্ডলা কিছু কিছু জাগতিক রীতিনীতি শিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে একটু ভয় বা সঙ্কোচ আসিয়াছিল। এই জন্য ব্রাহ্মণবেশীর প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁহার দ্বিধা হইল। কিন্তু এই দ্বিধা নগণ্য। অন্ধকার রাত্রিতে ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার একটুও ভয় হয় নাই; এলোচুলে ঔষধ আনিতে যাইতেও কোন সঙ্কোচ হয় নাই।

'কপালকুণ্ডলা' সম্পর্কে জনৈক বন্ধু এইরূপ সমালোচনা করিয়াছেন, "উপন্যাসের প্রধান অবলম্বনীয় বিষয় কপালকুণ্ডলার অপরিণত যৌন বৃত্তি। সপ্তগ্রামে এক বৎসর স্বামীর ঘর করিয়াও সে বুঝিলনা যে স্বামী কি, নারীদেহ কি বস্তু। কপালকুণ্ডলা কাপালিক ও অধিকারীর সাহচর্য্যে বড় হইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রসৈকতে অথবা অরণ্যানীর মধ্যে শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত করিলেই প্রণয়বিদ্যা অনধীত থাকে না। …… …শকুন্তলা ও মীরাণ্ডার প্রণয়োৎপত্তি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সুন্দর। কিন্তু বিবাহিতা ও স্বামিসহবাসিনী কপালকুণ্ডলা যে কাপালিকের কুমারী কন্যাই থাকিবে ইহা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। প্রকৃতির শিশু

তিনি বনচারিণী বাসন্তীর (উত্তররামচরিত) এই গুণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন।—বিবিধ প্রবন্ধ। নরশোণিতে বিরক্তি বোধ হয় পঞ্চভূত বা Life force-র দান।

এরূপ হইবে কেন ? প্রকৃতি ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করে নাই। স্বভাব যে ferociously sexual। তবে কি মনে করিব কপালকুণ্ডলা is a study in sexual sterility ? কপালকুণ্ডলার সমুদ্রসৈকতের প্রতি আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক ; কিন্তু নবকুমারের প্রতি উপেক্ষা অস্বাভাবিক। নবকুমারের প্রতি তাহার কোনও রূপ প্রণয় অঙ্কুরিত হুইয়াছিল তাহার পরিচয় গ্রন্থে নাই। সমুদ্র প্রেম ও যৌন প্রেম—উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকা বিচিত্র ছিল না ; কিন্তু এই দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত ও উপন্যাসে পাওয়া যায় না। 'কপালকুণ্ডলা' কাব্য, উপন্যাস নহে।"

উপরি-উদ্ধৃত সুচিন্তিত, তীক্ষ্ণ সমালোচনা সম্পর্কে প্রথমেই একটি কথা বলা দরকার। যৌন প্রবৃত্তি নানা রমণীতে নানাভাবে পরিণতি লাভ করে। বার্ণার্ড শ বলিয়াছেন, ...the capacity for it varies like any other capacity. I remember one woman, who had a quite innocent sort of affectionate worship for me, explaining that she had to leave her husband because sexual intercourse hurt her physically, 'like some one sticking a finger into my eye.' Between this extreme case and the heroine of my first adventure, who was sexually insatiable there is an enormous range of sensation.........বার্ণার্ড শ' যে দুই চরম দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, কপালকুণ্ডলা ইহাদের একটির স্বজাতীয়া এবং মীরাণ্ডা ও শকুন্তলা অপর শ্রেণীর সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যসম্পন্না। কপালকুণ্ডলার যৌন প্রবৃত্তির পূর্ণ উন্মেষ হয় নাই, এই কথা বলিলে বঙ্কিমের উদ্দেশ্যেরই পুনরুক্তি করা হয়। দ্বিতীয়তঃ

স্বভাব সৌন্দর্য্য 'ferociously sexual' নহে, অযৌন। এই সৌন্দর্য্য কাহারও মন গভীরভাবে আকর্ষণ করিলে তাহার যৌনপ্রবৃত্তি (অথবা অন্য যে কোন প্রবৃত্তি) সমধিক স্ফূর্তি পাইবে না।

এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে কপালকুণ্ডলার চরিত্রের যে পরিণতি দেখান হইয়াছে তাহার মধ্যে স্বাভাবিকতা ও সৌন্দর্য্যের অভাব হইয়াছে কিনা। 'কপালকুণ্ডলা' নির্জ্জন সমুদ্রতীরে প্রকৃতির আহ্বান অনুভব করিয়াছেন, পুরুষের নহে। নরঘাতী কাপালিকের ব্যবহার মনুষ্যজাতি সম্পর্কে শুধু একটি ভাবেরই প্রেরণা জাগাইয়াছে—তাহা প্রেম নয়, অনুকম্পা। নবকুমারের সংস্পর্শে আসিয়াও প্রথমে করুণারই উদ্রেক হইয়াছে, তাই শুধু যে বিবাহের কথাই মনে হয় নাই তাহা নহে, নবকুমারের সঙ্গ পাইবার আকাঙ্ক্ষা ও জাগে নাই। অবশ্য ইহার পর সপ্তগ্রামে আসিয়া কপালকুণ্ডলা এক বৎসর নবকুমারের সঙ্গে বাস করিয়াছেন এবং যৌনসম্পৃক্তির আস্বাদ পাইয়াছেন।* সমালোচক প্রশ্ন করিয়াছেন, এই নূতন আকর্ষণ ও সমুদ্রের আহ্বান, ইহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হওয়া কি স্বাভাবিক নহে? একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে নবকুমারের গৃহিণীত্ব কপালকুণ্ডলার মনে রেখাপাত করিয়াছে এবং তাহার মধ্যে ও কপালকুণ্ডলার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সূচিত হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা স্বামীকে পাইয়াছেন যৌন আকর্ষণের মধ্য দিয়া নহে, কর্ত্তব্যবোধের আহ্বানে। বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে অধিকারীর সঙ্গে তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার মধ্যে কর্ত্তব্যবোধেরই উল্লেখ আছে, প্রণয়ের নহে। নবকুমারের গৃহে কপালকুণ্ডলা কর্ত্তব্যপরায়ণা

* তাহা না হইলে তিনি 'অবিশ্বাসিনী' কথার অর্থ বুঝিতে পারিতেন না।

গৃহিণী ছিলেন, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে চাহিলেও গৃহত্যাগের কথা মনে আসে নাই। কিন্তু নবকুমার শুধু ইহাতেই সন্তুষ্ট হইতে চাহিবেন কেন? এই অপরিতৃপ্তিই তাঁহার মিথ্যা সন্দেহের একমাত্র সত্য ভিত্তি। এই মিথ্যা সন্দেহের স্পর্শে এবং মতিবিবির প্রতি পরোপ-চিকীর্ষায় সংসারের সমস্ত মায়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল; কপালকুণ্ডলা যে গৃহিণীপণায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন তাহা শুধু বিশ্বস্ততার অনুরোধে, সেই বিশ্বাসেই যখন আঘাত পড়িল তখন সংসারের সমস্ত আকর্ষণ চলিয়া গেল। এক বৎসরের সহবাস যে বন্ধন সৃষ্টি করিয়াছিল, নবকুমারের সন্দেহ তাহা শিথিল করিয়া দিল। মতিবিবি যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহা হয়ত এক অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি করিত, কিন্তু নবকুমারের ব্যবহার কপালকুণ্ডলার সকল সমস্যার সমাধান করিয়া তাঁহার মনকে প্রকৃতির উন্মুক্ততার প্রতি অনিবার্য্য বেগে ধাবিত করিয়া দিল।

'কপালকুণ্ডলা'র একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অপূর্ব্ব সাঙ্কেতিকতা যাহা বৃহত্তর জগতের আভাস আনিয়া দেয় এবং ইহারই জন্য নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক শক্তির মধ্যে অপরূপ সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা প্রতিপালিত হইয়াছেন সমুদ্রের উপকূলে বিজনবনে। তাঁহার চরিত্র প্রকৃতিপরিপুষ্ট এবং নবকুমারের গৃহের নিকটে যে বিস্তীর্ণ উপবন ছিল সেইখানে তাঁহার জীবনের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইয়াছে; সমুদ্র প্রতিপালিতা সমুদ্রের মধ্যেই চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। মতিবিবি আগ্রার রাজপ্রাসাদের ভূস্বর্গে জীবন কাটাইয়াছেন; তিনিও কপালকুণ্ডলার সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন এই সমুদ্রতীরবর্ত্তী উপবনে।

কপালকুণ্ডলার চরিত্র ও জীবন প্রকৃতির লীলার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে ইহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। তাঁহার দেহের রূপ ও কণ্ঠের মাধুর্য্যও যেন প্রকৃতির মহিমার অংশ। তাঁহার কটাক্ষ সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রলেখার ন্যায়; তাঁহার দেহে এমন একটি মোহিনী শক্তি ছিল যে তাহা গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে দাঁড়াইয়া না দেখিলে স্পষ্ট অনুভব করা যায় না। তাঁহার কণ্ঠের শব্দ পবনে আন্দোলিত হইয়াছে, বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইয়াছে, সাগরনাদে মন্দীভূত হইয়াছে। তাঁহার লীলাচঞ্চল গতি নিসর্গমায়ার মতই নবকুমারকে মুগ্ধ করিয়াছে, অভিভূত করিয়াছে, বিভ্রান্ত করিয়াছে। যখন কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে রক্ষা করিয়াছেন তখনও তাঁহাকে মায়া বলিয়াই ভ্রম হইয়াছে; তাঁহার নিঃশব্দ সঞ্চার ও নিঃশব্দ অন্তর্দ্ধানে নবকুমার চমৎকৃত ও বিমূঢ় হইয়াছেন। যখন এই পরমাশ্চর্য্য রমণী নবকুমারের বন্ধন কাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন মনে হইয়াছে এ এক মোহিনী মায়া যাহার করে খড়্গ "জ্বলিতেছে"।

প্রকৃতির প্রভাব ও অনৈসর্গিক জগতের সঙ্কেতের মধ্যে অতি অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে। 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র নিয়তির কার্য্যকলাপের অতি সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়াছেন। 'কপালকুণ্ডলা'য় এই সম্পর্কে তাঁহার কোন স্পষ্ট সুনির্দ্দিষ্ট মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায় না; কিন্তু অদৃশ্যজগৎ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কৌতূহল জাগরিত হইয়াছে এবং তাহার সম্বন্ধে অনির্দ্দেশ্য ইঙ্গিত তাঁহার কাছে পহুছিয়াছে। এই ইঙ্গিতের সঙ্গে মানুষের প্রবৃত্তির ও প্রকৃতির লীলার যোগ আছে, কিন্তু সেই সংযোগকে কোন সরল সহজ আইনের

দ্বারা বিধিবদ্ধ করা যায় না। ইহার মধ্যে মতিবিবির 'ললাটলিখন' আছে আবার সমুদ্রতীরের মোহিনী মায়াও আছে আর সকলকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে এক অদৃশ্যশক্তি যাহার সঙ্কেত কাপালিক, কপালকুণ্ডলা ও অধিকারী খুঁজিতেছেন। কপালকুণ্ডলা যে বিবাহে রাজি হইলেন তাহার একটি কারণ এই যে অধিকারীর বিল্বপত্র ভবানী গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবকুমারের গৃহে কপালকুণ্ডলা সুখী হয়েন নাই। তিনি সমুদ্রতীরের অনিবার্য্য আকর্ষণ অনুভব করিতেন; কিন্তু তাঁহার দেওয়া অভিন্ন বিল্বপত্র যে দেবীর পদতল হইতে পড়িয়া গিয়াছিল ইহাই তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পীড়া দিতে লাগিল। বোধ হয় সমুদ্র-তীরের আকর্ষণ ও দেবীর অপ্রসাদ একত্রিত হইয়া তাঁহাকে গৃহধর্ম্মে উদাসীন করিয়াছিল। তার পর ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কাপালিক দর্শন। এইখানেও নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিকের মধ্যে অপরূপ সম্মিলন। ব্রাহ্মণবেশীর স্বরূপ সম্পর্কে কপালকুণ্ডলার পূর্ব্ব হইতেই সন্দেহ হইয়াছিল এবং রাত্রিতে যে ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণবেশীরও আবির্ভাব হইল। যে অনিবার্য্য শক্তি তাহাকে পুনরায় বাহিরে লইয়া গেল তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে এই ইঙ্গিতময় স্বপ্ন, "অরণ্যের জ্যোৎস্নাময়ী শোভা, কাননতলে অন্ধকার, সেই অরণ্য মধ্যে যে সহচর পাইয়াছিলেন তাহার ভীমকান্ত গুণময় রূপ"। পরে তিনি যে আত্মবিসর্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিলেন, তাহার মধ্যেও নানা শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে। কপালকুণ্ডলার মন একেবারে নিঃসঙ্গ, পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন তথায় ও

নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না; তবে কেন লুৎফউন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? তার পর নিজের স্বপ্ন ও কাপালিকের স্বপ্ন তাঁহার কাছে ভবানীর সুনিশ্চিত প্রত্যাদেশ বলিয়া প্রতীত হইল; পঞ্চভূতের যে বন্ধন ছিল তাহাও শিথিল হইল; কপালকুণ্ডলা নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক ও অন্তরস্থ-শক্তির আহ্বানে জীবন বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

(৩)

বক্তিয়ার খিলিজি' কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা ও কৌতূহলকে বিশেষ ভাবে উদ্দীপিত করিয়াছিল। সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গবিজয় করিয়াছিল ইহা যে বাঙ্গালী (হিন্দু) বিশ্বাস করে তিনি তাহাকে কুলাঙ্গার বলিয়াছেন; অথচ কমলাকান্ত ইহা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছে। 'মৃণালিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গবিজয় ও সপ্তদশ অশ্বারোহী সম্পর্কিত কাহিনীর স্বরূপ চিত্রিত করিতে চাহিয়াছেন। সপ্তদশ অশ্বারোহীর আবির্ভাব ও লক্ষ্মণসেনের অন্তঃপুর হইতে পলায়ন—ইহা তিনি ইতিহাস (অথবা কিংবদন্তী) হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত অন্যান্য বিষয়েরও বর্ণনা দিয়াছেন যাহাতে সমগ্র বঙ্গবিজয়ের ইতিহাস সম্পূর্ণ হইতে পারে। সপ্তদশ অশ্বারোহী যত শক্তিমানই হউক না কেন তাহাদের দ্বারা একটা দেশ জয় ও অধিকার সম্ভবেনা। আজকাল নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে এবং টেলিগ্রাম, রেল, এরোপ্লেন প্রভৃতির জন্য সংবাদ-প্রদান ও যাতায়াত খুব সহজ হইয়াছে। এখন সতের জন লোক কোন একটা অসমসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিলে তাহাদের সাহায্যার্থে

সতের হাজার সৈন্য সমবেত করিতে খুব বেশী সময় লাগেনা। কিন্তু হাজার বৎসর পূর্ব্বে সেই সম্ভাবনা ছিলনা। বক্তিয়ার খিলিজি আলেকজাণ্ডার-হানিবল-নেপোলিয়ানের সমান ক্ষমতাশালী হইলে ও মাত্র ষোল জন অনুচর লইয়া এই প্রকাণ্ড প্রদেশ অধিকার করিবেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়না। বঙ্কিমচন্দ্র এই অভিযানের বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন বক্তিয়ার খিলিজি অসাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন; যে ষোল জন অনুচর তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারা অনন্যসাধারণ শক্তি সম্পন্ন। ('মৃণালিনী' চতুর্থ খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ) ইহাদের সাহায্যে বক্তিয়ার গৌড়রাজপুরী অধিকার করিয়াছিলেন এবং ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশ পাঠানের অধীনে আসিয়াছিল। কিন্তু সপ্তদশ অশ্বারোহীর এই বিজয় অভিযান সম্ভব হইয়াছিল দুইটি কারণে। ইহাদের পশ্চাতে পঁচিশ হাজার পাঠান সৈন্য মহাবনে অপেক্ষা করিতেছিল; তাহাদের বলে ইহারা এই অসমসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিল আর পশুপতি ইহাদের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া রাখিয়াছিলেন। পশুপতির পক্ষে ও যে এইরূপ কাজ সম্পূর্ণ সম্ভব হইয়াছিল তাহার কারণ তখন গৌড়-রাজ অসমর্থ; দেশ শাস্ত্রতাড়িত অতএব হীনবল। সপ্তদশ অশ্বারোহীর আবির্ভাব গৌড়বিজয়ের একটা অংশ সন্দেহ নাই এবং বোধহয় ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকপ্রদ অধ্যায়; কিন্তু ইহাকেই সম্পূর্ণ বলিয়া ধরিয়া লইলে মানুষের সাধারণ বুদ্ধি ও আপত্তি তুলিবে। 'মৃণালিনী' তে বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে অস্বীকার করেন নাই; বরং ইহার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করিয়া ইহাকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় ইতিহাসের

মর্য্যাদা কতটা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে বিচার করা কঠিন; কিন্তু ইহা যে অতি উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক কল্পনার পরিচয় দেয় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; বোধহয় মিন্‌হাজুদ্দীনও অস্বীকার করিতেন না।

বক্তিয়ার খিলিজি যখন মগধ বিজয় করেন তখন মগধের রাজকুমার হেমচন্দ্র তাঁহার প্রণয়িনী মৃণালিনীকে পাইবার আশায় মথুরায় বাস করিতেছিলেন। প্রণয় রাজকার্য্যে বাধা সৃষ্টি করিল দেখিয়া হেমচন্দ্রের গুরু মাধবাচার্য্য কৌশলে মৃণালিনীকে আনাইয়া গৌড় দেশে লক্ষ্মণাবতী নগরে হৃষীকেশ নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিলেন। খিলিজি তখন গৌড় বিজয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন। গৌড়ের সৈন্য লইয়া হেমচন্দ্র যবনের বিরোধিতা করিতে পারিবেন এই উদ্দেশ্যে মাধবাচার্য্য তাঁহাকেও গৌড়ে পাঠাইলেন এবং হেমচন্দ্রকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া দিলেন যে কার্য্যসিদ্ধির পূর্ব্বে তিনি মৃণালিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন না। হেমচন্দ্র লক্ষ্মণাবতীতে মৃণালিনীর সন্ধান পাইয়াও দেখা করিলেন না, তবু কতক সময় বৃথা নষ্ট করিয়া মাধবাচার্য্যের সঙ্গে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। হৃষীকেশব্রাহ্মণের পুত্র ব্যোমকেশ অতি পাষণ্ড। সে মৃণালিনীর জন্য লুব্ধ হইয়াছিল এবং প্রত্যাখ্যাত হইয়া পিতার কাছে মৃণালিনীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিল। হৃষীকেশ পুত্রের কথায় বিশ্বাস করিয়া মৃণালিনীকে কুলটা মনে করিয়া তাড়াইয়া দিলেন এবং পরে মাধবাচার্য্যের সঙ্গে দেখা হইলেও সেই মিথ্যা অপবাদকেই সত্য বলিয়া প্রচার করিলেন। হেমচন্দ্রকে পাইবার আশায় মৃণালিনী গিরিজায়া নামক এক ভিখারিণীকে সঙ্গে করিয়া গৌড়ে আসিলেন। ব্যোমকেশ ও মৃণালিনীর অনুসন্ধানে গৌড়ে আসিল।

তদানীন্তন গৌড়রাজ লক্ষ্মণ সেন বৃদ্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সর্ব্বপ্রকারে অপটু। রাজ্যশাসনের ভার প্রধান অমাত্য পশুপতির উপরে। পশুপতি হেমচন্দ্রকে সমারোহের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং যবনযুদ্ধে তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিবেন জানাইলেন। কিন্তু পশুপতি বিশ্বাসঘাতক। তিনি গোপনে খিলিজির সঙ্গে এই সন্ধি করিলেন যে বিনা যুদ্ধে গৌড় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন এবং পরে খিলিজির অধীনে তিনিই গৌড়রাজ হইবেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার মূলে একাধিক অভিসন্ধি ছিল। পশুপতি যৌবনে কেশব নামক এক ব্রাহ্মণের কন্যা হৈমবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহ রাত্রেই কেশব কন্যাকে লইয়া পলাইয়া যান আর তাঁহার বা তাঁহার কন্যার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। রাজামাত্য পশুপতি এখন বালবিধবা মনোরমার প্রণয়প্রার্থী। মনোরমা তাঁহার প্রতি আসক্ত হইলেও জাতিচ্যুত হওয়ার ভয়ে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিতেছেন না। রাজা হইতে পারিলে সমাজ তাঁহার বাধ্য হইবে—ইহা তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার অন্যতম কারণ। যে গৃহে হেমচন্দ্রের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল সেই গৃহেই মনোরমা তাহার পিতামহ জনার্দ্দন শর্ম্মার সঙ্গে বাস করিত। হেমচন্দ্র ও মনোরমার মধ্যে ভ্রাতা-ভগিনী সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। মনোরমা পশুপতির মন্ত্রণা সবই জানিত।

একদিন রাত্রিকালে যবনদূত পশুপতির সঙ্গে স্থির করিল যে খিলিজির প্রধান শত্রু হেমচন্দ্রকে বধ করিতে হইবে এবং পর দিন ষোল জন অশ্বারোহী লইয়া বক্তিয়ার খিলিজি গৌড়রাজপুরীতে প্রবেশ করিবেন। মনোরমার পরামর্শে হেমচন্দ্র রক্ষা পাইলেন এবং মনোরমা

পশুপতির কাছে এক পরমাশ্চর্য্য কাহিনী বিবৃত করিল। সে জনার্দ্দন শর্ম্মার বিধবা পৌত্রী নহে—তাঁহার শিষ্য কেশবের কন্যা হৈমবতী এবং পশুপতির বিবাহিতা স্ত্রী। জ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে হৈমবতী অল্প বয়সে স্বামীর অনুমৃতা হইবে। দৈবগণনা ব্যর্থ করিবার জন্য কেশব বিবাহ-রাত্রেই হৈমবতীকে লইয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন এবং মরণকালে জনার্দ্দন শর্ম্মার কাছে সকল তথ্য প্রকাশ করিয়া কন্যাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই অবধি হৈমবতী বিধবা মনোরমা বলিয়া পরিচিত। একদিন হঠাৎ জনার্দ্দন শর্ম্মা ও তাঁহার ব্রাহ্মণীর কথোপকথন আড়াল হইতে শুনিয়া মনোরমা নিজ জীবনের রহস্যের সন্ধান পাইল। যবন আক্রমণের প্রাক্কালে সে পশুপতিকে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিল এবং প্রস্তাব করিল যে তাহারা তখনই গৌড় ত্যাগ করিয়া কাশী চলিয়া যাইবে। কিন্তু তখন আর ফিরিবার পথ নাই।

এইভাবে হেমচন্দ্রের রাজকার্য্য ব্যর্থ হইয়া আসিল। প্রণয়ব্যাপারেও তাঁহার বিশেষ সুখ হইল না। মাধবাচার্য্যের মারফতে ব্যোমকেশের অপবাদ তাঁহার কাছে পহুছিল এবং একদিন মৃণালিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে দুই একটি কথা হইতে তাঁহার বিশ্বাস হইল যে মৃণালিনী অসতী। তিনি মৃণালিনীকে পদাঘাত করিয়া দিলেন। সেই দিনই গৌড়বিজয় সমাপ্ত হইল। চতুর পশুপতি চতুরতর বক্তিয়ারের কাছে সর্ব্বাংশে পরাজিত হইলেন। কারণ বক্তিয়ার দাবী করিলেন যে পশুপতিকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। যবনসৈন্য পশুপতির গৃহে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল। পশুপতি সেই গৃহে যাইয়া তাঁহার ইষ্ট দেবতা অষ্টভুজার মূর্ত্তি তুলিতে চেষ্টা করিতে গেলেন এবং সেইখানে প্রতিমার

সহিত তাঁহার সঞ্জীবন সমাধি হইল। যবন সৈন্য যাহাদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল হেমচন্দ্র তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ব্যোমকেশ—মৃত্যুর প্রাক্কালে সে মৃণালিনীর সতীত্বের সাক্ষ্য দিয়া গেল। মনোরমা অনুমৃতা হইল। তৎপূর্ব্বে সে তাহার স্বামীর প্রচুর অর্থ হেমচন্দ্রকে দান করিল এবং সেই অর্থদ্বারা হেমচন্দ্র নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া মৃণালিনীর সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সংক্ষিপ্তসার হইতেই দেখা যায় যে এই উপন্যাস একটি মহান্ দোষে দুষ্ট হইয়াছে। একটি সুদীর্ঘ ও জটিল আখ্যায়িকা সঙ্কুচিত হইয়াছে দুই তিনটি ঘটনাবহুল দিনের মধ্যে। পশুপতির সঙ্গে যবনদের আলাপ আলোচনা হইয়াছে অনেক দিন ধরিয়া; মনোরমা বহু পূর্ব্বেই তুরক দেখিয়াছে। কিন্তু সেই সব আলাপ-আলোচনার কোন বর্ণনা এই গ্রন্থে নাই। কেমন করিয়া পশুপতি সবাইকে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিলেন তাহা আমাদিগকে অনুমান করিয়া বুঝিতে হয়। আখ্যায়িকার প্রধান ঘটনাগুলি একটি রাত্রি ও দুইটি দিনে ঘটিয়াছে। প্রথম রাত্রিতে হেমচন্দ্র ও মনোরমার সাক্ষাৎ। তার পর মহম্মদ-আলি—পশুপতি সংবাদ, তার পর শান্তশীল ও পশুপতির পরামর্শ, ইহার পূর্ব্বেই সেই রাত্রিতে শান্তশীল ও পশুপতিতে সাক্ষাৎ হইয়াছে ও হেমচন্দ্র ফাঁদে পড়িয়া বন্দী হইয়াছেন এবং ইহার পর হেমচন্দ্র মুক্ত হইলেন ও শান্তশীল ও অপর দুইটি লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আহত হইলেন। পর দিন মনোরমা কর্ত্তৃক হেমচন্দ্রের শুশ্রূষা ও হেমচন্দ্রের আরোগ্যলাভ, গিরিজায়া-সংবাদ, মাধবাচার্য্যের প্রত্যাবর্ত্তন, হেমচন্দ্রও

মাধবাচার্য্যের পরামর্শ, পরে (অপরাহ্নে) হেমচন্দ্রের সঙ্গে মনোরমার আলাপ, রাত্রিতে হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর সাক্ষাৎ ও মৃণালিনীবর্জ্জন, অপর দিকে পশুপতি ও মনোরমার পুনরায় সাক্ষাৎ এবং মনোরমার রহস্যোদ্ঘাটন। আমাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন জাগে : এইদিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্য কত! পর দিন প্রভাতে রাজার নৌকাযাত্রার বন্দোবস্ত, প্রহরেক বেলায় ষোড়শ অশ্বারোহীসহ বক্তিয়ার খিলিজির আগমন, লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন, যবনদের অত্যাচার, পশুপতির পরিণতি, ব্যোমকেশের স্বীকারোক্তি, হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর পুনর্মিলন, পশুপতির মৃত্যু। দেখা যাইতেছে বঙ্গবিজয়ের সমগ্রকাহিনী তিনটি ঘটনাবহুল দিনের বর্ণনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

এই উপন্যাসে শুধু যে বঙ্গবিজয়ের ইতিহাসকেই সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে তাহা নহে, পশুপতি-মনোরমার কাহিনীও অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। মনোরমা কেশবের কন্যা হৈমবতী ও পশুপতির স্ত্রী। হৈমবতীর বিবাহ, কেশবের পলায়ন, জনার্দ্দন শর্ম্মার বাড়ীতে আগমন—এই সকল ব্যাপার উপন্যাসের বিষয়ীভূত হয় নাই। উপন্যাসে দেখি যে তাহার নাম মনোরমা, এবং জনার্দ্দন শর্ম্মার বিধবা পৌত্রী বলিয়া সে পরিচিত। পশুপতির সঙ্গে তাহার গভীর প্রণয় এবং পশুপতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যবনের সাহায্যে রাজ্যলাভ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন তাহার সঙ্গে এই প্রণয় জড়িত; রাজা হইলে পশুপতি বিধবাকে বিবাহ করিতে পারিবেন। ইহার পরই দেখি যে মনোরমা তাহার জীবনের রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া পশুপতিকে নিরস্ত করিতে চাহিতেছে এবং তাহারা কাশী যাইয়া শান্তভাবে জীবনযাত্রা করিবে

এই প্রস্তাব করিতেছে। হয়ত পশুপতি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন, কিন্তু বক্তিয়ার খিলিজি তখন রাজধানীর উপকণ্ঠে উপস্থিত!

এই আখ্যায়িকা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উঠিবে। মনোরমা তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস কবে শুনিয়াছিল? উপন্যাসে দেখি যে পশুপতির সঙ্গে মনোরমার পরিচয় বহু দিনের এবং যবনের আগমন, তাহাদের অবস্থিতি, তাহাদের সঙ্গে পশুপতির পরামর্শ—মনোরমার কিছুই অজানা নাই। ইহা দেখিয়া মনে হয় মনোরমার প্রেম ধীরে ধীরে নিবিড়তালাভ করিয়াছে এবং পূর্ব্বইতিহাস জানিত না বলিয়া সেও মনে করিয়াছিল যে পশুপতির প্রস্তাবিত উপায়ই তাহাদের মিলনের একমাত্র উপায়। এই মিলনের যে গুরু মূল্য দিতে হইবে তাহা সে জানিত এবং তাহার জন্য তাহার চিত্ত ব্যথিত হইয়াছে। তাহার মনে বৃদ্ধ রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রেমের দাবীর মধ্যে সংঘর্ষ হইয়াছে। পশুপতির সঙ্গে মহম্মদ আলির কুপরামর্শ শুনিয়া তাহার মন বিদ্রোহী হইয়াছে এবং সে পশুপতিকে পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই কাম "মোহিতা" রমণীর হৃদয় জাগিয়া উঠিয়াছে; মনোরমা বিশ্বাসঘাতকের মহিষী হইতে রাজি হইয়াছে। মনোরমা জানিত যে প্রেম অপ্রতি-রোধনীয়; তাহাকে বাদ দিয়া কোন ধর্ম্ম হয় না। মনোরমা যে উপদেষ্টার কাছে এ কথা শিখিয়াছিল তিনি "অগ্নিস্বরূপ—আলো করেন, কিন্তু দগ্ধও করেন।" মনোরমা কখনও আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে চাহে নাই। কারণ "যে পরকে প্রতারণা করে সে বঞ্চক মাত্র। যে আত্মপ্রতারণা করে, তাহার সর্ব্বনাশ ঘটে।" বিশ্বাসঘাতক পশুপতিকে পরিত্যাগ করিলে সে আত্মপ্রতারণা অপরাধে অপরাধী হইবে।

হেমচন্দ্রকেও সে এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছিল। এবং ইহার জন্যই সে "উন্মাদিনী", "বিবশা"।

কিন্তু ইহার পরে দেখি সে পশুপতিকে নিজের ইতিহাস বলিতেছে এবং পশুপতিকে রাজ্যলাভে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। কবে সে এই কাহিনী জানিল? পশুপতির প্রশ্নের উত্তরে সে বলিতেছে যে সে "একদিন" এই কাহিনী শুনিয়াছিল। মনে হয় সেই "একদিন" মহম্মদ আলির সঙ্গে মন্ত্রণার পর, কারণ তাহা না হইলে সে বহু পূর্ব্বেই পশুপতিকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিতে পারিত। যখন সে শুনিয়াছে তাহার পর প্রথম অবসরে সে পশুপতিকে জানাইয়া নিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু মনোরমা নিজেও বেশ বুঝিতেছে তখন আর সময় নাই। যদি ইহাই হয় তাহা হইলে মনোরমার জীবনে তিনটি সুনির্দ্দিষ্ট ভাগ আছে: (১) পশুপতির সঙ্গে প্রণয় ও বিশ্বাস-ঘাতকতায় সম্মতি, (২) হৈমবতীর ইতিহাস শ্রবণ, (৩) পশুপতিকে নিরস্ত করিবার বিফল চেষ্টা ও জ্যোতির্ব্বিদের গণনার সফলতা। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে সমগ্র কাহিনীটিতে তিন দিনের ও কম সময় লাগিয়াছে। যে রাত্রিতে সে পশুপতির রাজমহিষী হইতে চাহিয়াছে তাহার পরের রাত্রিতেই সে কেশবের কন্যার ইতিহাস পশুপতির কাছে নিবেদন করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অপরাহ্ণে সে হেমচন্দ্রকে বুঝাইল যে প্রেমের বৈধতা অবৈধতা নাই, প্রেম গঙ্গা প্রবাহস্বরূপ, সুতরাং অপ্রতিরোধনীয় ও পবিত্র এবং তাহার কথা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইল যে ইহা তাহার নিজের অভিজ্ঞতার ফল। অথচ সেই দিন রাত্রিতেই সে প্রমাণ করিয়া দিল

তাহার প্রেম বিশুদ্ধ, বৈধ প্রেম। তবে কি মনোরমা প্রথম হইতেই জানিত যে সে পশুপতির স্ত্রী এবং তাহা জানিয়াই কি সে পশুপতির প্রণয়ের প্রতিদান দিয়াছে? এইরূপ মনে করিলে মনোরমার অধিকাংশ কথা ও কার্য্য তাৎপর্য্যহীন হইয়া পড়ে এবং মনোরমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও নষ্ট হইয়া যায়।

মনোরমার কাহিনী অপেক্ষা তাহার চরিত্র আরও রহস্যময়। মনোরমা অসামান্যা রমণী; তাহার চরিত্রের পরিকল্পনা বঙ্কিমপ্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। কিন্তু তাহাকে সম্যক্ বুঝিয়া উঠা যায় না; সে কি রমণী না কোন মায়া অথবা

A dancing shape, an image gay
To haunt, to startle and waylay

ইহাই কি তাহার যথার্থ পরিচয়? আর ইহাই যদি যথার্থ পরিচয় হইবে তাহা হইলে তাহাকে পার্থিব জীবনে আনিবার সার্থকতা কি? মনোরমাকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে সর্ব্বত্র বিফলমনোরথ হইতে হয়। প্রথমতঃ তাহার বয়স কত? বঙ্কিমচন্দ্র কতকগুলি ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু সেই ইঙ্গিত কোন নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছায় না। হেমচন্দ্র প্রথমে মনে করিয়াছেন যে তাহার বয়স পঞ্চদশ হইবে, কিন্তু পরে হেমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে ইহাকে বালিকা মনে করা ভুল; ইহার বুদ্ধির প্রখরতা ও পরিপক্কতা বরং প্রৌঢ়ত্বের আভাস দেয়। তবে তাহার খাঁটি বয়স কত হইবে? তাহার যখন বিবাহ হইয়াছিল তখন তাহার বয়স ছিল আট কিন্তু পশুপতির বয়স কত তাহা লিখিত হয় নাই। আবার কাহিনী যখন আরম্ভ হইয়াছে তখন পশুপতির বয়স

পঁয়ত্রিশ, কিন্তু মনোরমার বয়স নির্দ্দেশ করা হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই অস্পষ্টতা ইচ্ছা করিয়াই রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন "মনোরমার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ কি ষোড়শ, কি ততোধিক, কি তন্ন্যূন, তাহা ইতিহাসে লিখে না। পাঠকমহাশয় স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন।*" মনোরমার রূপের বর্ণনায় ও এই সুস্পষ্ট অস্পষ্টতা আছে। ইহা কোন বিশিষ্ট কালের রূপ নহে—"বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে সর্ব্বকালে সে রূপরাশি দুর্ল্লভ।" গ্রন্থকার তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু বিফল হইয়াছেন। কারণ অঙ্গের সৌন্দর্য্য অন্য রমণীতেও আছে। তাই তাহাকে শুধু সৌকুমার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, মনোরমার তুলনা শুধু সে নিজেই।

মনোরমার হৃদয়ের বিশ্লেষণ করিতে গেলে রহস্য আরও নিবিড় হইয়া উঠে। মনোরমার সঙ্গে হেমচন্দ্রের প্রথম যে সাক্ষাৎ হয় তখন দেখা গেল তাহার সরল বালিকামূর্ত্তি। তাহার পর হেমচন্দ্র তাহার আর এক মূর্ত্তি দেখিলেন বাপী তীরে। ভয় নাই, সঙ্কোচ নাই—যে বাপীকূলে দিনেও সচরাচর কেহ যাইতনা, সেইখানে গভীর রাত্রিতে সে স্নান করিয়া চুল শুকাইতেছে। সেইখানকার জল খুব ঠাণ্ডা, তাই তাহার গায়ের জ্বালা দূর হয়; হয়ত প্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যময়ী মূর্ত্তিতে সে নিজ হৃদয়ের রহস্যের সন্ধান খুঁজিত। হেমচন্দ্র তাহার মনে লজ্জা জাগাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অধিক প্রশ্ন করিলে সে নিশ্চয়ই বলিত, "আমি তো উন্মাদিনী।" যখন হেমচন্দ্র তাহার নির্দ্দেশ শুনিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, তখন সে প্রশ্ন

* মনোরমাকে হেমচন্দ্র বয়স জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল, "বলিতে পারি না।"

করিল, "আমাকে বালিকা ভাবিয়া অবিশ্বাস করিতেছ?" দেখিলেন, মনোরমার ভাবান্তর হইয়াছে, সে আর বালিকা নহে। তিনি ভাবিলেন—মনোরমা কি মানুষী! ইহার পরে পশুপতির সঙ্গে মনোরমার সাক্ষাৎ। পশুপতি মনোরমাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখিয়াছেন। তিনিও রহস্যের সন্ধান না পাইয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন। পশুপতির বর্ণনা খুব স্পষ্ট "তোমার দুই মূর্ত্তি—এক মূর্ত্তি আনন্দময়ী, সরলা বালিকা......... সেইরূপে আমার হৃদয় শীতল হয়। আর তোমার এই মূর্ত্তি গম্ভীর তেজস্বিনী, প্রতিভাময়ী, প্রখর বুদ্ধিশালিনী, এ মূর্ত্তি দেখিলে আমি ভীত হই।" এই শেষের মূর্ত্তিকে পশুপতি সরস্বতীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। মনোরমা কখন কোন্ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই; জোর করিয়া কেহ তাহার বুদ্ধি-প্রদীপ জ্বালিত করিতে পারিত না, জোর করিয়া কেহ তাহা নিবাইতে পারে নাই। শুধু তাহাই নহে। এই ভাবান্তর এত অলক্ষিতে মুহূর্ত্তের মধ্যে সাধিত হয় যে কখন কি ভাবে কি হইল পশুপতি অথবা হেমচন্দ্র ধরিতে পারেন নাই। সকল দিক্ দিয়া মনোরমা অপূর্ব্ব, অনন্যসাধারণ।

মনোরমা সরলা বালিকা, মনোরমা তেজস্বিনী, প্রতিভাময়ী, মনোরমা উন্মাদিনী আবার গম্ভীর স্থিরবুদ্ধিসম্পন্না। অথচ মনোরমার চরিত্রে কোথাও বৈষম্য নাই, অসামঞ্জস্য নাই। মনোরমা সকল সময়েই মনোরমা; তাহার ভাবান্তরের মধ্যেও অসঙ্গতি নাই। তাহার চরিত্রের বিভিন্নতা ও বৈষম্যের মধ্যে সুসঙ্গতির সূত্র কোথায়? মনোরমা হইতেছে নারীর সেই মূর্ত্তি যাহা পুরুষের চোখে প্রতিভাত হয়। পুরুষের কাছে নারী গৃহিণী, সচিব ও সখী, বৈচিত্র্যময়ী ও রহস্যময়ী। পুরুষ

রমণীকে নানা অবস্থায় দেখে, নানা অবস্থার মধ্যে তাহাকে আপনার করিয়া পায়, তবু মনে হয় তাহার মধ্যে এমন একটি বৈচিত্র্য, রহস্য আছে যাহা কিছুতেই সরল ও সহজ হয় না। পুরুষের এই বিস্মিত, চকিত, মুগ্ধ অনুভূতি মূর্তি পাইয়াছে মনোরমার চরিত্রে। দা ভিঞ্চি অঙ্কিত মোনালিসার রহস্যময় হাসির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নাই, কারণ এই মূর্তি নারীর নিজস্ব মূর্তি নহে, কোন স্ত্রী-চিত্রকর এই ছবি আঁকিতেন না। পুরুষের কাছে রমণী যে রহস্যময়ী মোহিনী মূর্তিতে প্রতিভাত হয়, ইহা তাহারই অনুলিপি। মনোরমাও তাই। মনোরমাকে আমরা প্রায় কখনও একা দেখি না, তাহার কোন স্ত্রী সহচরী নাই। তাহা হইলে এই রহস্য থাকিত না। তাহাকে যতবার দেখি পশুপতি অথবা হেমচন্দ্রের দৃষ্টিতে দেখি। সেই দৃষ্টিই তাহার চরিত্রের বৈচিত্র্যের মধ্যে সুসঙ্গতি আনিয়াছে; এই দৃষ্টি দিয়া দেখিতে গেলে রহস্যের সমাধান হইবে না, কারণ এই দৃষ্টিই রহস্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মনোরমার কোন বয়স নাই, কারণ সে চিরন্তনী রমণীমূর্তি। এই জন্যই তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই সুন্দর হউক তাহাদের বিশ্লেষণে তাহার রূপের মাধুর্য্য বুঝা যাইবেনা। অন্য রমণীতে যে মাধুর্য্য আছে তাহার দ্বারা মনোরমার রূপের পরিমাপ হইতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেক রমণীতে অল্পাধিক পরিমাণে মনোরমার গুণ আছে, আর ইহাই যুগেযুগে রোমান্সের সৃষ্টি করিয়াছে।

এই পর্য্যন্ত এই গ্রন্থের যে আলোচনা করা হইল তাহার মধ্যে গ্রন্থের নায়ক হেমচন্দ্র ও নায়িকা মৃণালিনীকে যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে এই উপন্যাসে দুইটি কাহিনী আছে, তাহাদের

মধ্যে সংযোগ খুব সামান্য এবং তাহাই ইহার অন্যতম প্রধান ত্রুটি। হেমচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্গবিজয়ের সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। শেষের দিকে হেমচন্দ্র এই আখ্যান হইতে এতদূরে সরিয়া গিয়াছেন যে ব্যোমকেশের মৃত্যু ও স্বীকারোক্তি ইহার মধ্যে না থাকিলে হেমচন্দ্র একেবারেই বাহিরে পড়িয়া যাইতেন। হেমচন্দ্রের চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে কি ভাবকে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা ঠিক করিয়া বলা মুস্কিল। তাঁহার চরিত্র নায়কের প্রতিকৃতি না তাহার 'ভেজান' বুঝা যায় না। মাধবাচার্য্য তাঁহাকে বিজয়ী যবনের প্রতিদ্বন্দ্বী করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু এই প্রণয়োন্মত্ত যুবক মৃণালিনীর জন্য পিতৃরাজ্য হারাইলেন, মৃণালিনীর সংবাদ না পাইলে দেবকার্য্যে হাত দিতে তিনি অসমর্থ এবং সেই কার্য্য হাতে লইয়াও পথে মৃণালিনীর সংবাদের জন্য বিলম্ব করিতে লাগিলেন। মাধবাচার্য্য তাঁহাকে লইয়া গৌড়ে যাইয়া তাঁহাকে উপবনগৃহে স্থাপিত করিলেন এবং গৌড়ের সামন্তরাজদিগকে শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চলিলেন। হেমচন্দ্র উপবন গৃহে বসিয়া মৃণালিনীর সংবাদের জন্য ব্যস্ত হইলেন! তিনি গৌড়রাজসভার মন্ত্রণা জানিতে চেষ্টিত হইয়াছেন অথবা গৌড়রাজার সৈন্যের সংস্পর্শে আসিতে চাহিয়াছেন এমন কোন প্রমাণ নাই। মৃণালিনী ও গিরিজায়াকে পদাঘাত করিতে ইহার পটুতা যত, গৌড়রাজার সঙ্গে একত্রিত হইয়া তাঁহার সৈন্যের পুরোভাগে যুদ্ধ করিতে ব্যস্ততা তদপেক্ষা অনেক কম। জন্মভূমি যখন বিজিত হইল, তখন বিজেতার অত্যাচার তিনি দেখিয়াছিলেন খুব বেশী করিয়া এবং কিছু কিছু পীড়িতের সাহায্যও করিয়াছিলেন। কিন্তু যেই ব্যোমকেশের স্বীকারোক্তি শুনিলেন, অমনি মৃণালিনীর সঙ্গে

মিলিত হইয়া সুখসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।—"আর সেই নগর মধ্যে যবন বিপ্লবের যে কোলাহল উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের বীচিরববৎ উঠিতেছিল,—আজ হৃদয়সাগরের তরঙ্গ-রবে সে রব ডুবিয়া গেল।" যবনযুদ্ধের এই নায়ক!

বঙ্কিমচন্দ্র ইঁহার মূঢ়তা সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন তাহা স্পষ্ট নহে, এবং এই অস্পষ্টতার জন্য এই আখ্যায়িকার মূল্য অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। অনেক সময় মনে হয় যে তিনি এমন একটি লোকের চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন যিনি সর্ব্বাংশে বক্তিয়ার খিলিজির উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বক্তিয়ার খিলিজি যে বিজয়ী হইলেন ইহার জন্য দায়ী শুধু পশুপতির ষড়যন্ত্র। বলা বাহুল্য হেমচন্দ্র সম্পর্কে এইরূপ ধারণা সমর্থিত হইতে পারে গ্রন্থ মধ্যে এমন প্রমাণ খুব বেশী নাই এবং বিপক্ষের প্রমাণ যথেষ্ট। আখ্যায়িকায় কয়েকটি চরিত্র হেমচন্দ্রের দুর্ব্বলতা সম্পর্কে সচেতন। এই হিসাবে হেমচন্দ্রের চিত্র জগৎসিংহের চিত্র অপেক্ষা একটু ভিন্ন রকমের। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদা তাঁহাকে মৃণালিনীর নিকট হইতে দূরে রাখিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হেমচন্দ্রের উপরে আস্থা খুব বেশী। হেমচন্দ্র যে কত শূন্যগর্ভ তাহা বোধ হয় মনোরমা টের পাইয়াছিল। পশুপতির মন্ত্রণা সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত সে হেমচন্দ্রকে দেয় নাই, এবং হেমচন্দ্রের সতীত্ববিষয়ক বক্তৃতা তাহার হাসির উদ্রেক করিয়াছে। হেমচন্দ্রকে সে তাহার স্বামীর অর্থ দান করিয়া গিয়াছে কিন্তু হেমচন্দ্র পশুপতির প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ লইবেন এই দুরাশা সে মনে স্থান দেয় নাই। হেমচন্দ্রের বীরত্ব যে কত

ফাঁপা তাহা আর একজন লোক বুঝিত—সে গিরিজায়া। গিরিজায়া হেমচন্দ্রকে লইয়া কৌতুক করিয়াছে, তাঁহাকে পাষণ্ড বলিয়া গালি দিয়াছে, হেমচন্দ্র বেত্রাঘাতের ভয় দেখাইলে তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়াছে এই বলিয়া: "বীর পুরুষ বটে! এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ? কিছু প্রয়োজন ছিল না—এ বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে। মুসলমানের জুতা বহিতে; আর গরীব দুঃখীর মেয়ে দেখিলে বেত মারিতে।" এই সকল ইঙ্গিত যতই স্পষ্ট ও তাৎপর্যাপূর্ণ হউক, হেমচন্দ্রের চরিত্র বিচারে শুধু ইহাদের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। সমগ্র গ্রন্থটিতে তাঁহাকেই নায়ক করা হইয়াছে এবং তাঁহার মধ্যে অনেক বীরোচিত গুণ ও আরোপ করা হইয়াছে। সুতরাং হেমচন্দ্রের চিত্রে আমাদের খুব খট্‌কা লাগে। আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না এই চরিত্রে আসল বীরত্ব কতটুকু আর দম্ভ ও মূঢ়তার আস্ফালন কতখানি।

হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর প্রণয়কাহিনী উপন্যাসের প্রধান আখ্যায়িকা এবং ইহাই ইহার নিকৃষ্টতম অংশ। হিন্দুদের মধ্যে নারীর একনিষ্ঠ পতিভক্তির আদর্শ খুব গৌরব লাভ করিয়াছে; ইহার মহিমা যুগে যুগে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সব আদর্শেরই আতিশয্যে তাহার মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হয় এবং যাহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি মহনীয় তাহারই অস্বাভাবিক অনুশীলন অপচারগ্রস্ত মনের পরিচয় দেয়। জনৈকা সতী নারী কুষ্ঠ-গ্রস্ত স্বামীকে কাঁধে করিয়া গণিকালয়ে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন—এই গল্পও সতীত্বের মহান্ আদর্শ হিসাবে প্রচারিত হইয়াছে। ইহা মহনীয় নহে, বীভৎস। মৃণালিনীর একনিষ্ঠ সতীত্ব এবং পতিভক্তি

ও এই শ্রেণীর বিকৃতি; ইহা বীভৎস নহে, কিন্তু অতিশয় হাস্যোদ্দীপক। হেমচন্দ্র মৃণালিনী সম্পর্কে যে কোন কুৎসা বিশ্বাস করিয়াছেন, তখন মৃণালিনীর কোন কথা শোনেন নাই। হেমচন্দ্র কাপুরুষের ন্যায় মৃণালিনী ও ভিখারিনী গিরিজায়ার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু মৃণালিনী পতিভক্তিতে গদ্গদচিত্ত এবং যে স্বামী বিনা বিচারে কঠিন আঘাত করিয়াছেন তাঁহার যে দেখা পাইয়াছেন ইহাকেই চরম চরিতার্থতা বলিয়া মনে করিয়াছেন। যে একনিষ্ঠ ভক্তি কোন অবস্থায়ই এক চুল বিচলিত হয় না তাহা সজীব হৃদয়ের পরিচয় দেয় না। মনে হয় মৃণালিনী যেন কলের পুতুল; একবার যখন দম দেওয়া হইয়াছে তখন আর কোন ব্যতিক্রম হইবে না। হেমচন্দ্রের সন্দেহপরায়ণতাও বিকারগ্রস্ত মনের পরিচয় দেয়। এই মূঢ়তায় জগৎসিংহ ও তাঁহার কাছে হার মানিয়া যান। তাঁহার পরিণীতা স্ত্রী বিবাহের জন্য মথুরায় গিয়াছেন ইহা তিনি কেমন করিয়া মনে স্থান দিলেন বুঝিতে পারা যায় না। তারপর একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইতে পারে যে হৃষীকেশের কথা ও গিরিজায়ার কথার মধ্যে যে সামঞ্জস্য নাই তাহার কারণ উভয়ই মিথ্যা। কিন্তু হেমচন্দ্রের এতটুকু বিচার বুদ্ধি নাই। মৃণালিনীর বর্জ্জন আরও অবিশ্বাস্য; অনুতপ্ত হেমচন্দ্র মৃণালিনীর কথা শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন ইহা কোন রকমেই গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয় না। ইহা শুধু উন্মাদগ্রস্ত রোগীর পক্ষেই সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র কি ইহাই বলিতে চাহিয়াছিলেন যে হিন্দু রমণীর পতিভক্তি এমন আশ্চর্য্য কল যে উন্মাদগ্রস্ত রোগী ও চাবি দিলে তাহা

ঠিক মত চলিবে? এই কাহিনী বঙ্কিম প্রতিভার নিকৃষ্টতম নিদর্শন।

প্রথম তিনখানি উপন্যাসে স্ত্রীর বা প্রণয়িনীর চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা সন্দেহের কাহিনী আছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে এই সময়ে তিনি শেক্সপীয়রের রচনার দ্বারা খুব প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। শেক্সপীয়র Much Ado About Nothing, The Winter's Tale, Cymbeline প্রভৃতিতে নিছক মিথ্যা সন্দেহ লইয়া কমেডি রচনা করিয়াছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'মৃণালিনী'তে এই সমস্ত নাটকের প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু এই সব নাটকগুলি শেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ রচনা নহে; তারপর ইহারা কমেডি। 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'মৃণালিনী কমেডি নহে; অথচ বঙ্কিমচন্দ্র এমন আখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন যাহা শুধু কমেডিতেই সুসঙ্গত হইতে পারে। 'কপালকুণ্ডলা' এই দুইটি উপন্যাস হইতে সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন। নবকুমারের সন্দেহ নিছক মিথ্যা হইলেও অমূলক নহে। কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের আন্তরিক মিলন হয় নাই, এবং বঙ্কিমচন্দ্র পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে সেই অবস্থায় নবকুমারের মনে সন্দেহের উদ্রেক না হইয়া পারে না। এইখানে শেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকের প্রভাব লক্ষ্য করা যাইতে পারে। ওথেলোর সন্দেহ মিথ্যা সন্দেহ। কিন্তু সেই অবস্থায় ওথেলোর পক্ষে অন্য সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব ছিল। ইহাই শেক্সপীয়রের প্রধান কৃতিত্ব। জগৎসিংহ ও হেমচন্দ্রের অমূলক সন্দেহের মধ্যে এই অনিবার্য্যতা নাই।

'মৃণালিনী'তে বহু মৌলিক ত্রুটির উল্লেখ করা গিয়াছে। এই

উপন্যাসের ঘটনা-সন্নিবেশ ও নির্দ্দোষ নহে। প্রথম সংস্করণে বক্তিয়ারের হস্তিযুদ্ধ এবং হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক সেই হস্তীর বধ বিস্তারিত করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই, বরং আখ্যায়িকার গতি আরও দ্রুত হইয়াছে। দুই একটি আভাসে ও ইঙ্গিতে সেই কাহিনী প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু মৃণালিনীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত সম্বন্ধে সেই সংযম রক্ষিত হয় নাই। হেমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ ও তাঁহার বিবাহ সম্পর্কে বহু তথ্য দেওয়া হইয়াছে যাহা মূল উপন্যাসে অবান্তর। তিনি যে হেমচন্দ্রের বিবাহিত পত্নী' এই কথা বলা যদি প্রয়োজনই হইয়া থাকে, দুই একটি কথায় বলিলেই চলিত; কিন্তু সেই ভাবে উল্লেখ না করিয়া গ্রন্থশেষে (যেখানে এই সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে) ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। * মৃণালিনীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত তিন দফায় বর্ণিত হইয়াছে—প্রথম মাধবাচার্য্য ও হেমচন্দ্রের কথোপকথন, তারপর মণিমালিনীর কাছে মৃণালিনীর নিবেদন, অবশেষে গিরিজায়ার কাছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা। অথচ এই তিনটি বর্ণনার মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নাই; নূতন দুই একটা ঘটনার বর্ণনা থাকিলেও চরিত্রের কোন অপ্রকাশিত লক্ষণ অভিব্যক্ত হয় নাই।

'মৃণালিনী'র একটি ক্ষুদ্র ঘটনা অতিশয় সুন্দর। তাহার উল্লেখ করিয়াই এই আলোচনা শেষ করিব। বৃদ্ধ জগন্নাথের বধিরতার ছিদ্র

* মৃণালিনী মণিমালিনীকে কানে কানে তাঁহার বিবাহের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠককে তাহা বলা হয় নাই। গ্রন্থে যে সকল ঘটনা ঘটিবে ও কথোপকথন হইবে বিশেষ কারণ না থাকিলে পাঠকের নিকট হইতে তাহা গোপন করা উচিত নহে।

অতি নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। তিনি হেমচন্দ্রের কথা যে ভাবে বিকৃত করিয়া শুনিয়াছেন তাহাতে বধিরতা ও শ্রবণশক্তির অদ্ভুত সমন্বয় হইয়াছে। এই ঘটনাটিতে যে হাস্যরস আছে তাহার মূল আরও গভীর। তাঁহার সর্ব্বশেষ উক্তিটিতে একটি বৃহত্তর ইঙ্গিত আছে। 'ব্রাহ্মণ স্বয়ং "ব্রাহ্মণি! ব্রাহ্মণি!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী তখন স্থানান্তরে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন—ডাক শুনিতে পাইলেন না! ব্রাহ্মণ তখন অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণীর ঐ বড় দোষ। কানে কম শোনেন।" জীবনে ও সাহিত্যে যেখানে যেখানে হাস্যরসের উদ্ভব হয় তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ভুল দেখিতে পাই। আমরা নিজেদের ত্রুটি সম্পর্কে একেবারে অচেতন এবং অপরের মধ্যে সেই ত্রুটি না থাকিলেও অল্পমাত্র প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্তমনে তাহা আরোপ করিয়া বসি।

(৪)

'বিষবৃক্ষ' প্রথম যুগের শেষ উপন্যাস। চিত্তশুদ্ধি বা আত্মসংযম সম্পর্কে যে নীতি বঙ্কিমচন্দ্র পরে প্রচার করিয়াছেন এই উপন্যাসে তাহার সূচনা আছে। 'বিষবৃক্ষ' নামই তাহার পরিচয়। কিন্তু নিছক সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রেরণা ও গৌণ নহে। অসংযত প্রণয় বিষবৃক্ষের বীজ; প্রণয়ের একটা মহিমা আছে যাহা অসংযমের মধ্যেও তাহার রাজটীকা পরাইয়া দেয়। মনোরমার মুখ দিয়া প্রণয়ের যে গৌরব ঘোষণা করা হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। নগেন্দ্রনাথ নিজের অসংযমে 'জগদীশ্বরের হাত' দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং যখন

মনে করিতেছিলেন যে এই প্রবৃত্তির আহার না জোগাইলে 'উন্মাদগ্রস্ত' হইবেন তখনই কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কুন্দের সরলতা সকলে অনুভব করিয়াছে; এমন কি সূর্য্যমুখী পর্য্যন্ত কুন্দের বিরুদ্ধে কোন নালিশ আনিতে পারেন নাই।

এই সঙ্গে আর একটি যে কাহিনী আছে তাহা একটু অন্য প্রকারের। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকেও 'বিষবৃক্ষ' আখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের বিষবৃক্ষের মৌলিক প্রভেদ আছে। এই দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ হীরার বিষবৃক্ষ। হীরার চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র পাপের পরিপূর্ণ চিত্র আঁকিতে চাহিয়াছেন। অন্য কোন গ্রন্থে পাপের এত নগ্ন মূর্ত্তি আঁকার চেষ্টা হয় নাই। এই হিসাবে হীরা বঙ্কিমসাহিত্যে অনন্যা। কুন্দ 'সরলা' হীরা 'সর্পী'। কল্যাণের মূল পরোপচিকীর্ষা আর অমঙ্গলের গোড়ায় রহিয়াছে মাৎসর্য্য, পরের শ্রীতে কাতরতা ও পরের অপকার করিবার ইচ্ছা। কুন্দ হীরার কোন অপকার করে নাই; দেবেন্দ্র দত্ত যে তাহার জন্য লুব্ধ ইহা কুন্দ জানিতেও পারে নাই এবং জানিতে পারিলে দেবেন্দ্রকে সে কোনরূপ উৎসাহ দিবে না ইহাও হীরা জানিত। তবু কুন্দকে হীরা ক্ষমা করিতে পারিতেছে না। য়িহুদীদের পুরাণে শয়তান যেরূপ কারণে আদম ও ঈভের ক্ষতি করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিল তাহাই হীরাকেও প্রণোদিত করিয়াছে। শেক্সপীয়র এড্‌মণ্ড ও ইয়াগোর চরিত্রে অবিমিশ্র পাপের মূর্ত্তি আঁকিতে চাহিয়াছিলেন, হীরা ইহাদের আত্মীয়া। ইয়াগো সর্ব্বদাই তাহার পাপপ্রবৃত্তির মূল অনুসন্ধান করিত। শেষে দেখিতে পাইল ক্যাশিয়ো প্রভৃতি সৎ এবং সে নীচ; অপরের জীবনের মাধুর্য্য তাহাকে কালিমা লিপ্ত

করে এবং তাহারই জন্য সে অপরের ক্ষতি করিতে চাহে। হীরা ও নিজের মনকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে। কুন্দের বিরুদ্ধে সে নিজেকে সশস্ত্র করিয়াছে; কিন্তু দেখিয়াছে যে তাহার অস্ত্রের মধ্যে কুন্দও একজন। কুন্দকে হাতে রাখিতে হইবে, কারণ নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখীর মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু সূর্য্যমুখীর অপরাধ?—হীরা হিসাব করিয়া দেখিল যে সূর্য্যমুখীর অপরাধই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। "সূর্য্যমুখীর থোঁতা মুখ ভোঁতা হবে? ....আচ্ছা, সূর্য্যমুখীর উপর আমার এত রাগই বা কেন? সে ত কখন আমার কিছু মন্দ করে নাই, বরং ভালই বাসে, ভালই করে। তবে রাগ কেন? ......কেন, বল্‌বো? সূর্য্যমুখী সুখী আমি দুঃখী, এই জন্য আমার রাগ। সে বড়, আমি ছোট—সে মুনিব, আমি বাঁদী। ......যদি বল, ঈশ্বর তাকে বড় করিয়াছেন, তার দোষ কি? আমি তার হিংসা করি কেন? তাতে আমি বলি, ঈশ্বর আমাকে হিংসুকে করেছেন আমারই বা দোষ কি?" এইরূপ উদ্দেশ্য অনুসন্ধান ইয়াগোর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু হীরা ইয়াগোর মত দুষমন নহে। তাহার চিত্তও প্রণয়ে উদ্বেলিত হইয়াছে, ইয়াগো সম্পূর্ণরূপে অনুভূতিহীন।

হীরার হৃদয়ে প্রণয়ের উন্মেষ হইয়াছিল। আর দেবেন্দ্র দত্ত এই প্রণয়ের প্রতিদান দিয়াছেন হীরার সর্ব্বনাশ করিয়া। তাঁহার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ উচ্ছৃঙ্খলতা। দেবেন্দ্র দত্ত হীরার মত দ্বেষপরায়ণ নহেন, কিন্তু খাঁটি প্রেম কাহাকে বলে তাঁহার জানা ছিল না। এই দুই নরনারীর সম্পর্ক হইতে যে বিষবৃক্ষের সৃষ্টি তাহার ফল অতীব ভয়াবহ।

পাপের ক্ষয় করিবার শক্তি অনন্যসাধারণ; তাহা শুধু অপরকেই নষ্ট করে না পাপীকেও ধ্বংস করে। দেবেন্দ্র ও হীরার কাছে কুন্দ সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ। ইহাদের পাপে কুন্দ ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু দেবেন্দ্র ও হীরার কোন সুখ বা সমৃদ্ধি হয় নাই। তাহাদের পরিণতি সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ। পাপ তাহাদিগকে একেবারে ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছে। কুন্দের মৃত্যুর পর নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখী যখন পুনর্মিলিত হইলেন তখন একটি ক্ষুদ্র বালিকার মৃত্যুর স্মৃতি তাঁহাদের মাঝখানে পড়িল বটে, কিন্তু তাঁহারা আবার নূতন জীবন আরম্ভ করিতে পারিলেন। সেই জীবন কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব্বেকার দাম্পত্য জীবনের মত সরস ও সুধাপূর্ণ না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের জীবনীশক্তি সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হইয়া যায় নাই। কুন্দের মৃত্যু স্বার্থত্যাগের দ্বারা মহীয়ান্; শেষ দৃশ্যে ফুল যেন আপনার সৌরভ বিলাইয়া দিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু দেবেন্দ্র তাহার লাম্পট্যের ফল ভোগ করিয়াছে তিল তিল করিয়া; মৃত্যু তাহার কাছে আসিয়াছে অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে। হীরা মৃত্যুর শান্তিও পাইল না; তাহার অভিশপ্ত জীবনে মুক্তি সহজ-প্রাপ্য নহে। সে দেবেন্দ্রের যন্ত্রণায় উল্লসিত হইয়াছে, কিন্তু নিজে বিষে জর্জ্জরিত হইয়া উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়াছে।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে ঘটনাসন্নিবেশ অতি কলা-কৌশলময়। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র উপন্যাস যেখানে আখ্যায়িকা নানা খণ্ডে বিভক্ত না হইয়া একটানা ভাবে চলিয়াছে; গণিতের ধাপের মত একটির পর একটি পরিচ্ছেদ অনিবার্য্য ভাবে আসিয়াছে। কোথাও অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয় নাই, কোথাও কাহিনী অনাবশ্যক ভাবে থামিয়া থাকে

নাই। * উপন্যাসে পরিচ্ছেদ আছে পঞ্চাশটি। ইহার কেন্দ্রীয় ঘটনা—নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনীর বিবাহ—আসিয়াছে ঠিক মাঝখানে—পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে। এই কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে নিয়তি। তাই গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে এইখানে আকস্মিক কিছুই নাই; সকল পরিণতিই পূর্ব্ব হইতে স্থির হইয়া আছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কুন্দের মা উপসংহারের পূর্ব্বাভাস দিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থকারের কাছে তাহা যথেষ্ট মনে হয় নাই। তিনি নিজেও একাধিকবার অনিবার্য্য পরিণতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিয়তি পূর্ব্ব হইতেই ছক্ কাটিয়া রাখিয়াছে; তাহা এড়াইবার সাধ্য কাহারও নাই। ঘটনার এইরূপ সন্নিবেশের দ্বারা নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনীর প্রেমের অপ্রতিরোধনীয় শক্তি বিশেষ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

এই উপন্যাসে সময়ের গতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র খুব সজাগ। নগেন্দ্রনাথ সর্ব্বতোভাবে সুখী ছিলেন। কখনও চিত্তসংযম অভ্যাস করেন নাই, কারণ প্রয়োজন হয় নাই। হঠাৎ তিনি এক অনতিক্রমণীয় আসক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছেন। কেমন করিয়া দিনে দিনে তিনি পীড়িত ও বিপর্য্যস্ত হইলেন তাহারি বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তাই সময়ের গতি অতিশয় স্পষ্ট ইঙ্গিতের সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ যখন কুন্দনন্দিনীকে লইয়া কমলের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন কুন্দের বয়স তের, নগেন্দ্রনাথের বয়স তিরিশ।

* শুধু তারাচরণের ইতিবৃত্তে গ্রন্থকারকে একটু থামিতে হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি কৈফিয়ত দিয়াছেন।

তখনই নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর রূপ দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন, কিন্তু সে ক্ষণিক বিস্ময়মাত্র, তাহার সঙ্গে পরবর্ত্তী উন্মাদনার কোন নিকট সম্পর্ক নাই। তার পর কুন্দনন্দিনীর বিবাহ ও বৈধব্য। এই বিষয়ের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের সম্পর্ক কম। কাজেই বিবাহ হইতে বৈধব্যে তিন বৎসরের অধিক কাল লাগিলেও তাহার বর্ণনা খুব সংক্ষিপ্ত, ইহার মধ্যে মাত্র একটি কথা উল্লেখযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে কুন্দকে দেখিতে পাইলেন।

ইহার পরে নগেন্দ্রনাথের উন্মাদনা, বিবাহ ও অনুশোচনার কাহিনী। উপন্যাসের প্রথমাংশে দেখি যে অল্প ব্যবধানের পর পরই নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনী পরস্পরের প্রতি বেশী করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছে। এই ক্রমিক আকর্ষণের চিত্র অতি সুন্দর ভাবে আঁকা হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথের চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন হয় নাই; তিনি একই পথে এক এক ধাপ করিয়া নামিয়া গিয়াছেন। এই জন্য নগেন্দ্রনাথের ইতিহাসের দুইটি স্তরের মাঝখানে হীরা, দেবেন্দ্র দত্ত, কমলমণিকে আনা হইয়াছে। তাহারা সরিয়া গেলেই মনে হইয়াছে খানিকটা সময় চলিয়া গিয়াছে। আমরা নগেন্দ্রনাথের দিকে তাকাইয়া দেখি তিনি যে জায়গায় ছিলেন ঠিক সেই জায়গায় আর নাই; পথের পরিবর্ত্তন হয় নাই, কিন্তু তিনি স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কুন্দ বিধবা হইয়া নগেন্দ্র দত্তের বাড়ী আসিল এই সংবাদ আমরা পাইলাম অষ্টম পরিচ্ছেদে। একাদশ পরিচ্ছেদে সূর্য্যমুখীর পত্রে নগেন্দ্রের উন্মাদনার প্রথম পরিচয় পাইলাম। এই উন্মাদনা একদিনে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করে নাই; তাহা হইলে লম্পট দেবেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার প্রভেদ থাকিত না। নবম পরিচ্ছেদে

হরিদাসী বৈষ্ণবীর আবির্ভাব হইল এবং দশম পরিচ্ছেদে তাহার স্বরূপ বর্ণিত হইল। একাদশ পরিচ্ছেদে সূর্য্যমুখীর পত্রে ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রনাথের বর্ণনায় নগেন্দ্রনাথের উন্মাদনা সুপরিস্ফুট হইল। তারপর শ্রীশচন্দ্রের কলিকাতার বাড়ীতে মহাসমর, কমলের গোবিন্দপুরে আগমন ও হরিদাসী বৈষ্ণবীর পুনরাবির্ভাব এবং তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ। ইহার মধ্যে কমল জানিয়া লইয়াছে যে শুধু যে নগেন্দ্রনাথই কুন্দনন্দিনীতে আসক্ত তাহা নহে, কুন্দও মজিয়াছে। এই পর্য্যন্ত কুন্দ ও নগেন্দ্রনাথকে আমরা একা পাই নাই; তাহাদের মনের ভাব আমরা অপরের সাহায্যে জানিয়াছি। এইবার বঙ্কিমচন্দ্র অপর কোন চরিত্রের সাহায্য ছাড়া তাহাদের মনের রহস্য উদ্ঘাটিত করিলেন। উপন্যাসের রীতির সঙ্গে নাটকের রীতি মিলিত হইল। কুন্দনন্দিনী সরলা ও অবাক্পটু। সে নিজের মনের কথা কাহাকেও খুলিয়া বলিতে পারে না। তাই সে একাকী প্রদোষে নিজের মনের কথা নিজের কাছে বলিতে লাগিল, সে আত্মস্থ, অন্যমনস্ক; আমরা যেন তাহার অন্যমনস্কতার সুবিধা লইয়া আড়ি পাতিয়া শুনিয়া লইলাম। ইহাই শ্রেষ্ঠ আর্টের লক্ষণ। যেই নগেন্দ্র আসিলেন অমনি কুন্দ আর কথা বলিতে পারিল না; নগেন্দ্রের প্রণয়সম্ভাষণের উত্তরে সে শুধু ছোট একটি 'না' বারংবার বলিল। এইখানে নগেন্দ্র-কুন্দ'র জীবনের একটা সঙ্কটমুহূর্ত্ত, ইহার পরে এই কাহিনীতে একটা যতি পড়িয়াছে। এই ফাঁকে হীরার বিষবৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম। এই ভাবে কুন্দের বিষবৃক্ষ ও হীরার বিষবৃক্ষ একত্রিত হইল। কুন্দ পলায়ন করিয়া হীরার কাছে আশ্রয় পাইল। এই অবসরে আমরা হীরা ও দেবেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইলাম। হীরা

নগেন্দ্রনাথকে বুঝাইল যে কুন্দ সূর্য্যমুখীর অত্যাচারে পলাইয়াছে। নগেন্দ্রের উন্মত্ততা ইন্ধন পাইল। আগে ছিল রূপসীর জন্য আসক্তি; এখন তাহার সঙ্গে যুক্ত হইল উৎপীড়িতার প্রতি ন্যায় বিচার ও সহানুভূতি। ইহার পর কুন্দের প্রত্যাবর্ত্তন, সূর্য্যমুখীর অনুশোচনা নগেন্দ্র ও কুন্দের বিবাহ।

এইখানে প্রথমার্দ্ধ সমাপ্ত। কিন্তু বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিলেন। এইখানে আর একবার যতি পড়িয়াছে এবং সেই সুযোগে গ্রন্থকার নগেন্দ্রনাথের জীবনের গতি ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁহার মত ও বিষবৃক্ষের অর্থ বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন। তারপর সূর্য্যমুখী গোবিন্দপুর হইতে যত দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন, নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনীও পরস্পর হইতে ততই বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। এক দূরত্ব অপর দূরত্বের মাপকাঠি। নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দ-নন্দিনীর এই বিচ্ছেদ অতিশয় মর্ম্মান্তিক। ইহারা পরস্পরের কাছে আসিয়া দেখিয়াছে; কথা খুঁজিয়া পায় নাই। কুন্দনন্দিনী যখন একাকী রহিয়াছে তখন বুঝিতে পারিয়াছে যে সকল সুখেরই সীমা আছে। তার পর নগেন্দ্রনাথ ও হরদেব ঘোষালের পত্রালাপ। হরদেব ঘোষাল হ্যামলেট নাটকের হরেশিয়োর মত। তাঁহার নিকট হইতে নিঃসম্পর্কিত একটি লোকের বিচার পাওয়া যায়। তিনি সবই দেখিতেছেন ও বুঝিতেছেন; যে মাত্রাবোধ অন্য সবাই হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহা তাঁহার আছে। এইখানে বঙ্কিমচন্দ্র সময়ের নির্দ্দেশ খুব স্পষ্ট করিয়াছেন। বিবাহের অব্যবহিত পরে নগেন্দ্রনাথ মনে করিয়াছেন তিনি কত সুখী। পনের দিন পরে তাঁহার সন্দেহ

হইয়াছে তিনি কুন্দনন্দিনীকে ভালবাসেন কিনা, এক মাস পরে তাঁহার কাছে কুন্দনন্দিনীর সান্নিধ্য অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সূর্য্যমুখীর অন্বেষণে বাহির হইয়া গেলেন। গোবিন্দপুর শূন্য হইয়া গেল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই উপন্যাস গ্রীক্ নাটকের সদৃশ। শুধু যে নিয়তির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসের চিত্রই আঁকা হইয়াছে তাহা নহে, ইহার গঠনও অনেক বিষয়ে গ্রীক্ নাটকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গোবিন্দপুরের রঙ্গমঞ্চ খালি রহে নাই। সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ, নগেন্দ্রনাথের অন্বেষণ, শিবপ্রসাদ শর্ম্মার মহানুভবতা—এই সকল যেন বাহিরের জিনিষ। পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিবে প্রধানত: গোবিন্দপুরের উপরে। নগেন্দ্রনাথের ও সূর্য্যমুখীর অন্তর্দ্ধানের পর সেইখানে রহিয়াছে—হীরা, দেবেন্দ্রদত্ত ও কুন্দনন্দিনী। হীরার বিষবৃক্ষ এইবার মুকুলিত হইবার অবকাশ পাইল। ইহার পর নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসিলেন ; হীরা কুন্দনন্দিনীর জীবননাশ করিয়া উধাও হইয়া গেল। তাহার পর তাহাকে মাত্র আর একবার দেখা গেল। এম্‌নি করিয়া দুইটি কাহিনী এক সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। ছোট কাহিনীটি আসিয়াছে মূল কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে ; কোথাও তাহার জায়গা জুড়িয়া বসে নাই। কুন্দনন্দিনীর মার প্রথম আবির্ভাব ও দ্বিতীয় আবির্ভাবের মধ্যে চার বৎসর গত হইয়াছে এবং তারাচরণের মৃত্যু পর্য্যন্ত তিন বৎসর অতীত হইয়াছে। সুতরাং মূল আখ্যায়িকায় এক বৎসর লাগিয়াছে। সময়ের গতির অন্যান্য যে সব ইঙ্গিত আছে তাহা হইতেও এইরূপ অনুমানই সমর্থিত হয়।

যেদিক্ হইতেই এই উপন্যাসের বিচার করা যাইবে ইহার অনন্ত-

সাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে। যে সকল গৌণ চরিত্র প্রধান কাহিনীর প্রয়োজনে সৃষ্ট হইয়াছে তাহাদের উপযোগিতা সুপরিস্ফুট। যে যে কারণে আসিয়াছে সে তাহা সার্থক করিয়াই বিদায় লইয়াছে। প্রথমেই শ্রীশচন্দ্র, কমলমণি ও সতীশচন্দ্রের কথা মনে পড়ে। সূর্য্যমুখী যখন নগেন্দ্রনাথের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন তখন তাঁহার মনের কথা জানিবার জন্য একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রয়োজন। কমলের অবতারণার ইহাই প্রধান উপযোগিতা। কিন্তু ইহা ছাড়া আর একটি প্রয়োজন ও সিদ্ধ হইয়াছে। সোনার কমলের স্নিগ্ধোজ্জ্বল দাম্পত্যজীবন সূর্য্যমুখী—নগেন্দ্রনাথ-কুন্দের ট্র্যাজেডিকে অধিকতর স্পষ্ট করিয়াছে—যেন বিষবৃক্ষের অনতিদূরে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ একটি বৃক্ষ তাহার মাধুর্য্য বিস্তার করিতেছে। কুন্দনন্দিনীকে লইয়া নগেন্দ্রনাথ যখন কমলের গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন কমলের কোন সন্তানের উল্লেখ করা হয় নাই। কুন্দনন্দিনীর বৈধব্যের পর সূর্য্যমুখী যখন কমলের কাছে চিঠি লিখিয়াছেন তখন সতীশচন্দ্রের বয়স এক বৎসর। উপন্যাসে যে সকল সঙ্কেতের সাহায্যে সময়ের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে ইহা তাহাদের অন্যতম। অবশ্য সময়ের গতির অন্যান্য নিদর্শন এত স্পষ্ট যে তাহার জন্য সতীশচন্দ্রের অবতারণার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সতীশচন্দ্রকে দেখিয়া আর একটি কথা আমাদের মনে স্বতঃই উদিত হয়। সূর্য্যমুখী পতিপ্রাণা—কিন্তু বন্ধ্যা। যদি তাঁহার ও নগেন্দ্রনাথের মধ্যে যৌথ সন্তানবাৎসল্যের আকর্ষণ থাকিত; তাহা হইলে দাম্পত্য জীবনের বন্ধন কি আরও দৃঢ় হইত না? নগেন্দ্রনাথ দৈবাহত; বোধ হয় কিছুতেই তাঁহার নিষ্কৃতিলাভ হইত না। নিয়তি কেন বাধ্যতে? তবু সতীশ

চন্দ্রকে দেখিয়া সমস্যার এই দিকটার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। তারপর, প্রধান কাহিনী দুইটি এই রকমের যে তাহাদের মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা অসম্ভব। এই উপন্যাসের গঠন এমন আঁটা সাঁটা যে এখানে কোন গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে আনা যায় না। হাস্যরসের অভাব বঙ্কিমচন্দ্র পূরণ করিয়াছেন শ্রীশচন্দ্র ও কমলের যুদ্ধ বিগ্রহ ও সতীশচন্দ্রের শিশুসুলভ কাজের বর্ণনার দ্বারা। নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা, তাঁহার বাড়ীর দাসদাসী দরওয়ান প্রভৃতির সরস বর্ণনা ও এই অভাব খানিকটা পূরণ করিয়াছে।

যে সকল চরিত্র একেবারে গৌণ—যাহারা শুধু উল্লিখিত হইয়াছে অথবা দুই একবার মাত্র দেখা দিয়াছে—তাহাদের সন্নিবেশও সুসঙ্গত হইয়াছে। গৃহত্যাগ করিয়া সূর্য্যমুখী নানা জায়গায় গিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত উপসংহারে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শিবপ্রসাদ শর্ম্মা ও হরমণির সংবাদ একটু বিস্তারিতভাবে দেওয়া হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ততা ও বিস্তৃতির কারণ আছে। গোবিন্দপুর কাহিনীর প্রধান রঙ্গমঞ্চ। সেইখান হইতে সূর্য্যমুখী বেশী সময় দূরে থাকিলে, উপন্যাসের ঐক্য নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথকে গোবিন্দপুরে ফিরিতে হইবে। তাঁহারা বিভিন্ন পথে ফিরিলেন ও পুনরায় মিলিত হইলেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হওয়ার দরকার। তাই সূর্য্যমুখীর মৃত্যু সংবাদ তাঁহার কাছে পহুছিল। এই মিথ্যা সংবাদের সত্য ভিত্তি দেখান প্রয়োজন। সেই জন্য সূর্য্যমুখীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে ব্রহ্মচারী ও হরমণির সঙ্গে মিলনের কাহিনীকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। হীরার আত্মীয়

নামোল্লেখ করা হইয়াছে উপন্যাসের প্রথমাংশেই ; কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাই মাত্র একবার আখ্যায়িকার শেষের দিকে। তখন ছেলেরা তাহাকে লইয়া মজা করিতেছে এবং সেও কেষ্টরস ও ইষ্টিরস লইয়া গোল পাকাইতেছে। এ লঘু রসিকতার সঙ্গে সঙ্গে একটি গভীরতর প্রয়োজনও সাধিত হইয়াছে। হীরার পরিণাম খুব ভীষণ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাব বিস্তৃত বর্ণনা দিলে তাহার বিষবৃক্ষের ছায়ায় নগেন্দ্রনাথের বিষবৃক্ষ ঢাকা পড়িয়া যায়। এই জন্য প্রথমে হীরার আয়ীর মারফতে হীরার পরিণামের অস্পষ্ট আভাস দেওয়া হইয়াছে। আয়ীর মারফতে যে আভাস দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য এই পরিণতিকে আমরা সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারি ; নচেৎ ইহা একটু অতিনাটকীয় হইয়া পড়িত। হীরার আয়ীকে একবার দেখিতে পাইয়াছি ; কিন্তু দেবেন্দ্র দত্তের স্ত্রী সর্ব্বদা যবনিকার আড়ালেই রহিয়াছে। যে কখনও উপন্যাসে দেখা দিল না তাহার কথা একাধিবার উল্লিখিত হইল কেন এই প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতঃই জাগিয়া উঠে। বাস্তবিক পক্ষে এই উল্লেখের ও একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। হৈমবতী "কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী ও আত্মপরায়ণা"। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে দেবেন্দ্রের অধঃপতনের প্রধান কারণ হৈমবতীর কুরূপ ও গুণহীনতা। নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী সূর্য্যমুখী রূপসী, প্রিয়বাদিনী ও পরার্থ-পরায়ণা। তবু নগেন্দ্রনাথ কামোন্মত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পদস্খলনের চিত্র উপন্যাসে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আঁকা হইয়াছে। ইহার কার্য্যকারণ শৃঙ্খলাকে অতিশয় স্পষ্ট করা হইয়াছে। দেবেন্দ্রের অধঃপতনের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র আঁকিতে গেলে গ্রন্থের ঐক্য নষ্ট হইয়া যায়। অথচ

তাঁহার চরিত্রের যে দিকটা বর্ণিত হইয়াছে তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করা চাই, তাঁহার পরিণতিরও কারণ খুঁজিতে হইবে। এই জন্য হৈমবতীর এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারি যে দেবেন্দ্রের জীবনেও একটা ব্যথাময় করুণ দিক্ আছে; দেবেন্দ্র একজন সজীব মানুষ, শুধু লাম্পট্যের প্রতিমূর্ত্তি নহে।

এই উপন্যাসের আখ্যায়িকা রচনায় নানা বিচিত্র কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুই একটির উল্লেখ করা প্রয়োজন। গল্পের অনেক মৌলিক অংশ পত্রের সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য অন্যান্য উপন্যাসেও এই রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমলা জগৎ সিংহকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন এবং ভ্রমরও গোবিন্দলাল একাধিকবার পত্রালাপ করিয়াছে। কিন্তু নগেন্দ্র, সূর্য্যমুখী ও হরদেব ঘোষালের পত্র অন্য ধরণের। বিমলা তাঁহার জীবনের পূর্ব্ববৃত্তান্ত পত্রের সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সূর্য্যমুখী প্রত্যাবর্ত্তনের পর পূর্ব্ববৃত্তান্ত মুখেই জানাইয়াছেন। ভ্রমর ও গোবিন্দলাল পরস্পরের কাছে চিঠি লিখিয়াছে তাহাদের এক একটি সঙ্কল্প জানাইবার জন্য। যে সময় তাহারা চিঠি লিখিয়াছে তখন একে অপরের নিকট হইতে অনেক দূরে। তখন চিঠি না লিখিয়া উপায় ছিল না। এইরূপ পত্র ব্যবহার নাটকেও চলিতে পারে। কিন্তু সূর্য্যমুখীর পত্রে যে রীতি অবলম্বিত হইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে উপন্যাসের রীতি। নগেন্দ্রনাথ যে কুন্দনন্দিনীতে আসক্ত হইয়াছিলেন তাহার প্রত্যক্ষ চিত্র খুব তীব্রভাবে আঁকা হইয়াছে একটি পরিচ্ছেদে। এই উন্মাদনা একদিনে আসে নাই। একটু একটু করিয়া এই আসক্তি দৃঢ় হইয়াছে। প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

ব্যাপারে ইহা ধরা পড়িয়াছে, এমন অনেক সামান্য অথচ অর্থপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা অন্যের চোখে না পড়িলেও সূর্য্যমুখীকে এড়াইতে পারে নাই। নগেন্দ্রনাথের এই সঙ্কীয়মান আসক্তি প্রকাশ পাইয়াছে সূর্য্যমুখীর একখানি পত্রে। যাহা নাটকোচিত রীতিতে প্রত্যক্ষ করিতে অনেক সময় লাগিত উপন্যাসে এই পত্রের সাহায্যে একটি পরিচ্ছেদেই তাহা প্রকাশ পাইল। নগেন্দ্রনাথের অন্যমনস্কতা ও উন্মাদনার স্বরূপ আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট হইয়াছে, কারণ আমরা সূর্য্যমুখীর ব্যথিত ক্ষুব্ধ দৃষ্টি দিয়া তাহা দেখিতেছি। ইহার পর সূর্য্যমুখী কমলমণিকে আরও দুইবার পত্র লিখিয়াছেন—কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে। এই চিঠি দুইটিতে নগেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমরা নূতন কোন আলোক পাই না। সেই দিক্ দিয়া ইহাদের কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু ইহাদের সাহায্যে সূর্য্যমুখীর পরিচয় অধিকতর স্পষ্ট হইয়াছে। সূর্য্যমুখী কেন যে কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের বিবাহ দিলেন সেই কথা নগেন্দ্রনাথকে বলা যায় না। তাহা হইলে সূর্য্যমুখীর চরিত্রের তেজ ও কমনীয়তার সম্যক্ প্রকাশ পায় না। আর বিবাহের পূর্ব্বে কমলের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইলে বিবাহই হয়ত হইত না।* ইহাই পত্রালাপের উপযোগিতা। এই সকল পত্র শুধু ঘটনার বিবরণই দেয় না; চরিত্রের স্বরূপও প্রকাশিত করে।

নগেন্দ্রনাথ হরদেব ঘোষালকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন তাহাদেরও বিশেষ সার্থকতা আছে। তাঁহার প্রথম পত্রে কুন্দনন্দিনীর প্রতি তাঁহার আকর্ষণের সূত্রপাতের পরিচয় পাওয়া যায়। কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে

* পলায়নের পূর্ব্বে দেখা হইলে পলায়নও সম্ভব হইত না।

বিবাহের পরে যে পত্রালাপ আছে তাহা আরও বেশী উপযোগী। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়াছেন; কুন্দনন্দিনী ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছেন। নগেন্দ্রনাথকে এখন সমস্ত ব্যাপার নিভৃতে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। অথচ নগেন্দ্রনাথ এখন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নহেন। সুতরাং তাঁহার মনের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে এমন একজন লোকের সঙ্গে তাঁহাকে মিলিত করিতে হইবে যিনি সম্পূর্ণ অবিচলিত, যিনি সমস্ত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, কিন্তু একটু দূরে সরিয়া আছেন। এই সময় গোবিন্দপুরে কোন নূতন ঘটনার অভ্যাগম হয় নাই—ধীরে ধীরে অতীত, বর্ত্তমান ভবিষ্যতের পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। চিঠির উত্তর আসিয়া পুনরায় পত্র লিখিতে অনেকটা সময় গিয়াছে। ইহার সাহায্যে নগেন্দ্রনাথের ভাবান্তরের ও পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। *

আরও দুইটি ক্ষুদ্র বিষয়ের উল্লেখ না করিলে উপন্যাসের কলা-কৌশলের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কুন্দের মাতার

* উপন্যাসে পত্রালাপের সাহায্যে কাহিনীর ও চরিত্রের বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে। আধুনিক ইংরেজি উপন্যাসের "জনক" রিচার্ডসন এই পদ্ধতির বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন কিনা বলা যায় না। এই রীতির অবলম্বনের বিপদ্ এই যে একই ঘটনা একাধিকবার উল্লেখ করিতে হয়। এই বিষয়েও বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবসিদ্ধ মাত্রাবোধের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বিনা প্রয়োজনের পত্রালাপের অবতারণা করেন নাই। সুতরাং তাঁহার উপন্যাসে পুনরুক্তি দোষ ঘটে নাই। কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে বিবাহ ব্যাপার একাধিক লোকের পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রনাথ ও হরদেব ঘোষাল—ইহাদের বুঝিবার ও বলিবার ভঙ্গী এত বিভিন্ন যে এই পুনরুক্তিতে বর্ণনায় মাধুর্য্য বৃদ্ধিই পাইয়াছে।

আবির্ভাবের কথা একাধিকবার বলা হইয়াছে। তাঁহাকে দুইবার দেখা যায়—প্রথমবার উপন্যাসের আরম্ভে আর একবার উপসংহারের প্রান্তালে। এই লোকান্তরিতা মহিলার আবির্ভাব ও পুনরাবির্ভাব হ্যাম্‌লেটের পিতার প্রেতমূর্ত্তির আগমন ও পুনরাগমনের চিত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। উভয় ক্ষেত্রেই দ্বিতীয়বার আসার কারণ—সন্তানের শিথিল সঙ্কল্পকে দৃঢ় করা। কিন্তু এই সাদৃশ্যের অন্তরালে গভীর পার্থক্যও আছে। হ্যাম্‌লেটের পিতা হ্যাম্‌লেটকে এমন তথ্য দিয়াছিলেন যাহা রাজকুমারের জানা ছিল না এবং এই তথ্যই তাহার কার্য্যাবলীর (অথবা নিষ্ক্রিয়তার) সূচনা করিয়াছে। এই হিসাবে প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব নাটকবর্ণিত ঘটনাস্রোতের অংশবিশেষ। কুন্দের মাতা ভবিষ্যতের চিত্র আঁকিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কন্যাকে প্রভাবান্বিত করিতে পারেন নাই। তিনি শুধু নিয়তির মুখপাত্র। নিয়তি যে ঘটনাচক্রকে অনিবার্য্য বেগে চালিত করিতেছে তাহাই তিনি জানাইয়াছেন—ইহার অধিক প্রভাব বিস্তার করেন নাই।

এই উপন্যাসে একটি অতি করুণ অথচ মধুর সুসঙ্গতি আছে। যে দুইটি প্রধানা নায়িকাকে লইয়া গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহারা উভয়েই নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী। কিন্তু এই ঐক্য ছাড়িয়া দিলে তাহাদের চরিত্রে ও জীবনের পরিণতিতে প্রভেদের অন্ত নাই। সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী যেন দুইটি বিভিন্ন জগতের মানুষ। অথচ গভীরতম অভিজ্ঞতায় ইহাদের মধ্যে অপরূপ সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে; চরম সঙ্কটে উভয়ের হৃদয়সাগর বিমথিত করিয়া একই সুধা আহৃত হইয়াছে। উভয়েই নগেন্দ্রগতপ্রাণ। একে অপরের মঙ্গলের জন্য পলায়ন করিয়াছে—

কুন্দনন্দিনী সূর্য্যমুখীর পথে কাঁটা হইয়া থাকিতে চাহে নাই, সূর্য্যমুখী নিজে উদ্যোগ করিয়া স্বামীর বিবাহ দেওয়াইয়াছেন। কিন্তু উভয়েই ফিরিয়া আসিয়াছে স্বামীকে দেখিবার জন্য। মৃত্যুর প্রাক্কালে অবাক্‌পটু কুন্দ নগেন্দ্রনাথকে বলিয়াছে, "'ছিঃ! তুমি অমন নীরব হইয়া থাকিও না। আমি তোমার হাসিমুখ দেখিতে দেখিতে যদি না মরিলাম—তবে আমার মরণেও সুখ নাই।" সূর্য্যমুখীও এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন; 'অন্তকালে সবাই সমান।' নানা বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের মধ্যে এইরূপ সৌসাদৃশ্য উপন্যাসের মৌলিক ঐক্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রশেখর—রজনী—কৃষ্ণকান্তের উইল—রাজসিংহ—উপকথা

(১)

'চন্দ্রশেখর' ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে। প্রতাপ—শৈবলিনী—চন্দ্রশেখরের কাহিনী সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক। মীরকাসেম, গুরগণ খাঁ, তকী খাঁ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলেও তাঁহাদের জীবনের যে সকল ঘটনাকে উপন্যাসে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ইতিহাসের স্পর্শ নিবিড় নহে। তবু এই আখ্যায়িকায় ইতিহাস ও কাল্পনিক কাহিনীর মধ্যে পরমাশ্চর্য্য সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক বিপর্য্যয় রোমান্সের মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছে, তাহার রস জোগাইয়াছে। প্রতাপ ও শৈবলিনী বাঙ্গালার নিভৃত পল্লীতে নিস্তরঙ্গ জীবন যাপন করিত। হঠাৎ লরেন্স ফষ্টর শুধু যে চন্দ্রশেখরের নীড় ভাঙ্গিয়া ফেলিল তাহাই নহে, ইহাদিগকে ঐতিহাসিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে টানিয়া আনিল। এই বিপর্য্যয়ের মধ্যে ইহাদের ব্যক্তিগত কাহিনী ইতিহাসের অঙ্গীভূত হইল এবং ইহাদের সাহস, কৌশল ও বুদ্ধি অপরিসীম বিস্তৃতি ও তীক্ষ্ণতা পাইল। ইহারা জীবনযাত্রার অন্যান্য পথ পরিত্যাগ করিয়া ইতিহাসের রাজটীকা ললাটে পরিয়া অনন্যসাধারণ বিশালতা লাভ করিল। ইতিহাসের ঐতিহাসিকতা হয়ত নষ্ট হইল কিন্তু রোমান্সের নিবিড়তা কোথাও লঘু হয় নাই—

ইতিহাসের শুষ্ক কঠোর সত্য কল্পনার রঙে রঞ্জিত হইল, রোমান্সও ইতিহাসের সাহায্যে বিস্তৃতি ও বাস্তবতা লাভ করিল। প্রতাপ যে লরেন্স ফষ্টরকে আঘাত করিয়া শৈবলিনীকে রক্ষা করিলেন, ইহা শুধু শৈবলিনীর উদ্ধার নহে, নবাব ও ইংরেজের যুদ্ধের ইহা একটি প্রধান অধ্যায়। প্রকাশ্য যুদ্ধের পূর্ব্বে এই জাতীয় ঘটনাই উভয় দলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল। শৈবলিনী যে প্রতাপকে রক্ষা করিয়াছিল তাহা একটু অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু শৈবলিনীকে এখন শুধু বাঙ্গালী বধূ হিসাবে দেখিলেই চলিবে না। সে ঐতিহাসিক-সংঘর্ষের কেন্দ্রস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার দুঃসাহস, তাহার অনন্য-সাধরণ কৌশল, তাহার ভুবনমোহন রূপ তাহাকে সর্ব্বজয়ী করিয়াছে। প্রতাপকে উদ্ধার করিয়া শৈবলিনী ধীরে ধীরে ইতিহাসের বিপ্লব ও বিক্ষোভ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রতাপ ঐতিহাসিক কাহিনীর পুরোভাগে রহিয়াছেন। জগৎ শেঠ ও গুরগণ খাঁ তাঁহার ভয়ে ভীত এবং নবাবের শেষ যুদ্ধে প্রতাপ প্রধান যোদ্ধা।

প্রতাপ ও শৈবলিনীর চরিত্রে এই যে বিরাট্ শক্তি ও বিস্তৃতির পরিচয় পাই ইহার কারণ ঐতিহাসিক বিপর্য্যয়; তাহাই ইহাদের সুপ্তশক্তিকে জাগ্রত ও পরিপুষ্ট করিয়াছে। খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাসে দেখিতে পাই যে ইতিহাসের ঘটনা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবের জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে। স্কটের উপন্যাসে এই আলোকপাতের অতি অপরূপ চিত্র রহিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় বলিয়া যে সকল নায়ক-নায়িকা ইতিহাসের অংশ নহে তাহারা নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। স্কটের অনেক উপন্যাসে আবহাওয়া অতিশয় কৌশলের সহিত

রচিত হইয়াছে, ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনার অতি জীবন্ত চিত্র দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু প্রধান নায়ক-নায়িকারা অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। স্কট হয়ত মনে করিয়াছেন যে ইহাদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখকে প্রাধান্য দিলে ইতিহাসের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হইবে। 'চন্দ্রশেখর' ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে; সুতরাং ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। (রাষ্ট্রবিপ্লব প্রতাপ ও শৈবলিনীর জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে, এবং এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য এই যে ঐতিহাসিক বিপ্লবের সংস্পর্শে আসিয়া ইহারা অসাধারণ শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারিয়াছে, ইহাদের ব্যক্তিগত তেজ ও আসক্তির সংসক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাই রোমান্সের বৈশিষ্ট্য।)

(শুধু যে প্রতাপ ও শৈবলিনীর মধ্যেই এই অনন্যসাধারণ শক্তি ও তেজের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে অন্যান্য চরিত্রেও এই মহিমা পরিস্ফুট হইয়াছে। চন্দ্রশেখর কোন বিরাট্ কাজ করেন নাই; সেই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে তিনি প্রতাপ ও শৈবলিনী অপেক্ষা নিষ্প্রভ। কিন্তু চন্দ্রশেখর শর্ম্মাই গ্রন্থের কেন্দ্রস্থ চরিত্র। শৈবলিনী তাঁহার স্ত্রী, রমানন্দ স্বামীর পরমাশ্চর্য্য যোগবল তাঁহারই মঙ্গলের জন্য শৈবলিনীর উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রতাপ নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু চন্দ্রশেখরের সঙ্গে নবাবের সম্পর্ক আরও নিবিড়। চন্দ্রশেখর নবাবের শিক্ষাদাতা এবং চন্দ্রশেখরই নবাবের প্রিয়তমা মহিষী দলনী বেগমকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এমনি করিয়া চন্দ্রশেখর উপন্যাসের বিচিত্র আখ্যায়িকার সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি কোথাও প্রধান নহেন; কিন্তু তাঁহার প্রভাব সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। এই জন্য গ্রন্থের

নামকরণের সময় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকেই স্মরণ করিয়াছেন। তাঁহার গুরু রমানন্দস্বামী ও অনন্যসাধারণ ব্যক্তি। তিনি অভিরাম স্বামী বা মাধবাচার্য্যের মত বিষয়ী সন্ন্যাসী নহেন। শুধু শৈবলিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহার জন্যও তাঁহার মনে খেদ উপস্থিত হইয়াছে; তিনি যে খেদোক্তি করিয়াছেন তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট অন্য কোন সন্ন্যাসীতে অশোভন হইত। রমানন্দ স্বামী নির্লিপ্ততার প্রতীক। তাঁহার চতুর্দ্দিকে যে ঘোর বিপর্য্যয় আলোড়িত হইতেছে তিনি তাহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েন নাই। তিনি শৈবলিনী ও দলনীকে রক্ষা করিয়াছেন কিন্তু ইহাদের ভাগ্যবিপর্য্যয় তাঁহার মনে গভীর দাগ বসাইতে পারে নাই। শৈবলিনী, দলনী ও প্রতাপ—ইহাদের মনের কথা তিনি স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তাহা হইলে হয়ত প্রতাপ ও দলনীর জীবন বিনষ্ট হইত না। এইভাবে রমানন্দ স্বামী চতুর্দ্দিকের কলরোল হইতে অনেক দূরে রহিয়াছেন—মনে হয় পাহাড়ের গায়ে উন্মত্ত সমুদ্র তরঙ্গ আছড়াইয়া পড়িতেছে; একের কলরোলে অপরের প্রশান্ত মহিমা বাড়িয়া গিয়াছে।

পল্লীগ্রামের অন্যান্য যে সকল চরিত্রের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠত্বের এই ছাপ রহিয়াছে। রূপসী প্রতাপের স্ত্রী; কিন্তু তাহাকে কখনও পুরোভাগে দেখা যায় না। তাহার বোন্ সুন্দরী অসামান্যা রমণী। সুন্দরী গোরা দেখিয়া পলাইয়া গিয়াছিল; কিন্তু সঙ্কটকালে শৈবলিনীকে উদ্ধার করিতে সে যে অসমসাহসিক কাজ করিয়াছিল তাহা পল্লীবধূর পক্ষে অসম্ভব না হইলেও অতিশয় বিস্ময়কর। প্রতাপের ভৃত্য রামচরণের মধ্যেও অসাধারণত্বের

ছাপ রহিয়াছে। সে বিশ্বাসী, এবং মূর্খ হইলেও অতিশয় ধূর্ত্ত ও কৌশলী এবং গৃহকর্ম্ম অপেক্ষা গোলাগুলির সঙ্গেই তাহার সম্পর্ক বেশী। যে অবস্থায় দস্যু জমিদার হইয়াছে সেই অবস্থায়ই এইরূপ ভৃত্য তৈরী হইতে পারে।)

(ঐতিহাসিক চরিত্র সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র অন্য প্রকারের কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। সয়ের মুতাক্ষরীন হইতে তিনি কোন কোন ঘটনা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও ইতিহাসকে অবিকৃত রাখেন নাই। মূল ঘটনা বাঙ্গালার শেষে স্বাধীন নবাব মীরকাসেমের পরাজয়। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে 'মৃণালিনী'র সঙ্গে এই উপন্যাসের সাদৃশ্য আছে। এইখানেও অল্পসংখ্যক বিদেশী তাহাদের অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্যের দ্বারা দেশীয় রাজাকে পরাস্ত করিয়াছে এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে প্রধান রাজকর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতা। গুরগণ খাঁ, জগৎশেঠ আমিয়ট, জনষ্টন গলষ্টন প্রভৃতি ইংরেজ,—ইহাদের কাহারও চরিত্র বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু প্রত্যেকেই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। গুরগণ খাঁ আর্মেনিয়াবাসী বস্ত্রবিক্রেতা, নিজের বুদ্ধিবলে ও ভগিনীর সাহায্যে প্রধান কর্ম্মচারী হইয়াছেন। তবু তাঁহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না; মীরকাসেমকে সরাইয়া তিনি নিজেই নবাব হইতে চাহেন। এই জাতীয় লোক রাষ্ট্রবিপ্লবই কামনা করে, মনে করে সেই মন্থনের ফলে তাহারা অমৃত পাইবে। কিন্তু অনেক সময় অমৃত ভোগ করে বখ্‌তিয়ার ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দল, পশুপতি ও গুরগণখাঁর ভাগে আসে হলাহল। গুরগণখাঁর উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানহীনতা, লক্ষ্যের প্রতি তাঁহার অবিচলিত দৃষ্টির চিত্র একটি দৃশ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা

বিস্ময়ের বিষয় এই যে গুরগণখাঁ সম্পূর্ণ একাকী; তিনি কাহাকেও ভালবাসেন নাই, নিজের ভগিনীকে স্বামীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতায় প্রলুব্ধ করিয়াছেন এবং সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইলে ভগিনীর সর্ব্বনাশের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। এই নির্ব্বিকার পুরুষের কাছে কোন সম্পর্কই পবিত্র নহে; কোন প্রিয়জনের সুখই ইহার কাম্য নহে। যে সকল ইংরেজ তখন এ দেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহাদের চিত্রও এইভাবে দুই এক কথায় খুব স্পষ্ট ও অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। লরেন্স ফষ্টর লম্পট ও ভীরু, সুতরাং তাহার কথা বাদ দিতে হইবে। আমিয়ট্, জনষ্টন প্রভৃতি নির্ভীক এবং নিজেদের জাতির স্বার্থসম্পর্কে সদা সচেতন। বঙ্কিমচন্দ্র এই সকল চরিত্রচিত্রণে অনন্যসাধারণ কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। কোথাও আতিশয্য নাই, বর্ণবহুলতা নাই; অথচ প্রত্যেকটি চরিত্র স্পষ্ট, জীবন্ত।

লক্ষ্মণ সেনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কোন শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি ছিল না। সুতরাং তাঁহার যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহাতে শুধু অকর্ম্মণ্যতা ও ভীরুতাই প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মীরকাসেম বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব এবং তিনি বীরের মত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছেন। তাঁহার সাহস, ন্যায়-অন্যায় বিচার করিবার শক্তি, প্রজাবাৎসল্য দুই একটি ঘটনা ও কথার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। তিনি আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। কিন্তু 'চন্দ্রশেখর' ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে। সুতরাং ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহের গল্প যতই চমকপ্রদ হউক তাহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। বাঙ্গালার নবাব দুইটি সাম্রাজ্য হারাইয়া

ছিলেন—এক বাঙ্গালার মসনদ যাহা তিনি শত চেষ্টা করিলেও রাখিতে পারিতেন না, আর এক সাম্রাজ্য দলনী বেগমের হৃদয় "যে অজেয় রাজ্য বিনা যত্নে থাকিত"। দলনী বেগম ও নবাবের প্রেম কাহিনীর পট ভূমিকায় রহিয়াছে রাষ্ট্রবিপ্লব এবং এই বিরাট পটভূমিকার সাহায্যে এই প্রেমের কাহিনী বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

'চন্দ্রশেখর' ছয়টি খণ্ডে বিভক্ত; ইহা ছাড়া একটি উপক্রমণিকা আছে। কাহিনীর সূত্র যে ভাবে যোজনা করা হইয়াছে তাহাতে দুই একটি ত্রুটি আছে, কিন্তু মোটের উপর ইহাও অপূর্ব্ব কৌশলের পরিচয় দেয়। ঘটনাগুলিকে সাজান হইয়াছে শৈবলিনীর জীবনের বিচিত্র গতি লক্ষ্য করিয়া এবং ছয়টি খণ্ডের নামকরণও ইঙ্গিতময়—'পাপীয়সী' 'পাপ', 'পুণ্যের স্পর্শ,' 'প্রায়শ্চিত্ত', 'প্রচ্ছাদন' ও 'সিদ্ধি'। এই ছয়টি খণ্ডকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে: প্রথম দুইটিতে শৈবলিনীর পাপ, (পাপীয়সী ও পাপ), তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত (পুণ্যের-স্পর্শ ও প্রায়শ্চিত্ত), পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডে শৈবলিনীর (তথা প্রতাপের) সিদ্ধি (প্রচ্ছাদন ও সিদ্ধি)। এই কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে দলনীর বৃত্তান্তের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে দলনীর অবতারণা করা হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাও উপক্রমণিকার অন্তর্গত। তারপর দলনীর কথা তখনই বিস্তৃত করিয়া বলা হইয়াছে যখন শৈবলিনী একটু আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে। লরেন্স ফষ্টর শৈবলিনীকে লইয়া পলাইয়া যাওয়ার পর এবং প্রতাপ কর্তৃক তাহার উদ্ধারের পূর্ব্বে যে সময় অতিবাহিত হইয়াছে তাহার মধ্যে দলনী ও গুরগণ খাঁ সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে।

তার পর শৈবলিনী ও দলনীর জীবনসূত্র একত্র গ্রথিত হইল এবং উভয়ের কথা একইসঙ্গে বর্ণিত হইল। ইহার পর ইহাদের মধ্যে পুনরায় বিচ্ছেদ এবং সেই বিচ্ছেদের পর শৈবলিনীর বিচিত্র অভিযান, প্রতাপের উদ্ধার এবং শৈবলিনীর পলায়ন ও প্রায়শ্চিত্ত। এই প্রায়শ্চিত্তের পর শৈবলিনী আবার আড়ালে পড়িয়াছে, বেদগ্রামে যাইয়া সে পুরাতন জীবনকে নূতন করিয়া পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই খণ্ডের নাম দিয়াছেন প্রচ্ছাদন। কোন অতি আধুনিক ঔপন্যাসিক হয়ত শৈবলিনীর বিকৃত মানসিক অবস্থার চুলচেরা বিশ্লেষণ দিতেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর বিকারের চিত্র আঁকিয়াছেন দুই একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত ও সুন্দরী ও চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তাহার অনতিদীর্ঘ কথোপকথনের মধ্য দিয়া। তাহার পর তাহাকে দূরে সরাইয়া কাহিনীর এই ফাঁক ভরিয়া দিয়াছেন দলনী বেগমের পরিণতির বর্ণনা দিয়া। এমনি করিয়া দলনী বেগম শৈবলিনীর কাহিনীতে আপনার ন্যায্য আসন পাইয়াছে।

গ্রন্থের উপক্রমণিকায় দেখি যে প্রতাপ ও শৈবলিনী তাহাদের জীবনের প্রধান সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিল গঙ্গার জলে ডুবিয়া। তখন প্রতাপ ডুবিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন শৈবলিনী পারে নাই। সে মনে মনে বলিয়াছিল, "কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে, আমি মরিতে পারিব না।" মুর্শিদাবাদে প্রতাপকে রক্ষা করিয়া শৈবলিনী আর একবার নদীতে প্রতাপের সঙ্গে সাঁতার দিতে দিতে তাহাদের পুরাতন সমস্যার সমাধান করিতে চাহিল। এই সন্তরণ আসিয়াছে গ্রন্থের ঠিক মাঝখানে। ইহাদের পুরাতন সমস্যা এইখানে নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এবারও প্রতাপ মরিতে

চাহিয়াছিলেন কিন্তু শৈবলিনীর 'জীবননদীতে প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল। "আমি মরি, তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন?"' কিন্তু প্রতাপকে শৈবলিনীর জীবন হইতে মুছিয়া যাইতে হইবে। শৈবলিনী প্রাণান্তকর শপথ করিল যে প্রতাপের চিন্তা ও সে মনে স্থান দিবে না। উপক্রমণিকায় যে ঘটনা আছে তাহারই পুনরাবৃত্তি হইল, কিন্তু এই পুনরাবৃত্তি নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত হইয়াছে।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ঘটনা বিন্যাসের নানা কৌশলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। কিন্তু ঘটনার আকস্মিক সামঞ্জস্যের প্রতি জোর দেওয়ায় শেষের দিকে আখ্যায়িকার গতি যেন মন্থর হইয়া আসিয়াছে। দলনী যে নিষ্পাপ এবং শৈবলিনী যে ফষ্টরের উপপত্নী নহে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থকার সকলকে একত্র করিয়াছেন। কুল্‌সমকে দলনীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল, সে নবাবের নিকট উপস্থিত হইল, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীকে বেদগ্রাম হইতে আনা হইল। শুধু ইহাদের কথাতেই হইবে না। শৈবলিনী ও কুল্‌সমের সাক্ষ্যের সমর্থন করিবার জন্য ফষ্টরকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। নবাব বুঝিলেও চন্দ্রশেখর ও রমানন্দস্বামীর নিকট সকল কথা স্পষ্ট হইল না; সুতরাং আর এক দফা জবানবন্দী ও জেরা উপস্থাপিত হইল এবং ইহারই জন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রতাপ সুপ্তসিংহের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিলেন। এই জবানবন্দী, জেরা ও রায় দেওয়ার সময় আখ্যায়িকার অগ্রগতি প্রায় থামিয়া গিয়াছে; চরিত্রেরও কোন নূতনতর বিকাশ হইতেছে না। যে উপন্যাস শুধু কাহিনীকে আশ্রয় করে

তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে গ্রন্থশেষে যে রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে তাহা পাঠকের নিকট হইতেও গোপন রহিবে। কিন্তু এই উপন্যাসে সেই সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই। পাঠকের অজ্ঞাত কিছুই ছিল না; নবাব, রমানন্দ স্বামী ও চন্দ্রশেখরের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে যাইয়া গ্রন্থকার পাঠককে ভুলিয়া গিয়াছেন।)

কুল্‌সম ও শৈবলিনীর চরিত্রের কোন কোন অংশে শেক্সপীয়রের রচনারীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কুল্‌সম ওথেলো নাটকের এমিলিয়ার অনুসরণে অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এমিলিয়ার মতই সে প্রভুপত্নীর প্রতি অনুরক্ত আবার এমিলিয়ার মতই তাহার দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ। ডেস্‌ডিমোনার মৃত্যুর পূর্ব্বে এমিলিয়া ষড়যন্ত্র ধরিতে পারে নাই, মৃত্যুর পর সকল কথা তাহার কাছে স্পষ্ট হইয়াছে। দুইয়ে দুইয়ে কেমন করিয়া চার হইয়াছে ইহা সে তখন বুঝিতে পারিয়াছে এবং সকল কথা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। তাহার স্বীকারোক্তিতে ওথেলো ডেস্‌ডিমোনার সতীত্বের প্রমাণ পাইল, আমরা এমিলিয়ার চরিত্রের নূতনতর পরিচয় পাইলাম। কুল্‌সম চরিত্রের পরিকল্পনা এত সূক্ষ্ম ও গভীর নহে। কুল্‌সম যেন খেয়ালের বশেই দলনীকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। সুতরাং সে যখন ফিরিয়া নবাবের কাছে সকল কথা ব্যক্ত করিল তখন নবাবের চক্ষু উন্মীলিত হইল বটে কিন্তু আমরা কোন নূতন রহস্যের সন্ধান পাইলাম না। শৈবলিনীর উন্মাদগ্রস্ততার চিত্র রাজা লীয়রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় যদিও সাদৃশ্য খুব নিবিড় নহে। শেক্সপীয়র ও বঙ্কিমচন্দ্র মস্তিষ্ক বিকারের বর্ণনা দিয়াছেন দুই একটি ইঙ্গিতময় দৃশ্যের সাহায্যে এবং উভয় চিত্রেই দেখি উন্মাদগ্রস্ত

ব্যক্তি সম্পূর্ণ পাগল নহে, যে নিদারুণ অভিজ্ঞতা বিচারবুদ্ধিকে বিকল করিয়া দিয়াছে তাহাই নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। রাজা লীয়র বিকারের মধ্যে কেবলই তাঁহার অকৃতজ্ঞ মেয়েদের কথা বলিয়াছেন, শৈবলিনী ও বিকৃত দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছে—লরেন্স ফষ্টর ও পার্ব্বতীকে। রাজা লীয়র আত্মীয় জনকে গনেরিল ও রিগ্যান বলিয়া ভুল করিয়াছে, শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে মনে করিয়াছে লরেন্স ফষ্টর ও সুন্দরীকে ভাবিয়াছে পার্ব্বতী বলিয়া।

চন্দ্রশেখর সম্পর্কে সকল আলোচনার পর একটি প্রশ্ন বিশেষ করিয়া মনে জাগে: প্রতাপের জীবন বলিদানের সার্থকতা কি? প্রতাপ চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর সুখের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিলেন, রূপসীর কথা ভাবিলেন না, নিজের কথা ভাবিলেন না—এই সুখের মূল্য কি? রমানন্দ স্বামী শৈবলিনীর জন্য এত কঠিন প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিলেন, উন্মাদরোগ হইতে সুস্থ হইয়া শৈবলিনী যেন নূতন জীবন পাইল, কিন্তু তবু দেখা গেল শৈবলিনীর মনকে বিশ্বাস নাই। সে নিজেও নিজেকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, প্রতাপ ও সেইজন্য নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া শৈবলিনীকে মুক্ত করিয়া গেলেন। প্রতাপের মৃত্যু যেন রমানন্দস্বামীর যোগবল, Psychic Force ও শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের উপর কঠিন পরিহাস। মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থ প্রণয়নে দোটানায় পড়িয়া গিয়াছিলেন। তিনি নীতিবেত্তা ও সৌন্দর্য্যের উপাসক। তাঁহার নীতিজ্ঞান সৌন্দর্য্যবোধকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে নাই; সুতরাং কবি বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও কোথাও আত্ম-প্রকাশ করিয়া নীতিবেত্তাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন। এই কবি বঙ্কিমের

কাছে শৈবলিনী প্রতাপের প্রণয় অগ্রাহ্য নহে। তাই প্রতাপ রূপসী সম্পর্কে উদাসীন এবং একবার প্রতাপ মনে মনে চন্দ্রশেখর ও রূপসীকে এই বলিয়া গালি দিয়াছিলেন যে তাঁহার শৈবলিনীর সঙ্গে বিবাহ না হইয়া রূপসীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল। যখন শৈবলিনী বলিল, "তোমার ঐশ্বর্য্য আছে—বল আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে, রূপসী আছে—আমার কি আছে, প্রতাপ ?" প্রতাপ উত্তর করিলেন, "কিছু না—আইস, তবে দুইজনে জলে ডুবিয়া মরি।" নিজ জীবন বিসর্জ্জনের এই আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল যুদ্ধক্ষেত্রে শৈবলিনীর নিকট হইতে নির্দ্দেশ পাইবার বহুপূর্ব্বে। প্রতাপ যে চন্দ্রশেখরের সুখের জন্য জীবন ত্যাগ করিলেন তাহার মধ্যে পরোপচিকীর্ষা ছিল নিশ্চয়ই ; কিন্তু মনে হয় আর একটি অনুভূতিও ছিল—যে জীবন হইতে শৈবলিনী সম্পূর্ণ রূপে মুছিয়া গিয়াছে তাহা তাঁহার কাছে দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হইয়া থাকিবে। এই অনুভূতি কবি বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি। নীতিবেত্তা বঙ্কিম চন্দ্র চন্দ্রশেখরের মুখ দিয়া শৈবলিনীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন "প্রতাপ কি তোমার জার ?" কবি বঙ্কিম শৈবলিনীর মারফতে উত্তর দিয়াছেন, "ছিঃ! ছিঃ!......এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বন মধ্যে ফুটিয়াছিলাম, ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলেন কেন ?"

। ২ ।

রজনীর চরিত্র লিটন প্রণীত Last Days of Pompeiiর নিদিয়ার অনুসরণে পরিকল্পিত। নিদিয়া অন্ধ, দরিদ্র ফুলওয়ালী। গ্লকাস নামক গ্রীক যুবকের প্রতি তাহার গভীর প্রণয় সঞ্চারিত

হইয়াছিল। সেই প্রণয় সে প্রকাশ করিতে পারে নাই—সে অন্ধ; তদুপরি ক্রীতদাসী। কিন্তু এই বালিকার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল সে সমস্ত পথ চিনিত, কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারিত। যখন বিষুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পাই নগররী ধ্বংস হইতে লাগিল, তখন চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কেহ কোথা ও পথ দেখিতে পারে না; মাঝে মাঝে পর্ব্বত হইতে ভয়ঙ্কর আলোক বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল; সে আলোকে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। অন্ধের দিবারাত্রি সমান; নিদিয়া গ্লকাস ও তাহার প্রণয়িনীর হাত ধরিয়া তাহাদিগকে পথ চিনাইয়া সমুদ্রতীরে লইয়া আসিল। প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান দৃষ্টিশক্তি; প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের দিনে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান যখন নিষ্ক্রিয় হইয়া গেল, তখন অন্ধ বালিকা চক্ষুষ্মান্ গ্লকাসের পথ প্রদর্শক হইল। লিটন অন্ধ বালিকার প্রণয় কাহিনীর এক পরম বিস্ময়কর পট ভূমিকা রচনা করিয়াছেন।

নিদিয়া তাহার মনের কথা বলিতে পারিত না—সে অন্ধ ক্রীতদাসী। তাহার ঈর্ষ্যাদিগ্ধ প্রেমের প্রকাশ হইত অতি অদ্ভুত-ভাবে। সে কখনও হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত, কখনও সে প্রতিদ্বন্দ্বী Ioneর ক্ষতি করিতে উদ্গ্রীব হইত, কখনও ঈর্ষ্যাকে সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া ফেলিয়া গ্লকাসের সুখে নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিত, এবং এই পরোপচিকীর্ষার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই সে সাগরের শীতল জলে ঈর্ষ্যা ও ব্যর্থ প্রণয়ের জ্বালা ডুবাইয়া দিল। যাহার চক্ষু নাই তাহার অনুভূতিগুলি কি চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির অনুভূতি হইতে একটু পৃথক্ হইবে না? অনুভূতি ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধি। সুতরাং

একের অনুভূতির সঙ্গে অপরের অনুভূতির মৌলিক পার্থক্য না থাকাই সম্ভব। কিন্তু অনুভূতির অভিব্যক্তি হয় ইন্দ্রিয়ের মারফতে এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সে রস সংগ্রহ করে। যাহার চক্ষু নাই, তাহার অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি সাধারণতঃ খুব প্রখরতা লাভ করে। প্রখরতা থাক্ বা না থাক্ এই অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাকে বিশ্বসংসারের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হইবে এবং সেই উপলব্ধিকে রূপ দিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু সর্ব্ব প্রধান। সুতরাং চক্ষুহীনের উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি হইবে সম্পূর্ণরূপে অনন্য-সাধারণ। লিটন উপলব্ধির এই অনন্যসাধারণত্বের প্রতি দৃষ্টি দেন নাই। নিদিয়া পরমাশ্চর্য্য রমণী; তাহার কার্য্যকলাপ বিস্ময়কর এবং অদ্ভুত। ইহার অতিরিক্ত কোন বৈশিষ্ট্যের চিত্র তিনি আঁকেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র অন্ধের উপলব্ধির বৈশিষ্ট্যের কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসিক ছিলেন। Last Days of Pompeii শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রজনী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন মানসিক তত্ত্ব-ব্যাখ্যানের জন্য। সুতরাং ঐতিহাসিক পরি-বেশের দ্বারা তাঁহার উপন্যাস আচ্ছন্ন হয় নাই। রজনী ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী; ইহাতে যে অপ্রত্যাশিত ঘটনা আছে তাহা বিশ্ববিপ্লবের অগ্নু্যৎপাত নহে; সম্পত্তির হস্তান্তর সম্ভাবনা। অন্ধের অনুভূতি যাহাতে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতে পারে সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এই কাহিনী বর্ণনা করেন নাই; রজনীই তাহার কথা বলিয়াছে। গ্রন্থকারের বলিবার ভঙ্গী এবং রজনীর বলিবার ভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য থাকিবেই। কারণ ইহাদের উপলব্ধি করিবার

রীতি স্বতন্ত্র। লিটন্ প্রকাসের দুইটি প্রণয়িণীর চিত্র আঁকিয়াছেন; ইহাদের বাহিরের বিভিন্নতার প্রতিই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, অন্ধ রমণীর অনুভূতির যথার্থ রূপ তিনি আঁকিতে চেষ্টা করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান কৃতিত্ব এই যে তিনি এই বৈশিষ্ট্যের যে অভিব্যক্তি দিয়াছেন তাহার মাধুর্য্য ও বৈচিত্র্য অনন্যসাধারণ। রজনী রূপ দেখিতে পারে না; সে রূপকে গ্রহণ করে শব্দ শুনিয়া, গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, কোমল স্পর্শ অনুভব করিয়া। রজনী তাহার অন্ধকার জগতের অপূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন কিন্তু এই জগতে শব্দস্পর্শগন্ধের সাহায্যে সে যে সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছে তাহার তুলনা নাই।

অন্ধ রমণীর হৃদয়ে হঠাৎ প্রেম জাগরিত হইল। রজনী এই বলিয়া তাহার আখ্যায়িকা আরম্ভ করিয়াছিল যে তাহার প্রকৃতি সাধারণের প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন। কিন্তু প্রণয়ের সর্ব্বত্র অবাধ গতি; অন্ধ রমণীও শচীন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া সকলের সঙ্গে মিলিত হইল, কারণ প্রণয় সার্ব্বজনীন। এইখানেও অন্ধের বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইল না। তাহার অনুভূতির সঙ্গে অপরের অনুভূতির সাদৃশ্য থাকিবে; কিন্তু তাহার উপলব্ধি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহার অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে শচীন্দ্রনাথের অভ্যাগমে যে শিহরণ জাগিল তাহা শব্দস্পর্শ গন্ধময়। শচীন্দ্রনাথের কণ্ঠের শব্দ তাহাকে চমকিত করিল, শচীন্দ্র নাথের স্পর্শে সে সম্পূর্ণ মজিল। সে ফুলের মালা গাঁথিত, জগৎকে সে চিনিয়াছে ফুলের গন্ধের সাহায্যে, ফুলের কোমল স্পর্শের মধ্য দিয়া। সে বলিতেছে সেই স্পর্শ পুষ্পময়। "সেই স্পর্শে যুথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি—সব ফুলের ঘ্রাণ

পাইলাম। বোধ হইল, আমার আশে-পাশে ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার পায়ে ফুল—আমার পরনে ফুল, আমার বুকের ভিতর ফুলের রাশি।" রজনীর প্রধান ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়; সুতরাং তাহার অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির উপলব্ধি করিবার শক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ। তাহার জগৎ সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ; কিন্তু ইহা প্রবল অনুভূতির রসে ভরপুর। অনুভূতির এই নিবিড়তা, চিত্তের এই অপূর্ব্ব তন্ময়তা শুধু অন্ধেই সম্ভবে; কারণ তাহার মন তো কিছুতেই বিক্ষিপ্ত বিচলিত হয় না, তাহার একটি ইন্দ্রিয় অপর ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া অনুভূতির আকুলতা ও তীব্রতা বাড়াইয়া দেয়। প্রণয়ের আবেগ যে কত দুর্দ্দমনীয়, তাহা যে কেমন করিয়া সকল অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে ইহার দৃষ্টান্ত রজনীর মধ্যে যেরূপ পাওয়া যায় এইরূপ চক্ষুষ্মান মনুষ্যে সম্ভব কিনা সন্দেহ।

আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জগৎকে চিনি এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই পরস্পরের সঙ্গে আদানপ্রদান করিয়া থাকি। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের জ্ঞান ও কর্ম্মের পরিধি সীমাবদ্ধ হয়। আমাদের চক্ষু যদি অন্য প্রকারের হইত তাহা হইলে জগতের রূপ বদলাইয়া যাইত। আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কেও সেই কথা খাটে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে আমাদের অন্তরের অনুভূতি ও বাহিরের জগৎ—উভয়ই ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্, কেহই ইন্দ্রিয়ের অধীন নহে। ইহাদের সম্পর্কে প্রকৃত তত্ত্ব জানা প্রায় অসম্ভব, কারণ ইন্দ্রিয়ের পথই একমাত্র পথ বলিয়া মনে হয়। মরমী কবিগণ অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের খাঁটিরূপ উপলব্ধি করিতে চাহেন। এই জন্য তাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তাকে

সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। যখন তাঁহারা ইন্দ্রিয়কে স্বীকার করেন তখন ও নানা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পার্থক্যকে মানেন না। কোন কোন মরমী চক্ষুর সাহায্যে শোনেন এবং কর্ণের সাহায্যে দেখেন। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধিও অনন্যসাধারণ। ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করেন বলিয়াই তাঁহারা অনুভূতির অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে পারেন, যেখানে গতানুগতিকতার মলিনতা নাই, যেখানে ইন্দ্রিয়ের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা হৃদয়ের আবেগকে ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারে নাই। রজনী মরমী কবি নহে। কিন্তু সে চোখে দেখিতে পারে না, তাই তাহার উপলব্ধির তীব্রতা ও নবীনতা মরমী কবির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যে জগৎ আমরা প্রতি দিন দেখি এবং যাহা আমাদের কাছে অতি পুরাতন তাহাই রজনীর কাছে অপূর্ব্ব ও রহস্যময়। তাই শচীন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার চেতনায় যে আলোড়ন জাগিয়াছে তাহাকে সে দৃষ্টির সাহায্যে রূপ দিতে চাহে, যাহাকে শব্দ ও স্পর্শের সাহায্যে পাইয়াছে তাহাকে মূর্ত্তিতে দেখিতে চাহে। এই রূপ দৃষ্টি গ্রাহ্য নয় বলিয়া এই প্রেম এত আবেগময়, এত সজীব, এত সর্ব্বব্যাপী। এই জন্য তাহার দৃষ্টিশক্তির আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র। শচীন্দ্রসম্ভাষণের পর রজনী বলিতেছে: "বহুমূর্ত্তিময়ী বসুন্ধরে! তুমি দেখিতে কেমন…… …………যাহার করস্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন?… ………এক মুহূর্ত্তের জন্য এই সুখময় স্পর্শ দেখিতে কেমন?……… ……………না, না।……হৃদয়মধ্যে খুঁজিলাম, শুধু শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ। আর কিছু পাইলাম না।…………এক মুহূর্ত্ত জন্য এক পলক জন্য আমার কি চক্ষু ফুটিবে না? এক মুহূর্ত্ত জন্য চক্ষু মেলিতে পারিলে

দেখিয়া লই, এই শব্দস্পর্শময় বিশ্বসংসার কি—আমি কি—শচীন্দ্র কি ?” দৃষ্টি নাই বলিয়াই রজনীর অনুভূতির স্বরূপ এই ভাবে অভিব্যক্তি পাইল। দৃষ্টি থাকিলে অনুভূতির এই সর্ব্বময়তা, এই তীব্রতা লঘু হইয়া যাইত। তাহার শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা অতিশয় তীক্ষ্ণ এবং এই সকল বিভিন্ন অনুভূতি তাহার মনে অতি নিবিড় ঐক্য লাভ করিয়াছে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তির জগৎ বৈচিত্র্যময়, অন্ধের কাছে সকল বৈচিত্র্য মিশিয়া যাইয়া অপরূপ ঐক্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই জন্য শচীন্দ্রের কোমল স্পর্শ তাহাকে ফুলের গন্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে, সুমধুর ধ্বনি শ্রবণের আনন্দ দান করিয়াছে। রজনী নিজেও এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন। শচীন্দ্রনাথের প্রথম স্পর্শে সে যে আনন্দ পাইয়াছিল তাহার বর্ণনা দিতে যাইয়া সে বলিতেছে “আ মরি মরি—সে নবনীত সুকুমার পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ! বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ, যার চোখ আছে সে বুঝিবে কি প্রকারে ? আমার সুখদুঃখ আমাতে থাকুক্..............।”

বঙ্কিমচন্দ্র রজনীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য তাহা অন্ধ-যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্ম্মাণ করা গিয়াছে। অন্ধ যুবতীর হৃদয়ে অনুভূতি যে কিরূপ তীব্র শিহরণ জাগাইতে পারে এবং সেই শিহরণ কিরূপে সকল ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করে তাহার আলোচনা করা গিয়াছে। এখন নৈতিক তত্ত্বের বিচার করিতে হইবে। রজনী অন্ধ, দরিদ্র ; তবু তাহাকে লইয়া সামাজিক কোন প্রশ্ন উঠে নাই। বিশেষতঃ ক্রমে

দেখা গেল যে সে সদ্বংশজাত ও বিষয়ের উত্তরাধিকারিনী। শচীন্দ্রনাথ ও তাহার মধ্যে যে প্রেম সঞ্চারিত হইল, তাহা সম্পূর্ণরূপে সমাজ-অনুমোদিত। অন্ধ-যুবতীর সাহায্যে যে সকল নৈতিক তত্ত্ব প্রতি-পালন করা হইয়াছে তাহা সমাজনৈতিক নহে; তাহাদেরও ভিত্তি রহিয়াছে মনস্তত্ত্বের মধ্যেই। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইতে চাহেন যে সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তিতে মানুষ জানিতে পারে কে তাহার প্রতি গোপনে আসক্ত হইয়াছে, একের হৃদয়ের গোপন কথা অপরের কাছে উদ্ঘাটিত হয়। সন্ন্যাসীর যোগবল এমন বিস্ময়কর যে তাহার দ্বারা হৃদয়ের অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে; যাহার প্রতি কোন অনুরাগ ছিল না তাহার প্রতিও প্রবল আসক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে। সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তির সাহায্যে শচীন্দ্রনাথ জানিতে পারিয়াছে যে রজনী তাহার প্রতি আসক্ত এবং তাঁহার ততোধিক অলৌকিক শক্তিতে শচীন্দ্রনাথ রজনীতে আসক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের এই অংশ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। সন্ন্যাসী যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা একেবারে অনৈসর্গিক। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এই কাহিনী বলেন নাই। যাহারা বলিয়াছে তাহাদের মনের গতি অব্যাহত হইতে পারে নাই, কারণ সন্ন্যাসী আসিয়া গল্পটি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে নৈতিক ও মানসিক তত্ত্ব প্রতিপাদনে কোন সাহায্য হয় নাই; বরং বাধাই আসিয়াছে।

গল্পের প্রয়োজনে শচীন্দ্রনাথকে হঠাৎ রজনীর প্রতি অনুরক্ত হইতে হইবে এবং তাহার জন্য অতিপ্রকৃতের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে ইহার দায়িত্ব তাঁহার নহে, উপন্যাসের বিভিন্ন

বক্তাদের। কিন্তু যে সকল অনৈসর্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে তাহাদিগকে সত্য ও জীবন্ত হইতে-হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন "কাব্যে অতিপ্রকৃতের সংস্থানের.........নিয়ম এই যে, যাহা প্রকৃত, তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।" (বিবিধ প্রবন্ধ—প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত) অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "যেখানে ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য মানসব্যাপারের বিবরণ, জড়ের গুণ-ব্যাখ্যা নহে, তখন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাখ্যা থাকিলে মানসব্যাপারের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট হয় না......।" (ধর্ম্ম-তত্ত্ব—উনবিংশ অধ্যায়) এই দিক্ হইতে বিচার করিলে রজনীর দৃষ্টিশক্তিপ্রাপ্তিকে আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারি। তাহার মধ্যে লৌকিক চিকিৎসানৈপুণ্যই থাক্ অথবা অলৌকিক কোন ক্ষমতাই থাক্, 'মানসব্যাপ্যারের' সঙ্গে তাহার সম্পর্ক নাই। কিন্তু প্রণয় মানসিকবৃত্তি; তাহার বর্ণনায় অনৈসর্গিকের অবতারণা করিলে সেই অনৈসর্গিক বিষয়কে সাধারণ নিয়মের বশীভূত হইতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এই রীতি সমর্থন করিয়াছেন এবং শচীন্দ্রের হৃদয়ে রজনীর প্রতি আসক্তির একটু ক্ষীণ আভাস দিয়াছেন। শচীন্দ্রনাথ বলিতেছে, "তবে আমি গোপালের সঙ্গে ইহার [রজনীর] বিবাহ দিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? ঠিক জানি না। তবে ছোট মার দৌরাত্ম্য বড়, তাহারই উত্তেজনাতে ইহার বিবাহ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আর বলিতে কি, যাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে না পারি, তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে।" * কিন্তু এই অস্পষ্ট ইঙ্গিতের ভিত্তির উপর যে সকল

* বঙ্গদর্শন পত্রিকায় রজনী প্রথম প্রকাশিত হয়। সেইখানে এই আভাস আরও

অলৌকিক প্রক্রিয়া ও মানসিক বিকার চাপান হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস্য ও অগ্রাহ্য। আরও একটি ত্রুটি এইখানে লক্ষ্য করিতে হইবে। অতিপ্রাকৃতের অবতারণা করিতে হইলে তাহার সঙ্গে চরিত্রের যোগ রক্ষা করা উচিত। ম্যাক্‌বেথ্‌ নাটকে দেখিতে পাই যে ডাইনীরা ম্যাক্‌বেথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে প্রণোদিত করে, কিন্তু লেডি ম্যাক্‌বেথের :কাছে তাহারা কখনও আসে নাই। এই উপন্যাসে ললিতলবঙ্গলতা যে প্রখর বুদ্ধিশালিনী হইয়াও সন্ন্যাসীর সাহায্যে শচীন্দ্রনাথের মনকে বশ করিতে চাহিয়াছে তাহা স্বাভাবিক। কারণ পূর্ব্ব হইতেই সন্ন্যাসীর প্রতি তাহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং হিন্দুর মেয়ের নিকট এইরূপ শ্রদ্ধা আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি। কিন্তু শচীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসে বিশ্বাস করিত না। তাহার অনাস্থাকে পরাস্ত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নৈতিক তত্ত্বকে সমধিক স্পষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু যে 'হৃচ্চরিত্র' উপন্যাসের প্রধান বিষয় তাহার বর্ণনা খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। অনৈসর্গিকের অবতারণায় শচীন্দ্রনাথের চরিত্র বিকশিত হইতে পারে নাই। সন্ন্যাসীর প্রক্রিয়া তাহার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশকে আলোকিত করিতে পারে নাই; তাহাকে বাহির হইতে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে মাত্র।

উপন্যাসের প্রধান ঘটনা শচীন্দ্র-রজনীর বিবাহ। কিন্তু ইহা ছাড়া

স্পষ্ট। শচীন্দ্র বলিতেছে, "অন্ধ ফুলওয়ালীর এরূপ বর [অমরনাথ] আমরা কেহ কখন স্বপ্নেও ভরসা করি নাই। যদি ঘটে তবে রজনীর বড় সৌভাগ্য বটে।......কিন্তু গুটি দুই তিন কথা মনে পড়িল। প্রথমতঃ গোপালকে কথা দেওয়া হইয়াছে।......দ্বিতীয়তঃ এ ব্যক্তি অপরিচিত; তৃতীয়তঃ—দূর হৌক্‌, তৃতীয়টি ছাড়িয়া দাও। (বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৮১—পৃঃ ৪২৭)

আরও একটি ব্যাপার অল্প কথায় বর্ণিত হইয়াছে তাহা অপ্রধান হইলেও রচনা-কৌশলের জন্য আমাদের চিত্ত বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। ললিত-লবঙ্গলতা বৃদ্ধ রামসদয় মিত্রের তরুণী ভার্য্যা। রামসদয় মিত্র উপন্যাসের কোন খণ্ডের বক্তা নহেন; বর্ণিত ঘটনার মধ্যে তাঁহার অংশ নগণ্য। লবঙ্গলতা তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত এবং তাঁহার গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। মানুষের হৃদয়ের গতি বিচিত্র। লবঙ্গলতা বিবাহের পূর্ব্বে অমরনাথকে দেখিয়াছিল; অমরনাথের সঙ্গে তাহার বিবাহের কথাও হইয়াছিল; হয়ত অজ্ঞাতসারে কিশোরীর হৃদয়ে অমরনাথের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু অমরনাথের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল না। এখন তরুণীর প্রথম প্রেম জাগিয়া উঠিল। সুপ্ত প্রেমের এই অতর্কিত জাগরণের চিত্র অতি অপরূপ নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে; কোথাও আতিশয্য নাই, অনাবশ্যক ঝাঁজ নাই; যে প্রেমকে লবঙ্গলতা কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই তাহা তাহার সমস্ত হৃদয় বিমথিত করিয়া অনিবার্য্য বেগে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রেম কেমন করিয়া সঞ্জীবিত হইল ও আত্মপ্রকাশ করিল তাহা প্রণিধান করিয়া দেখিলে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা কৌশলের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে অমরনাথ তাহার পূর্ব্ব জীবনের কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিতেছে, "প্রণয়? স্নেহ? ভালবাসা? আমি জানি, ইহার অভাবই সুখ—ভালবাসাই দুঃখ। সাক্ষী লবঙ্গলতা।" অমরনাথের কথা খুব স্পষ্ট নহে। ভালবাসা যে দুঃখ ইহার সাক্ষী লবঙ্গলতা কেমন করিয়া হইল? লবঙ্গলতাকে ভালবাসিয়া সে নিজে দুঃখিত হইয়াছে—ইহাই কি তাহার বক্তব্য? কিন্তু তাহার কথার

সহজ অর্থ এইরূপ হয় না। তাহার মনে নিশ্চয়ই এইরূপ ধারণা জাগরিত হইয়া থাকিবে যে লবঙ্গলতা তাহাকে ভালবাসিত এবং লবঙ্গলতা সুখী নহে। ইহার একটু পরেই অমরনাথ বলিতেছে, "আমার এক বাঞ্ছনীয় পদার্থ ছিল—আজিও আছে। কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে।" এই বাঞ্ছনীয় পদার্থ যে কি তাহা বিস্তারিত করিয়া নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক। লবঙ্গলতা আখ্যায়িকার সূত্র গ্রহণ করিয়া প্রথমেই অমরনাথের কথা উত্থাপন করিল। অমরনাথ প্রথমতঃ তাহার মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জিদ্ জাগাইয়া তুলিয়াছে। সে বলিতেছে: "অমরনাথের এ বড় স্পর্দ্ধা! আমি একবার অমরনাথকে কিছু শিক্ষা দিয়াছি—আর একবার না হয় কিছু শিক্ষা দিব। আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে অমরনাথের নিকট হইতে এই রজনীকে কাড়িয়া লইয়া আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিব।" ইহার পরে সে অমরনাথকে জব্দ করিয়াছে এই বলিয়া: "তুমি কস্মিনকালে স্ত্রীলোক চিনলে না.................চোরেরা বুঝিতে পারে না যে পরের দ্রব্য অস্পৃশ্য........।" এই সকল উক্তির মধ্যে প্রচ্ছাদিত প্রেমবহ্নির সুস্পষ্ট পরিচয় নাই। তবু মনে হয় লবঙ্গলতা বাহিরে যত জেদ্, যত রণকুশলতা দেখাক না কেন হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে জিনিষটি রহিয়াছে তাহা ঘৃণা, ক্রোধ বা অবহেলা নহে।

অমরনাথ ও রজনীর সঙ্গে কথা বলিয়া লবঙ্গলতা একেবারে চমকিত হইয়া গেল। লবঙ্গলতা মনে করিয়াছিল যে বিষয়ের জন্যই অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল,* কিন্তু এখন দেখিল যে

* লবঙ্গলতার পক্ষে এই ভুল স্বাভাবিক।

অমরনাথ বিষয়ের প্রতি উদাসীন। ইহার পর রজনী চোখের জলের মধ্য দিয়া তাহার হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিয়া দিল। শুনিয়া লবঙ্গলতা মনে মনে বলিল, "কাণি! তুই ভালবাসার কি জানিস! তুমি লবঙ্গলতার অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী।" লবঙ্গলতার শক্তির অবধি নাই। তাহার দুর্ব্বলতা এই প্রথম ধরা পড়িল। ইহার পরে সে শক্তি সঞ্চয় করিয়া আর একবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং অমরনাথের বিরুদ্ধে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল যে অস্ত্র তাহাই প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইল; সে অমরনাথকে ভয় দেখাইল যে পূর্ব্বকাহিনী সে রজনীর কাছে বিবৃত করিবে। অমরনাথ তাহাতেও পশ্চাতপদ হইল না; বরং নিজেই তাহা রজনীকে বলিবে এই সঙ্কল্প জানাইল। ইহাতে লবঙ্গলতাব এতদিনের চেষ্টা বিফল হইল, পরাজয়ে সে বিষণ্ণ হইল; কিন্তু তাহার বিষাদের সঙ্গে হর্ষও হইল, কারণ অমরনাথের চরিত্র গৌরবে তাহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। যে প্রণয়ী গোপনে তাহার হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়াছিল সে সত্য সত্যই তাহার অর্হণার উপযুক্ত হইয়াছে। সে হাসিতে হাসিতে "মনে মনে অমরনাথকে শত শত ধন্যবাদ দিতে দিতে" বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

লবঙ্গলতার সঙ্গে অমরনাথের যে শেষ সাক্ষাৎ হইল তাহাতে সেই বিচিত্রচরিত্রা, পরম বুদ্ধিমতী রমণীর সংযমের ভিত্তি নড়িয়া উঠিল। তাহার যে গোপন প্রণয় দৈনন্দিন জীবনের ধূলিতে স্বীয় নবীনতা হারায় নাই সেই প্রণয় জাগিয়া উঠিল। এই চির-নবীন, চিরস্থকুমার প্রেম সম্পর্কে এতদিন সে অর্দ্ধ অচেতন ছিল, কিন্তু আজ তাহার অস্তিত্ব সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ সচেতন। তাহার পার্থিব

জীবনে এই প্রেমের কোন স্থান নাই; ইহার মহিমা অপার্থিব, ইহলোকে এই প্রেম শুধু কলঙ্কই আনিবে। ইহকালে সে বিষপান করিয়া নীলকণ্ঠের মত প্রশান্ত স্থৈর্য্য লাভ করিল, তাহার একমাত্র ভরসা যে যদি লোকান্তর থাকে—কিন্তু এই ভরসাকে সে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইল। ধর্ম্মবুদ্ধি ও সুপ্তোত্থিত প্রেমের সংঘর্ষে তাহার হৃদয় আলোড়িত হইয়াছে; অমরনাথ এই সংঘর্ষের সমস্ত সত্য টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিলে এই প্রখর বুদ্ধিশালিনী, তেজস্বিনী রমণী ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং অতি করুণ কণ্ঠে নিবেদন করিয়াছে, "আমি স্ত্রীলোক সহজে দুর্ব্বলা। আমার কত বল, দেখিয়া তোমার কি হইবে?" রজনী হরণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সে সাহঙ্কারে স্মরণ করিয়াছে যে একবার সে অমর নাথকে কিছু শিক্ষা দিয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়া সে দীনকণ্ঠে বলিয়াছে, "তুমি কুকাজ করিয়াছিলে, আমিও বালিকা বুদ্ধিতেই কুকাজ করিয়াছিলাম। যাহার যে দণ্ড, বিধাতা তাহার বিচার করিবেন, আমি বিচারের কে? এখন সে অনুতাপ—কিন্তু সে সকল কথা না বলাই ভাল। তুমি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবে।"

লবঙ্গলতা বঙ্কিম সাহিত্যে অনন্যা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বঙ্কিমের প্রতিভায় দুইটি বৃত্তির সংযোগ হইয়াছে। নীতিবিদ্ বঙ্কিমচন্দ্র চিত্তসংযমের ব্যাখ্যা করিয়াছেন আর সৌন্দর্য্যস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র মানবহৃদয়ের সুকুমার প্রবৃত্তির মাধুর্য্য আহরণ করিয়াছেন। কোথাও প্রতিভার এই দুই দিক্ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে; কোথাও একটি

অপরের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। যেখানে সৌন্দর্যসৃষ্টি নীতিশিক্ষার ভারে চাপা পড়ে নাই সেইখানে কাব্য উৎকর্ষ লাভ লাভ করিয়াছে। অমরনাথ ও লবঙ্গলতার প্রেমের আখ্যায়িকা ইহার নিদর্শন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'রজনী'র যে প্রথম খসড়া বাহির হইয়াছিল তাহার সঙ্গে পরিবর্তিত, পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'রজনী'র তুলনা করিলে সৌন্দর্যসৃষ্টি কেমন করিয়া সামাজিক নীতির বন্ধন ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়। মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত 'রজনী'তে দেখি অমরনাথ লবঙ্গলতা হরণের প্রতিশোধ লইবার জন্যই রজনীকে উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে।* কিন্তু গ্রন্থের অমরনাথ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে শান্ত করিয়াছে; সে শুধু অসহায় দরিদ্র বালিকার প্রতি সুবিচার করিবার জন্যই উদ্‌গ্রীব। প্রথম খসড়ায় দেখি অমরনাথ রজনীর সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছে এবং রজনীর প্রতি কোন জোর না করিলেও রজনীকে পত্নী বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থে দেখি অমরনাথ আকৃষ্ট হইয়াছে রজনীর চরিত্রের মাধুর্য্যে; বিষয়কে সে তুচ্ছ করিয়াছে। রজনী শচীন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত: কিন্তু অমরনাথ সম্পর্কে সে লবঙ্গলতাকে বলিয়াছে, "আপনি উঁহাকে সবিশেষ চিনেন না; আমি দিলেও উনি লইবেন না।" 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'রজনী'র শেষ অধ্যায়ে লবঙ্গলতা অমরনাথের বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাকে বলিয়াছে, "শুনিয়াছি।

* "ইহার অল্প দিন পরেই আমি কাশী পরিত্যাগ করিলাম। লবঙ্গলতা অপহরণের প্রতিশোধ লইব।" (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮২ পৃঃ ১৭) এবম্বিধ উক্তি পরবর্ত্তী সংস্করণে নাই।

তুমি অদ্বিতীয় পাষণ্ড।" (বঙ্গদর্শন অগ্রহায়ণ ১২৮২ পৃঃ ৩৬৪) গ্রন্থে এই কথাটিই বঙ্কিমচন্দ্র পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন এই ভাবে: "শুনিয়াছি, তুমি অদ্বিতীয়। আমাকে ক্ষমা করিও, আমি তোমার গুণ জানিতাম না।" প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র অমরনাথকে এমন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে লবঙ্গলতা তাহার প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু সৃষ্ট চরিত্র স্রষ্টার বাঁধন ছাড়াইয়া গিয়াছে। প্রথম খসড়ায় লবঙ্গলতা অমরনাথকে বলিতেছে: ' "[অমরনাথ চলিয়া গেলে]—যথার্থই সুখী হই। কেননা, তোমাকে যেমন করিতে চাহি, তুমি সেরূপ হইলে না।"·········লবঙ্গ কয়েকটা কথায় এক ঋষির চিত্র আঁকিল—জিতেন্দ্রিয়, অস্বার্থপর, পরোপকারী, বৈরাগী।·········।' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'রজনী'তে অমরনাথ সত্য সত্যই জিতেন্দ্রিয়, অস্বার্থপর, পরোপকারী, নির্লিপ্ত এবং লবঙ্গলতা তাহার সঙ্গে "যুদ্ধে প্রবৃত্ত" হইয়া তাহাকে পরাস্ত করিতে যাইয়া নিজে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হইল এবং ঈষৎ কাঁদিয়া বিদায় লইল। লবঙ্গলতার শক্তি অনন্যসাধারণ; তাই চরম আত্মসমর্পণের মুহূর্তেও সে আত্মসংযম করিতে পারিল। অমরনাথ যখন ফিরিয়া আসিয়া শচীন্দ্র ও রজনীর সঙ্গে দেখা করিল তখন লবঙ্গলতা সেইখানে নাই, তাহার কথা কেহ বলিল না; তাহার কত বল তাহার দ্বিতীয় পরীক্ষা হইল না। বোধ হয় অমরনাথের সঙ্গে সাক্ষাতে নিজ হৃদয়ের যে পরিচয় সে পাইয়াছিল তাহাই তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ হইয়া রহিল।

সুপ্ত প্রণয় একবার জাগিয়া উঠিলে তাহা ধর্ম্মবুদ্ধিকে কিরূপ আলোড়িত করে তাহার বিস্তৃত চিত্র শরৎচন্দ্র তাঁহার বহু উপন্যাসে

আঁকিয়াছেন। শরৎ সাহিত্যে এই সংঘর্ষ খুব তীব্র এবং এই প্রেম নানা অনুভূতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়া বিচিত্র ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। লবঙ্গলতা যেখানে থামিয়া গিয়াছে রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, অচলা সেইখানে থামে নাই। তাহার কারণ যে নীতি প্রেমকে বাদ দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে শরৎচন্দ্র তাহাকে শিরোধার্য করিতে পারেন নাই। কিন্তু লবঙ্গলতার করুণ ভিক্ষা, পরকালের উপরে তাহার আস্থা রাজলক্ষ্মীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। লবঙ্গলতার কাহিনী 'রজনী'র অপ্রধান আখ্যায়িকা। তবু বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণ অতিশয় সুন্দর ও সূক্ষ্ম এবং নীতির বাঁধন অপেক্ষাকৃত দৃঢ় বলিয়াই নীতিবিদ্রোহী প্রেমের অপরাজেয় প্রাবল্য বিশেষ করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অনেকের মনে এই ধারণা আছে যে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের যে রাজপথ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন শরৎচন্দ্র তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথের সন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু লবঙ্গলতার চরিত্রের যে বিশ্লেষণ বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছেন তাহা হইতে প্রতীতি হয় যে এই নূতন পথের সন্ধান তাঁহার জানা ছিল। ইহা যথেষ্ট প্রশস্ত নয় বলিয়া তিনি সাধারণতঃ ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

'রজনী'র উপাখ্যান বলিবার রীতি সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাহিনী বলেন নাই; উপন্যাসের প্রধান পাত্রপাত্রীরা তাহাদের নিজেদের কথা বলিয়াছে। ইহার দুইটি কারণ তিনি দেখাইয়াছেন: (১) যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায় (২) যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রকৃত ব্যাপার আছে তাঁহাকে তাহার জন্য দায়ী হইতে হয় নাই।

দ্বিতীয় কারণের উপযোগিতা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। শচীন্দ্রনাথ যে অংশ বর্ণনা করিয়াছে তাহা উপন্যাসের সর্ব্বনিকৃষ্ট অংশ। অন্যান্য অংশ ইহা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। এই প্রথার প্রধান উপযোগিতা বঙ্কিমচন্দ্র অতি সহজ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই উপন্যাসবর্ণিত চরিত্রেরা কখন কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং একে অপরের আখ্যায়িকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিল কিনা। ঘটনাগুলি যখন যেমন ঘটিতেছে যদি তাহারা তখনই সেইভাবে লিপিবদ্ধ করিতে থাকে তাহা হইলে পুনরুক্তির সম্ভাবনা থাকে এবং কাহিনীও অসংবদ্ধ হইয়া পড়ে। যদি তাহারা উপাখ্যান শেষ হইয়া গেলে পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করিয়া বর্ণনা আরম্ভ করে তাহা হইলে উপন্যাসের সজীবতা চলিয়া যায়, ইতিহাস ও উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য লুপ্ত হইয়া যায়।

'রজনী'তে দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। রজনী বলিতেছে, "এ যন্ত্রণাময় জীবনচরিত আর বলিতে সাধ করে না। আর একজন বলিবে।" শচীন্দ্রনাথ তাহার বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছে এই ভাবে, "এ ভার আমার প্রতি হইয়াছে—রজনীর জীবনচরিত্রের এ অংশ আমাকে লিখিতে হইবে।" অমরনাথ বলিয়াছে, "এই ইতিহাসে ভবানীনগর

---

* রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে'তে এই অসুবিধা এড়াইতে চাহিয়াছেন। সন্দীপ ও নিখিলেশ ঘটনাচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের ডায়েরী লিখিতেছে। কিন্তু বিমলার কথায় মনে হয় সমস্ত ঘটনা ঘটিবার পর সে লিখিতে বসিয়াছে। এই দুই রকম ভঙ্গীর মধ্যে কোন সামঞ্জস্য হইতে পারে না এবং এই অসামঞ্জস্যই 'ঘরে বাইরে'র প্রধান ত্রুটি।

নামে অন্যগ্রামের নাম উত্থাপিত হইবে।" এইরূপে নানা উক্তি ও ইঙ্গিত হইতে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে উপন্যাস লিখিত হইয়াছে উপন্যাসবর্ণিত ঘটনা ঘটিবার পর এবং প্রত্যেক বক্তাই অপরের কথা মোটামুটি ভাবে জানে। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে উপন্যাসের এই রীতিকে সার্থক বলা যায় না, কারণ ইহাতে সমস্ত বর্ণনা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। এই মৌলিক অস্বাভাবিকতা ছাড়িয়া দিলে কাহিনীর বর্ণনায় সরসতার অভাব হয় নাই। প্রথমখণ্ডের বক্তা রজনী। অন্ধের অনুভূতির সঙ্গে আমাদের অনুভূতির সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তাহার উপলব্ধি স্বতন্ত্র। এই উপলব্ধির বৈচিত্র্য তাহার বিশিষ্ট ভাষায়, তাহার শব্দস্পর্শময় কল্পনার সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সর্বত্র উপলব্ধির স্বাতন্ত্র্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। রজনী, লবঙ্গলতা, অমরনাথ ও শচীন্দ্র—ইহাদের ভাষা ও বলিবার ভঙ্গী অনেকটা এক রকমের; কিন্তু ইহাদের বুঝিবার রীতির মধ্যে পার্থক্যের অবধি নাই। রজনীর কথা ছাড়িয়া দিলেও অমরনাথ ও লবঙ্গলতার মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। লবঙ্গলতা তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, কিন্তু তাহার হিন্দুরমণীসুলভ সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস আছে। সন্ন্যাসীতে তাহার অগাধ ভক্তি; কামারবৌয়ের পিতলের টুক্‌রাকে তিনি সোনা করিয়া দিতে পারেন। মানুষের বুদ্ধি ও বিশ্বাসের মধ্যে অনেক সময় কোন সংযোগ থাকে না। যে বীর যোদ্ধা শত্রুর কামানকে ভয় করে না সে ডাক্তারের ছুরি দেখিলে শিহরিয়া উঠে। তারপর বিশ্বাস নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরে। লবঙ্গলতার বুদ্ধি প্রখর, কিন্তু তাহার বিশ্বাস ও সংস্কার সাধারণ বাঙ্গালী

মেয়ের বিশ্বাস ও সংস্কার হইতে বিভিন্ন নহে। তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ক্ষেত্রও খুব সঙ্কীর্ণ। তাই অবস্থার অতর্কিত পরিবর্তনে সে হতবুদ্ধি হইয়া যায়। শচীন্দ্রনাথের অসুস্থতা, রজনীর বিষয়ে বৈরাগ্য ও শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবাহে অসম্মতি, অমরনাথের উদারতা—এই সকল অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে তাহার আত্মবিশ্বাস টলিয়াছে, কি করিতে হইবে সে স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই, কারণ তাহার বুদ্ধি প্রখর হইলেও সুদূরগামী নহে। এই বিষয়ে অমরনাথের সঙ্গে তাহার বিশেষ প্রভেদ। অমরনাথ পণ্ডিত, দার্শনিক এবং সংসারাভিজ্ঞ; সকল ব্যাপারই সে বিচ্ছিন্ন, নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে দেখিতে পারে। রজনীকে সে ভালবাসিয়াছে, কিন্তু রজনী অপরের প্রতি আসক্ত জানিয়া সে স্বচ্ছন্দে দোকানপাট উঠাইয়াছে। লবঙ্গলতা বিচিত্রচরিত্রা; তাহার মানসিক শক্তির অভাব নাই, কিন্তু তাহার দূরদৃষ্টি নাই। অমরনাথের প্রসারিত দৃষ্টির কাছে সকল রহস্যই ধরা পড়িয়াছে। শচীন্দ্র ও রজনীর কথা অমরনাথ অতি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছে এবং বুঝিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। লবঙ্গলতার হৃদয়ের যে গোপন রহস্য অতি গভীর তলদেশে লুক্কায়িত ছিল অমরনাথ তাহাকে আলোকিত করিয়াছে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়াছে। কিন্তু তাহার বৈরাগ্য ও সংযম অটুট রহিয়াছে; লবঙ্গলতার মনের কথা বুঝিতে পারিলেও সে পরস্ত্রীর দুর্বলতার সুবিধা গ্রহণ করে নাই। লবঙ্গলতা ও অমরনাথের শেষ সাক্ষাতের বর্ণনায় বঙ্কিমের শিল্প-কৌশলের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়। লবঙ্গলতা নিজের কথা নিজে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই; তাহার হৃদয়ের রহস্য অপরের কাছে ধরা পড়িয়াছে। এই বিষয়ে অমরনাথের দৃষ্টি

অসাধারণ প্রখর হইবে, ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র লবঙ্গলতার আত্মসমর্পণকে দেখিয়াছেন অমরনাথের চোখ দিয়া, কারণ যাহা অপরের দৃষ্টি এড়াইবে তাহা অমরনাথকে ফাঁকি দিতে পারিবে না। এই বর্ণনায় উভয়ের মনের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে—লবঙ্গলতা মন্ত্রমুগ্ধের মত আপনার নিভৃততম রহস্য উদ্ঘাটিত করিতেছে আর অমরনাথ সেই রহস্যকে উপলব্ধি করিতেছে, কিন্তু ইহলোকের সম্বন্ধের উপর লবঙ্গলতা যে যবনিকা টানিয়া দিল দার্শনিকোচিত বৈরাগ্যের সহিত সে তাহাই শিরোধার্য করিয়া চলিয়া গেল।

(৩)

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের প্রধান আলোচনার বিষয় রোহিণী। শরৎচন্দ্র একাধিকবার রোহিণীর পরিণতি সম্পর্কে তাঁহার আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন বলিয়া এই আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য খুব বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শরৎচন্দ্রের মত উদ্ধৃত করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন :

"............রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তার পর পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়ীতে বোঝাই হয়ে লাশ চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক্ দিয়ে পাপের পরিণামের বাকি কিছু আর রইল না।.........

অনেকবারই আমার মনে হয়েছে, রোহিণীর চরিত্র আরম্ভ করবার সময় এ কল্পনা তাঁর ছিল না, থাকলে এমন করে তাকে গড়তে

পারতেন না। কেবল প্রেমের জন্যই নিঃশব্দে, সংগোপনে বারুণীর জলতলে আপনাকে আপনি বিসর্জ্জন দিতে পাপিষ্ঠাকে কবি এমন করে নিয়োজিত করতেন না।

গোবিন্দলালকে রোহিণী অকৃত্রিম এবং অকপটেই ভালবেসেছিল—সমস্ত হৃদয় প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল, এবং এ প্রেমের প্রতিদান যে সে পায় নি তা'ও নয়। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সুনীতির আদর্শে এ প্রেমের সে অধিকারী নয়, এ ভালবাসা তার প্রাপ্য নয়। সে পাপিষ্ঠা, তাই পাপিষ্ঠাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট নীতির আইনে বিশ্বাসঘাতিনী হওয়া চাই এবং হ'ল ও সে। তার পরের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মিনিট পাঁচেকের দেখায় নিশাকরের প্রতি আসক্তি এবং পিস্তলের গুলিতে মৃত্যু। মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করি নে, কিন্তু করি তার অকারণ, অহেতুক জবরদস্তি অপমৃত্যুতে..............................

...."*

"তাহার গোবিন্দলালকে ভালবাসিবার যে শক্তি তাহা সাধারণ নারীতে অসম্ভব,—উইল বদলাইতে সে কৃষ্ণকান্তের মত বাঘের ঘরে ঢুকিয়াছিল—গোবিন্দলালের ভাল করিতে, 'বারুণী'র জলতলে প্রাণ দিতে গিয়াছিল সে এমনি প্রিয়তমের জন্য, আবার সেই রোহিণীই যখন কেবলমাত্র নীতিমূলক উপন্যাসের উপরোধেই অকারণে এবং মুহূর্ত্তের দৃষ্টিপাতে সমস্ত ভুলিয়া আর একজন অপরিচিত পুরুষকে গোবিন্দলালের অপেক্ষাও বহুগুণে সুন্দর দেখিয়া প্রাণ দিল, তখন পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় সপ্রমাণ করিয়া সাংসারিক লোকের সুশিক্ষার পথে

* স্বদেশ ও সাহিত্য—পৃঃ ৭৯

হয়ত প্রভূত সাহায্য করা হইল, কিন্তু আধুনিক লেখক তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিল না।"*

শরৎচন্দ্রের মত পরবর্তী পাঠক ও সমালোচকদিগকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। সুতরাং তাহার বিস্তৃত বিচারের প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র বিধবার প্রেমের বিরোধী ছিলেন এই মত প্রচারিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার রচনা এই বিষয়ে কোন সাক্ষ্যই দেয় না। কুন্দনন্দিনী ও রোহিণী বিধবা এবং তাহাদের প্রেম বিষবৃক্ষের ও সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু ইহার কারণ নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল উভয়েই বিবাহিত ছিলেন এবং সাধ্বী স্ত্রীর সঙ্গে সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন। যাঁহারা রোহিণীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রেমের মহিমা কীর্তন করেন তাঁহারা ভ্রমরের কথা ভুলিয়া যান। রোহিণী বিধবা না হইয়া কুমারী হইলে গোবিন্দলালের জীবন কম বিষময় হইত না। শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মীর প্রেমের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। রাজলক্ষ্মী তখনই সর্বাপেক্ষা সশঙ্ক হইয়াছে যখন সে শ্রীকান্তের বিবাহের সম্ভাবনা দেখিয়াছে। রোহিণীর ও কুন্দনন্দিনীর প্রেম সামাজিক ব্যবস্থার বিরোধী। সামাজিক নীতির প্রশ্ন সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত।

এখন রোহিণীর চরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে হইবে। এই আলোচনায় সর্বপ্রথমে মনে রাখিতে হইবে যে রোহিণী কুন্দনন্দিনী নহে, বিনোদিনী নহে, রাজলক্ষ্মী বা সাবিত্রী নহে। তাহার চরিত্র সৃষ্টিতে আর্টের দাবী মিটিয়াছে কিনা ইহার বিচার করিতে হইলে সামাজিক নীতিকে বাদ দিতে হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু অ-সামাজিক কোন

* স্বদেশ ও সাহিত্য (আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ)—পৃঃ ১০৯

নীতিকে খাড়া করিলেও চলিবে না। শরৎচন্দ্র বলিতেছেন যে রোহিণী গোবিন্দলালকে অকৃত্রিম ও অকপট ভালবাসা দিয়াছিল এবং প্রেমের জন্যই নিঃশব্দে সংগোপনে বারুণীর জলে আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে চাহিয়াছিল এবং তিনি মনে করেন যে রোহিণী চরিত্রের আরম্ভ ও পরিণতিতে অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস কি সাক্ষ্য দেয়?

আলোচনার প্রারম্ভে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। মনুষ্য চরিত্রের মধ্যে ঐক্য ও বৈচিত্র্য উভয়ই সমানভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। কোন পুরুষ বা রমণী যদি সব সময়ই একই পথে চলে, একই সুরের প্রতিধ্বনি করে তাহা হইলে তাহাকে সজীব মানুষ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কিন্তু বিভিন্নতার মধ্যেও একটা ঐক্যসূত্র থাকে; তাহা না হইলে উন্মাদগ্রস্ত রোগী ও সুস্থমনা লোকের পার্থক্য ঘুচিয়া যাইত। ক্লিওপ্যাট্রা এণ্টনীকে ভালবাসিত; এই ভালবাসার মহিমা যুগে যুগে কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং ইহার স্তব গান যাঁহারা করিয়াছেন তন্মধ্যে শেক্সপীয়র অগ্রণী, কিন্তু শেক্সপীয়রই দেখাইয়াছেন যে ক্লিওপ্যাট্রার-প্রেম যত ঐশ্বর্য্যবান্‌ই হউক তাহাকে একনিষ্ঠ বলা যায় না। এণ্টনীর পরাজয়ের পরে সে বোধ হয় সীজারের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিতে চাহিয়াছিল। সে এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিল কিনা তৎসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে তাহার আত্মহত্যা একনিষ্ঠ প্রেমপ্রণোদিত নহে, ইহার মধ্যে অপমানভীতিও ছিল। রোহিণী চরিত্রের আলোচনায় রমণী হৃদয়ের তথা মনুষ্য হৃদয়ের এই বৈচিত্র্যের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' যখন ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতে থাকে তখন বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে অর্থলোলুপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে হাজার টাকার জন্যই উইল চুরি করিতে চাহিয়াছিল। পরে তিনি উপন্যাসের যে পরিবর্ত্তন করিলেন তাহাতে হরলালের সঙ্গে বিবাহের সম্ভাবনা দেখা গেল। সে হরলালের স্ত্রী হইতে চাহিয়াছিল বলিয়াই উইল চুরি করিল। কিন্তু হরলালকে সে চিনিত। হরলালের সঙ্গে তাহার যে কথাবার্ত্তা হইল তাহা হইতে মনে হয় পূর্ব্বে তাহাদের এই বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। সে যাহা হউক হরলালের জন্য এই দুঃসাহসিক নীচ কার্য্য করিলেও হরলালকে সে উইল দিল না। ইহা একাগ্র অকপট, অকৃত্রিম প্রণয়ের চিহ্ন নহে। হরলাল নীচ, ঘৃণিত চরিত্রের লোক। হরলালের জন্য "উইল বদ্‌লাইতে সে কৃষ্ণকান্তের মত বাঘের ঘরে ঢুকিয়াছিল" এবং হরলালকে অবিশ্বাস করিলেও সে তাহাকে স্বামীরূপে বরণ করিতে চাহিয়াছিল। এই ব্যাপার হইতে মনে হয় রোহিণীর ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই বলিলেই চলে এবং সে পুরুষের আসঙ্গলোলুপ। সে বালবিধবা; তাহার ভোগ লিপ্সা জাগ্রত হইতে না হইতেই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই তাহাকে দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত করিয়াছে। হরলাল এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায় মাত্র।

হরলাল কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া রোহিণীর নিদারুণ দুঃখ হইল। সে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু এইখানেও দেখি হরলালের জন্য তাহার কোন টান নাই, নিজের ভোগলিপ্সা যে পরিপূর্ণ হইতেছে না তাহারই জন্য সে খেদ করিতেছে: '"কি অপরাধে এই বালবৈধব্য

আমার অদৃষ্টে ঘটিল ?·········কোন্ দোষে আমাকে রূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল ?” এই সময় কোকিল ডাকিয়া তাহার চিত্ত আরও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিল। বঙ্কিমচন্দ্র এইখানে অর্দ্ধ সকৌতুকে প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের গভীর সহানুভূতির চিত্র আঁকিয়াছেন। প্রকৃতির প্রভাব কপাল-কুণ্ডলার চরিত্রে যেরূপ গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে রোহিণীর চরিত্রে সেইরূপ হয় নাই। তবু মনে হয় রোহিণী যে কাঁদিতে বসিল ইহার মধ্যে দুষ্ট কোকিলের ষড়যন্ত্র আছে। এই অসময়ে গোবিন্দলাল করুণা দেখাইয়া রোহিণীর হৃদয়ের শূন্য সিংহাসন অধিকার করিলেন। এইবার রোহিণীর প্রথম সন্দেহ হইল যে উইল চুরি কাজটা ভাল হয় নাই। অনুরাগ আসিয়া ধর্ম্মবোধকে জাগরিত করিল—রোহিণী নিজেকে বুঝাইল, “দুষ্কর্ম্মের জন্য সেদিন যে সাহস করিয়াছিলাম, আজ সৎকর্ম্মের জন্য তাহা পারিব না কেন ?”

ইহার পরে রোহিণীর প্রণয় সম্ভাষণ ও প্রাণ বিসর্জ্জনের চেষ্টা। গোবিন্দলাল যে সকল কথা বুঝিয়া তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চাহিয়াছে ইহাতে রোহিণী তাহার নিজের আকাঙ্ক্ষার অপ্রত্যাশিত প্রতিদান পাইল। ইহা মানিতেই হইবে যে রোহিণীর মনে এইবার গভীর আবেগ সঞ্চারিত হইল। ইহা একনিষ্ঠ প্রেম কিনা তাহার বিচার না করিয়াও এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে গোবিন্দলালের প্রতি তাহার যে আসক্তি সঞ্চারিত হইল তাহার তীব্রতা অনন্যসাধারণ; মোহিনী এবার নিজে মোহিত হইল। “তাহার সেই স্ফীত, হৃত, অপরিমিত, প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয়” নানা

অনুভূতির সংঘর্ষে পীড়িত হইল। "কখনও ভাবিল, গরল খাই: কখনও ভাবিল গোবিন্দলালের পদপ্রান্তে পড়িয়া, অন্তঃকরণ মুক্ত করিয়া সকল কথা বলি; কখনও ভাবিল পলাইয়া যাই; কখনও ভাবিল বারুণীতে ডুবে মরি। কখনও ভাবিল, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাই।" মনের এই দোদুল্যমান অবস্থায় ভ্রমর আত্মবিসর্জ্জনের পরামর্শ দিল এবং ভ্রমরও বারুণী পুষ্করিণীরই নাম করিল। রোহিণী যে বারুণীতে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল ইহার প্রধান কারণ গোবিন্দলালের জন্য ব্যর্থ প্রণয়। সে এতদিন মুগ্ধ করিতে চাহিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র কৌতুক করিয়া বলিয়াছেন যে বিড়াল ও কোকিল পর্য্যন্ত বোধ হয় তাহার কটাক্ষ হইতে মুক্ত হইতে পারিত না। কিন্তু আজ উদ্বেল প্রেমে রোহিণী দীনা, শীর্ণা, বিহ্বলা। এই কামার্ত্তা রমণীকে শেষ সঙ্কল্পে বিশেষ করিয়া প্রণোদিত করিল—ভ্রমরের সমবেদনাহীন, অবজ্ঞামিশ্রিত কঠোর নির্দ্দেশ। এই নির্দ্দেশ না পাইলে, সে কি করিত নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

রোহিণী ভ্রমরের প্রতি কিরূপ মনোভাব পোষণ করিত তাহার বিচার আবশ্যক। প্রথমে দেখিতে পাই যে সে নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে যাইয়া ভাবিতেছে, "যাহারা এ জীবনে সকল সুখে সুখী—মনে কর, ঐ গোবিন্দলালবাবুর স্ত্রী—তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী·········কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ—আমার কপালে শূন্য? দূর হৌক—পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই; কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন?" এই ভাবনার মধ্যে রহিয়াছে আত্মসুখকামনা ও মাৎসর্য্য। এই দুই

প্রবৃত্তি একত্র হইল তাহার প্রণয় সম্ভাষণের মধ্যে। গোবিন্দলালকে সে চায়—আর যে সৌভাগ্যবতী গোবিন্দলালকে পাইয়াছে সেই তাহাকে আত্মহত্যার পরামর্শ দিল। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন যে রোহিণী "কেবল প্রেমের জন্যই নিঃশব্দে সংগোপনে বারুনীর জলতলে" আপনাকে আপনি বিসর্জ্জন দিতে গিয়াছিল এবং তাঁহার মতে ইহার দ্বারা সে গোবিন্দলালের ভাল করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু যে রোহিণী নিঃশব্দে গোবিন্দলালের ভাল করিতে আত্মবিসর্জ্জন দিতে চাহিয়াছিল সে শরৎ-চন্দ্রের সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রোহিণীকে প্ররোচিত করিয়াছিল—নৈরাশ্য ও পরাজয়ের গ্লানি। ইহার পর রোহিণী শুনিল যে গোবিন্দ-লাল ও তাহাকে জড়াইয়া কুৎসিত অপবাদ হরিদ্রাগ্রামে ছড়াইয়া গিয়াছে। "কথা যে কোথা হইতে রটিল তাহা রোহিণী শুনে নাই—কে রটাইল তাহার কোন তদন্ত করে নাই; একেবারে সিদ্ধান্ত করিল যে, তবে ভ্রমরই রটাইয়াছে, নহিলে এত গায়ের জ্বালা কার?" পূর্ব্বে কলঙ্ক-ভীতি ছিল—এখন তাহাও রহিল না। রোহিণী যে কাণ্ড করিল তাহার মধ্যে আর যাহাই থাক্ নিঃশব্দ একনিষ্ঠ প্রেমের বাষ্পমাত্র নাই। সে স্থির করিল, "এদেশে আর থাকিব না, কিন্তু যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়া যাইব।" এখানে বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে স্ত্রীলোক বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহেন নাই—সে রাক্ষসী বা পিশাচী। প্রথম খণ্ডে রোহিণীকে মাত্র আর একবার দেখিতে পাই। গোবিন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সে বুঝিতে পারিল যে গোবিন্দলাল তাহার রূপে মুগ্ধ।

প্রসাদপুরে যাইবার পূর্ব্বে রোহিণীচরিত্রের যে পরিচয় পাইলাম

তাহা হইতে দেখা যায় যে তাহার দুঃসাহস ও অতৃপ্ত লালসা ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সে বালবিধবা; তাহার ভোগ-লিপ্সা অপরিপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। সমাজের বিধানকে সে অকুণ্ঠিত চিত্তে মানে নাই; তাহার মন বিদ্রোহের বিষে জর্জ্জরিত হইয়াছে। যাহা অপরে দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিত তাহাকে সে অবিচার বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে চাহিয়াছে এবং এই অবিচারকে ব্যঙ্গ করিয়া সে গায়ের জ্বালা জুড়াইতে চাহিয়াছে। গোবিন্দলালের নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত প্রতিদান পাইয়া সে গভীর প্রেমের প্রথম আস্বাদ পাইল। ইহা কি ক্ষণিকের বিভ্রম—না একনিষ্ঠ অপরিবর্ত্তনীয় প্রণয়ের সূচনা? উভয়প্রকারের সম্ভাব্যতাই রোহিণীর চরিত্রে ছিল। রোহিণী নিজে তাহার অনুভূতিকে দারুণ তৃষা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, ইহাকে নিঃশব্দ গোপন প্রেম মনে করা যায় কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ যে ভাবে সে কাপড় ও গিল্‌টি করা সোনার গহনা লইয়া ভ্রমরের উপর চড়াও করিয়াছিল তাহা দুঃসাহসিকা ব্যাপিকায় সম্ভবে, প্রণয়িনীতে নহে। কিন্তু ইহাও মানিতে হইবে যে গোবিন্দলাল তাহার হৃদয়ের গভীরতম তারে আঘাত করিয়াছিলেন। হরলালকে পাওয়ার সম্ভাবনা দূর হইলে রোহিণী কাঁদিতে বসিয়াছিল, গোবিন্দলালকে পাইবে না মনে করিয়া ক্ষোভে, গ্লানিতে, ব্যর্থতায় সে আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল।

প্রসাদপুরে রোহিণী ও গোবিন্দলালের যে চিত্র পাই তাহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত অথচ অতিশয় ইঙ্গিতময়। চিত্রা নদী শীর্ণশরীরা—নিকটে গ্রাম নাই, মনুষ্যসমাগম নাই, জনশূন্য প্রান্তরস্থিত রম্য অট্টালিকায় গোবিন্দলাল ও রোহিণী বাস করিতেছে। গোবিন্দলাল মুগ্ধ হইয়াছিলেন

রোহিণীর রূপ দেখিয়া আর রোহিণী গোবিন্দলালকে চাহিয়াছিল নিদারুণ তৃষায়। সে গোবিন্দলালকে ভালবাসিতেও শিখিতেছিল, কারণ গোবিন্দলাল তাহার মনের কথা বুঝিয়াছিল। যে সহানুভূতি সে অপরের কাছে পায় নাই, তাহা গোবিন্দলাল তাহাকে দিয়াছিল। যৌনসম্পর্কের নিয়ম এই যে পরিতৃপ্তির পূর্ব্বে নর ও নারী পরস্পরের প্রতি গভীর আকর্ষণ বোধ করিবে এবং ক্ষণিক পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ইহা ক্ষণেকের জন্য লুপ্ত হইয়া আসিবে। * এই সম্পর্কের উপরে গভীর প্রণয় সঞ্চারিত করিতে হইলে শুধু "তৃষা" নিবারণ করিলেই চলিবে না, নানা আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া প্রণয়কে বিকশিত হইতে হইবে। গোবিন্দলাল ও রোহিণীর মধ্যে এই বিস্তৃত সমবেদনা, এই আদান-প্রদানের একান্ত অভাব। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, "যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা—তবু ভ্রমর অন্তরে রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথাই এই আখ্যায়িকা লিখিলাম।" সাহিত্যস্রষ্টা সব সময়ে নিজের রচনার শ্রেষ্ঠ সমালোচক হইতে পারেন না এবং বঙ্কিমচন্দ্র যে রোহিণীর "অত শীঘ্র" মরার ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন ইহাই বোধ হয় তাঁহার সৃষ্টির

* It would be far better for every one as well as far honester if young people were taught that what they call love is an appetite which like all other appetites is destroyed for the moment by its gratification."—Shaw : Preface to *Getting Married.*

দুর্ব্বলতার অন্যতম লক্ষণ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মত একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবেত্তার দিক্ হইতে এই ব্যাপারটি আলোচনা করিয়াছেন, সাহিত্যসমালোচকও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। রোহিণী ও গোবিন্দলাল গভীর প্রণয়ের সম্পূর্ণতা ও বিশ্বস্ততা লাভ করিতে পারে নাই। লালসার পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে শ্রান্তি, আকর্ষণের পশ্চাতে আসিয়াছে বিতৃষ্ণা। গোবিন্দলালের দিক্ হইতে এই চিত্র অতিশয় স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গোবিন্দলাল নিজে সঙ্গীতবিদ্যায় যথেষ্ট নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু রোহিণী যখন দানেশ খাঁর সঙ্গে গান শিখিতেছিল, তখন তিনি পাশের ঘরে অর্দ্ধ-অন্যমনস্কভাবে নভেল পড়িতেছিলেন। প্রেমের একটি লক্ষণ সাহচর্য্য—নানা বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া দুইটি হৃদয় এক সঙ্গে গড়িয়া উঠে। এইখানে উভয় পক্ষে সঙ্গীতে অনুরাগ আছে, কিন্তু সেই অনুরাগ ইহাদিগকে একত্র করে নাই, আন্তরিক বিচ্ছেদ ইহারা কিছুতেই ভরিতে পারিতেছে না। রোহিণী সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেছে এবং গোবিন্দলাল নভেল পড়িতেছেন—মনে হয় সুদীর্ঘ সময়ের বোঝা লঘু করিবার জন্য। একে অপরের নিকট হইতে ছুটি চায়। এই আসরে ভ্রমরের নামোচ্চারণ বজ্রপাতের মত আকস্মিক এবং বজ্রপাতের মতই ইহা 'সর্ব্ববিলোপী। তাহার পর সঙ্গীত জমিল না, নভেল পড়া অসম্ভব হইল, গোবিন্দলাল এই পঙ্কিল জীবনযাত্রা হইতে মুহূর্ত্তের জন্য অবসর গ্রহণ করিয়া ভ্রমরের চিন্তায় লীন হইলেন।

আর রোহিণী?—রোহিণীর কথা খুব স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। কিন্তু তাহার মনের ভাবও বুঝিতে অসুবিধা হয় না। রোহিণীর

চরিত্রে একটি প্রধান লক্ষণ দুঃসাহসিক জিগীষা। জয় করিবার ইচ্ছার দ্বারা উদ্বোধিত হইয়াই সে দুই বার উইল চুরি করিয়াছিল এবং ধরা পড়িয়াও বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। প্রণয়ের দীন, মধুর আত্ম-সমর্পণের আস্বাদ সে একবার পাইয়াছিল যখন সে জানিল গোবিন্দলাল তাহার প্রতি অনুরক্ত এবং গোবিন্দলালকে পাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। এই প্রতিদান ও এই আত্মসমর্পণই তাহাকে একনিষ্ঠ প্রণয়ের সন্ধান দিতে পারিত। কিন্তু অপবাদরটনা তাহার এই নবাঙ্কুরিত আত্মসমর্পণেচ্ছার গতি রুদ্ধ করিয়া বিজিগীষাকে পুনরুজ্জীবিত করিল। প্রণয়িনীর দীনতার স্থানে আসিল প্রগল্‌ভার নির্লজ্জতা। তার পর প্রসাদপুরে তাহার ভোগলিপ্সার প্রথম পরিতৃপ্তি হইল সত্য; কিন্তু গোবিন্দলালকে পাইয়াই রোহিণী বুঝিয়া থাকিবে যে গোবিন্দ-লালকে সে পায় নাই। সে অত্যাজ্যা, ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, তবু ভ্রমর—ভ্রমর। ইহাই তাহার চরম পরাজয়। গ্রন্থমধ্যে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। কিন্তু গোবিন্দলাল যে তাহার সঙ্গে থাকিয়া পরিপূর্ণ তৃপ্তি পায় নাই ইহা সে বুঝিয়া থাকিবে। ভ্রমরের নামোচ্চারণমাত্র যে ভাবান্তর হইল ইহা রোহিণীর মত বুদ্ধিমতী রমণীর কাছে নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত নহে। এই সময় রোহিণীর মনের ভাব কি হইতে পারে তাহা বঙ্কিমচন্দ্র অনুমান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যে মনোভাব লইয়া রোহিণী বারুণীর জলে ডুবিতে গিয়াছিল আজ সে মনোভাবের পরিবর্তন হইয়াছে—গোবিন্দলালকে প্রলুব্ধ করিয়া এবং সেই লুব্ধতার সীমা দেখিয়া রোহিণীর বিজিগীষা পুনরায় জাগরিত হইয়াছে। সে ভাবিল, "নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী না তাহাকে জয়

করিতে কামনা করিবে?.........যদি এই আয়তলোচন মৃগ এই প্রসাদপুর কাননে আসিয়া পড়িয়াছে—তবে কেন না তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিই।" এই রোহিণীই বিড়ালের উপর অপাঙ্গদৃষ্টির এক্সপেরিমেণ্ট করিয়াছিল, এই রোহিণীর কটাক্ষের আঘাতে কোকিল প্রাণ হারাইতে পারিত, এই রোহিণী হরলালকে জয় করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিল, এই রোহিণী মিথ্যা অপবাদকে ততোধিক মিথ্যা স্বীকৃতির দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া ভ্রমরের হাড় জ্বালাইয়াছিল, এই রোহিণীই গোবিন্দলালকে প্রলুব্ধ করিয়া বিজয়ের অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করিয়াছিল এবং সেই উপলব্ধি তাহাকে নিশাকর সম্ভাষণে প্রণোদিত করিয়াছিল।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে প্রধান চরিত্র গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণী, কিন্তু ইহার নামকরণে প্রধান চরিত্রয়ের উল্লেখ নাই। কৃষ্ণকান্ত অপ্রধান চরিত্র এবং তাহার উইলের অংশ লইয়া যে বিবাদ হইয়াছে তাহা উপন্যাসের মূল ঘটনা নহে। তবু এইরূপ নামকরণের বিশেষ সার্থকতা আছে। এই উপন্যাসে বাহিরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাই গোবিন্দলাল ও রোহিণীর মিলনের সহায়তা করিয়াছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করিয়াছে কৃষ্ণকান্তের উইল পরিবর্ত্তন। ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "প্রত্যেকবার উইল পরিবর্ত্তন কেবল যে সম্পত্তি বিভাগ বণ্টনের অংশ বদলাইয়াছে তাহা নহে, ইহা অলঙ্ঘ্য বিধিলিপির ন্যায় উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের ভাগ্যপরিবর্ত্তনও করিয়াছে।" হরলাল উইল জাল না করিলে, রোহিণী উইল বদলাইতে ধরা না পড়িলে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর

জীবনের সূত্র একত্র গ্রথিত হইত কিনা সন্দেহ। যখন শেষবার কৃষ্ণকান্ত উইল পরিবর্ত্তন করিলেন, তখন গোবিন্দলাল অধঃপাতের প্রায় শেষ সীমায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। তবু এই উইল পরিবর্ত্তন ও তাঁহাকে মূঢ়তায় আরও দৃঢ়সঙ্কল্প করিল এবং তাঁহার মাতাও বধূর প্রতি একটু বিরক্ত হইয়া সংসার ত্যাগ করিলেন। যদি কৃষ্ণকান্ত শেষবার উইল পরিবর্ত্তন না করিতেন, গোবিন্দলালের মা কাশী না যাইতেন তাহা হইলেও গোবিন্দলাল নিজেকে সংযত করিতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু এইসকল আপাতঃ ক্ষুদ্র ঘটনাও তাঁহাকে অধঃপতনের পথেই চালিত করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র আরও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন যাহা না ঘটিলে এই উপন্যাসের ট্র্যাজেডি নিবারিত হইত। সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটময় অধ্যায়ের মূলে রহিয়াছে দাসী ও পাড়াপ্রতিবেশিনীদের কুৎসারটনা। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—এই দুই উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে দুইটি ট্র্যাজেডির চিত্র আছে তাহারা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। নগেন্দ্রনাথ, সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর জীবনে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহা বাহিরের কোন ঘটনার দ্বারা জটিল হয় নাই। গোবিন্দলালের অধঃপতন প্রতিপদে নির্ভর করিয়াছে বাহিরের ঘটনার উপর। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' শুধু যে ব্যক্তিগত জীবনের ট্র্যাজেডির চিত্র আঁকিয়াছে তাহা নহে বাঙ্গালী হিন্দুপরিবারের বিস্তৃত বিবরণও এইখানে নিবদ্ধ হইয়াছে এবং পারিবারিক প্রতিবেশ কেমন করিয়া ব্যক্তির জীবনকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে এইখানে তাহার প্রকৃষ্ট আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে ট্র্যাজেডির যে তীব্র

অনিবার্য্যতার চিত্র পাওয়া যায় তাহার তুলনা এইখানে নাই। মানব হৃদয়ের নিগূঢ় রহস্যের উদ্ঘাটনই আর্টের উদ্দেশ্য। বাহিরের ঘটনার বর্ণনা সেই রহস্যের অভিব্যক্তিকে সাহায্য করে, ইহাই তাহার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা। কিন্তু উপলক্ষ্যকে প্রাধান্য দিলে আসল বস্তু অনেকটা চাপা পড়িয়া যায়। নরনারীর হৃদয়ের আদান-প্রদান যদি প্রত্যেক ধাপেই বাহিরের আকস্মিক ব্যাপারের উপর নির্ভর করে তাহা হইলে যে সকল আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি হৃদয়ের গভীরতম তল-দেশে লুক্কায়িত থাকে তাহারা পরিপূর্ণবেগে প্রকাশিত হইতে পারে না; 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বাহিরের ঘটনা বাদ দেওয়া হয় নাই, কিন্তু ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনীর হৃদয়ে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল বাহিরের কোন ব্যবস্থাই তাহাকে প্রশমিত করিতে পারিত না। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণীর ট্র্যাজেডির মধ্যে এই অনিবার্য্যতা নাই। প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই মনে হয় যে একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই গোবিন্দ লালের অধঃপতন নিবারিত হইতে পারিত; এই কারণে এই ট্র্যাজেডি অপেক্ষাকৃত লঘু হইয়া গিয়াছে।

'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্পর্কে আলোচনায় আর একটি পার্থক্য লক্ষ্য করিতে হইবে। এই দুই উপন্যাসের পরিণতি বিভিন্ন প্রকারের। নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখীর মধ্যে পুনর্ম্মিলন হইয়াছিল; কিন্তু ভ্রমর ও গোবিন্দলাল আর একত্র হইল না। পরিণতির এই যে পার্থক্য ইহা সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস। সূর্য্যমুখী ক্ষমাশীলা। সুতরাং নগেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া গেলেও তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। যদি

ঘটনাচক্রে সেই ইচ্ছা বাধা পাইত, সূর্য্যমুখীর মৃত্যু হইত তাহা হইলে বাহিরের দুর্দ্দৈব ইহাদের জীবনে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে এইরূপ মনে হইত এবং আমাদের রসোপলব্ধি পীড়িত হইত। যে ভ্রমর কলঙ্কের জনরব শুনিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল সে যে পরদারনিরত, হত্যাকারী স্বামীকে গ্রহণ করিবে না ইহাই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। গোবিন্দলাল যে খালাস পাইয়া ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে না যাইয়া উধাও হইয়াছিলেন তাহাও পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার সঙ্গে সুসঙ্গতির পরিচয় দেয়। গোবিন্দলাল যে ভাবে পতিগতপ্রাণা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন নগেন্দ্রনাথ সেইরূপ করেন নাই; বরং সূর্য্যমুখীই উপযাচিকা হইয়া তাঁহার বিবাহ দেওয়াইয়াছিলেন এবং কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে বিবাহের পরই তিনি সূর্য্যমুখী অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছেন। সুতরাং নগেন্দ্রনাথের অপরাধ যত গুরুতরই হউক সূর্য্যমুখীর সঙ্গে মিলন অসম্ভব হয় নাই। গোবিন্দলালের কথা অন্য রকমের। গোবিন্দলাল ভ্রমরের একটি ক্ষুদ্র অপরাধ মার্জ্জনা করেন নাই, ব্রহ্মানন্দ যে জনরবের কথা তাঁহাকে বলিয়াছিল তাহার অনুসন্ধান করেন নাই, এবং বিনাদোষে ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই পরিত্যাগের পরের ইতিহাস আরও ভয়াবহ। সুতরাং গোবিন্দলাল যে ভ্রমরের নিকট হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিবেন এবং ইহারা যে দাম্পত্য জীবনের ছিন্ন সূত্র আর যোজনা করিতে চেষ্টা করিবে না ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। বঙ্কিমচন্দ্র দুই উপন্যাসে একই কাহিনী রচনা করিয়াছেন, কিন্তু চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্যের জন্য সেই এক কাহিনী দুই উপন্যাসে বিচিত্রবর্ণে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

(৪)

'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার মধ্যে ঔরংজেবের রাজপুত যুদ্ধের এক অংশ বর্ণিত হইয়াছে এবং কতকগুলি কাল্পনিক কাহিনী ও তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে।

এই উপন্যাসের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় ঔরংজেবের চরিত্রচিত্রণ। ইতিহাসে ঔরংজেব পরধর্ম বিদ্বেষী, সঙ্কীর্ণচেতা নৃপতি বলিয়া পরিচিত এবং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে প্রচলিত ইতিহাসের অনুসরণ করিয়াছেন। আজকাল কোন কোন লেখক ঔরংজেবের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহার চরিত্রের প্রশংসা করিয়াছেন এবং যে সকল কার্য্য নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত তাহাদের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঔরংজেবকে পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণু, কপট চরিত্র বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন এবং সেই জন্যই একজন সত্যনিষ্ঠ সংযতাত্মা, ধর্ম্মভীরু বাদশাহের চরিত্র এইরূপ বিকৃত করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে এই অপবাদ যে কিরূপ অমূলক তাহা প্রমাণ করা খুবই সহজ। তবু ইহার একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক ছিলেন না। তিনি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন এবং প্রচলিত ইতিহাস বিকৃত না করিলেই তাঁহার বিরুদ্ধে আর কিছু বলিবার থাকে না। অর্ম, টড্, মনুচী—ইহারা ভারতবাসী নহেন। সুতরাং ইহাদের গ্রন্থের উপর নির্ভর করিলে তাঁহার দৃষ্টি পক্ষপাত দোষদুষ্ট হইবে না, তিনি এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। একদিন

ষ্টোন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ নানা সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার করিয়া যে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাহাতে ঔরংজেবের যে চিত্র পাওয়া যায় তাহাতেও পরধর্ম্ম সহিষ্ণুতা বা প্রজাবাৎসল্যের পরিচয় নাই বলিলেই চলে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছা করিয়া ইতিহাসকে বিকৃত করিয়াছেন এইরূপ অভিযোগ আনা সঙ্গত হইবে না। সমসাময়িক ইতিহাস তাঁহার উপন্যাস অপেক্ষা অধিক প্রশংসমান নহে।

বর্ত্তমান ঐতিহাসিকদিগের সঙ্গে তুলনা করিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের উদারতাই প্রমাণিত হয়। ঔরংজেব যে হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর ধার্য্য করিয়াছিলেন, অন্যান্য কর সম্পর্কে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছিলেন এবং হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা ঔরংজেবের পক্ষ সমর্থন করেন তাঁহারাও এই সকল বিষয় অস্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলেন যে জিজিয়ার উদ্দেশ্য জোর করিয়া হিন্দুকে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করা নহে, যে সকল হিন্দু সৈনিকের কাজ করিবে না ইহা তাহাদের অব্যাহতির দণ্ড। যদি ইহাই সত্য হয় তাহা হইলেও এই কথা মানিতেই হইবে যে মুসলমানকে এই কর দিতে হইত না এবং এই কর হিন্দুদিগের পক্ষে অপমানের চিহ্ন। হিন্দুব্যবসায়ীদিগকে শতকরা পাঁচ টাকা হারে শুল্ক দিতে হইত, মুসলমানদের কখনও কখনও দিতে হইত না, দিতে হইলেও কখনও আড়াই টাকার বেশী দিতে হয় নাই। হিন্দুদের কতকগুলি কর ঔরংজেব মাপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কারণ প্রজাবাৎসল্য নহে; ঐ সকল করে পৌত্তলিকতার স্পর্শ ছিল। হিন্দুর দেবমন্দির তিনি ভাঙ্গিয়াছিলেন, এই অভিযোগের বিরুদ্ধে তাঁহার সমর্থকেরা বলেন যে

তিনি নূতন মন্দির ভাঙ্গিতেন, বহু কালের পুরাতন মন্দির ভাঙ্গেন নাই, এবং এই সব কাজ তিনি করিয়াছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রচারের জন্য নহে, ইসলামের আইন প্রচলিত করিবার জন্য। ইসলাম ধর্মপ্রচার ও ইসলামের আইনপ্রচলন * এক বস্তু নহে।

ঔরংজেবের অপকীর্ত্তির দুই রকমের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন যে ঔরংজেব খাঁটি মুসলমান ছিলেন এবং হিন্দুদের উপর তিনি যে অত্যাচার করিয়াছেন তজ্জন্য ইসলাম ধর্মের সঙ্কীর্ণতাই দায়ী। এই ধর্ম অপর কোন ধর্মের অস্তিত্ব সহ্য করিতে পারে না। অপর শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণ বলেন যে ইসলামের ভিত্তি পরধর্ম্মবিদ্বেষ নহে, বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে মুসলমানগণ যখন অন্যান্য দেশ জয় করিয়াছেন তখন তাঁহারা নিজেদের ধর্ম্ম ও আচারের প্রতি প্রীতি দেখাইলেও অন্যান্য ধর্ম্মে বিশ্বাসীদের উপর কোন অত্যাচার করেন নাই। ঔরংজেব যাহা করিয়াছেন তাহার জন্য দায়ী তিনি নিজে, তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ইসলামের ধর্ম্মশাস্ত্র নহে। আকবর বাদশাহ বহু বিষয়ে ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়াছিলেন। শাহজাহান বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যত মহৎই হউক, সেই সময়কার মুসলমানদের মনে এই সন্দেহ ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয় যে দারা সিংহাসনে বসিলে তাহাদের ধর্ম্মের প্রতি পুনরায় অবহেলা ও

* There is a world of difference between "the spread of Islam" and "the spread of the law of Islam." (Aurangzebe and His Times—Faruki পৃঃ ১৫২) ঔরংজেবের অ-মুসলমান প্রজার কাছে এই প্রভেদ খুবই অকিঞ্চিৎকর বোধ হইয়া থাকিবে।

অবজ্ঞা দেখান হইবে। ঔরংজেব এই আশঙ্কার সুবিধা লইয়া ন্যায়নিষ্ঠ মুসলমান হিসাবেই সিংহাসনের প্রতি তাঁহার দাবী উত্থাপিত করেন। সুতরাং সিংহাসন লাভ করিয়া তিনি অতি সহজেই এমন সকল মুসলমানদের প্রভাবে পড়েন যাহারা গোঁড়া ও সঙ্কীর্ণচেতা। তিনি তাহাদের পৃষ্ঠপোষক এবং তাহারা তাঁহার সমর্থক। এই কারণে তিনি ইস্‌লামের এমন ব্যাখ্যা দিলেন যাহা সঙ্কীর্ণ ও অনুদার। তাঁহার অনুদারতার জন্য তাঁহার ব্যক্তিগত দায়িত্ব যত গুরুতরই হউক, বিশুদ্ধ ইসলামধর্মের দায়িত্ব একেবারেই নাই। এই ব্যাখা কতদূর বিচারসহ ঐতিহাসিকগণ বলিতে পারেন; কিন্তু এই ব্যাখ্যা ঔরংজেবের সমর্থক ইসলামধর্মে বিশ্বাসীর ব্যাখ্যা। *

বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ের ইতিহাস লইয়া তাঁহার উপন্যাস রচনা করিয়াছেন তখন ঔরংজেবের রাজত্বের প্রায় বাইশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সিংহাসন লাভের সময় দিল্লীর তথা ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যা কিরূপ ছিল তাহা তাঁহার উপন্যাসের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। কিন্তু তিনি ঔরংজেবের অপরাধের জন্য ইস্‌লামধর্ম্ম অথবা মুসলমান জাতিকে দায়ী করেন নাই। তিনি বলিতেছেন :

"গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু-মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না; মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না; অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল

* Aurangzebe and His Times। অর্ম ও এই যুক্তির যাথার্থ্য আংশিকভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে,·········রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল।···

অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতে যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক—সেই নিকৃষ্ট। ঔরংজেব ধর্ম্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল।" বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী নহেন এবং তিনি ঔরংজেবের পক্ষও সমর্থন করেন নাই। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টির সঙ্গে মুসলমান ঐতিহাসিকের দৃষ্টির মৌলিক সাদৃশ্য আছে। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের মতের উদারতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় ও প্রমাণ।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে 'রাজসিংহ' তাঁহার একমাত্র 'ঐতিহাসিক উপন্যাস। তিনি এই উপন্যাসে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং মোগলসাম্রাজ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নহে। তবু ঐতিহাসিক উপন্যাসে মূল ঐতিহাসিক ঘটনার যথাযথ বর্ণনা দিতে হইবে এবং প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে অবিকৃত রাখিতে হইবে। এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন কিনা। ঔপন্যাসিকের পক্ষে কিংবদন্তী বা প্রচলিত কাহিনীর মূল্য খুব বেশী, কারণ এই সকল কাহিনী সত্য না হইলেও তখনকার আব্‌হাওয়ার পরিচয় দেয় এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতার প্রধান কাজ উপযোগী আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি করা। একটি উদাহরণ দিলেই কথাটা স্পষ্ট হইবে। মোগল বাদশাহেরা তাঁহাদের কন্যাদের

বিবাহ দিতেন না। যাহারা ঐশ্বর্য্যে লালিত পালিত হইতেন, সমস্ত প্রকারের ভোগের সামগ্রী যাহাদের আয়ত্তাধীন ছিল তাঁহারা চিরকুমারী থাকিবেন ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বাদ্‌শাহজাদীদের গোপন প্রণয় সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিতও ছিল। সকল কাহিনীই যে সত্য এমন নহে, কিন্তু অনেকগুলি সত্য হওয়া সম্ভব এবং সংযম ও নীতির প্রচারক ঔরংজেব যে তাঁহার কন্যাদের বিবাহ দিতে রাজি হইলেন তাহাও বোধহয় এই জন্যই।' জেব্‌উন্নিসা অকিল খাঁ নামক এক মন্সবদারের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিলেন এইরূপ কিংবদন্তী ছিল। ইতিহাস উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে এই কিংবদন্তীকে স্বীকারই করে না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক নহেন, সুতরাং তাঁহার বন্ধনহীন কল্পনা এই কিংবদন্তীকে ভিত্তি করিয়া মবারক জেবউন্নিসার অপূর্ব্ব কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছে। রূপনগরের রাজকুমারী সম্পর্কে যে আখ্যায়িকা আছে তাহাও ঐতিহাসিক কিনা সন্দেহ, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের পক্ষে ইহা অতিশয় উপযোগী। বঙ্কিমচন্দ্র প্রচলিত কাহিনীকে যে ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহাও এক দিক্ দিয়া তাঁহার বিবেচনাশক্তিরই প্রমাণ দেয়। টড্ বলিয়াছেন যে ঔরংজেব রূপনগরের রাজকন্যার পাণিপীড়ন করিতে চাহিয়াছিলেন। ঔরংজেব অতিশয় সংযতাত্মা, মিতাচারী ছিলেন। তিনি হঠাৎ রাজপুত কন্যার রূপের কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইবেন ইহা কিংবদন্তী হিসাবেও অগ্রাহ্য। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে বিবাহের কথা ছলনা মাত্র; এই প্রস্তাবের অন্তরালে ছিল বাদ্‌শাহের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি। এই পরিবর্ত্তন উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক কল্পনার পরিচয় না দিলেও টডের গল্প অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য।

কিন্তু মোটের উপর 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ মূল ঘটনা ও প্রধান চরিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা তাঁহাকে পদে পদে ঐতিহাসিক সত্য হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। ঔরংজেব অনুদার, "ধর্মশূন্য" হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি, সাহস ও ক্ষমতার অভাব ছিল না, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার মত ক্ষমতাশালী নৃপতি খুব কমই দেখা যায়। তাঁহার দৃষ্টির প্রসার ছিল না, কিন্তু সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে তিনি অনন্যসাধারণ তীক্ষ্ণতার পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আঁকিয়াছেন এক স্ত্রীবুদ্ধিচালিত, শিথিলশাসন, অক্ষম, কামুক কাপুরুষের চরিত্র। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঔরংজেব প্রত্যেক ব্যাপারে নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন এবং তাঁহার পুত্রকন্যা বা ভগিনীর মধ্যে কেহ তাঁহার নির্দ্দেশের অন্যথাচারণ করিলে তিনি সমুচিত দণ্ড দিতে বিরত হইতেন না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে অতি সহজে জেব্‌উন্নিসা বা উদীপুরী তাঁহাকে চালিত করিতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, জেবউন্নিসা একজন প্রধান politician; মোগল সাম্রাজ্যরূপ জাহাজের হাল এক প্রকার তাঁহার হাতে।* এইরূপ কল্পনা ইতিহাসের বিকৃতি; সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসে অগ্রাহ্য। নির্ম্মলকুমারী ও ঔরংজেব সংবাদও ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতার বিরোধী। ঔরংজেব অতিশয় মিতাচারী ছিলেন। তিনি চারবার বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার চার বেগম কখনও এক সময়ে

* রাজপুত যুদ্ধকালে জেবউন্নিসা আকবরের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া ঔরংজেব তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন এবং তিনি বিশ বৎসর কারাগারে থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন

এক সঙ্গে তাঁহার কাছে থাকে নাই। রাজত্বের শেষার্দ্ধে উদিপুরী বেগমই তাঁহার একমাত্র সহচরী ছিলেন। কিন্তু এই উপন্যাসে দেখি নির্ম্মলকুমারী ঔরংজেবকে যত অপমানই করুক বাদশাহ তাহার "বশীভূত" হইয়াছেন। ঔরংজেব কখনও কোন নারীর কটাক্ষে মোহিত হইয়া তাহার দ্বারা চালিত হইবেন ইহা উপন্যাসেও বিশ্বাস করা শক্ত। নির্ম্মলকুমারীর সঙ্গে বাদশাহের যে কথোপকথন হইয়াছে তাহাতে দেখি নির্ম্মলের বাক্‌পটুতার কাছে বাদ্‌শাহ প্রতিপদে হার মানিতেছেন। মনে হয় নির্ম্মলের প্রত্যুত্তর গুলি পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করা ছিল, এবং সেই প্রত্যুত্তরের তীক্ষ্ণতা যাহাতে সহজে প্রমাণিত হইতে পারে সেই জন্য বাদ্‌শাহের কথাগুলিকে যথাসম্ভব দুর্ব্বল ও তাৎপর্য্যহীন করা হইয়াছে। ইহা বাদ দিলেও রঙমহালের ব্যভিচার, অনাচার, সরাবের সমারোহের এবং নর্ত্তক-নর্ত্তকীর কলকোলাহলের যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহা ঔরংজেবের বংশধর জাহান্দার শাহের রাজত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

আরও একটি ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। তিনি চতুর্দ্দিক হইতে ঔরংজেবের অক্ষমতা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঔরংজেব শুধু যে বাহিরের শত্রুর কাছেই পরাজিত হইয়াছেন তাহা নহে, পৌত্তলিকতার শত্রু নিজের রঙমহালেই পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিয়াছেন। প্রধানা মহিষী যোধপুরী বেগম হিন্দু আচার, হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিতেন।* ঔরংজেব বিখ্যাত

* ইঁহার চরিত্রও অদ্ভুত রকমের। ইনি স্ত্রী হইয়া (বিশেষতঃ হিন্দুরমণী হইয়া) প্রার্থনা করিয়াছেন, "হে ভগবান্। আমাকে বিধবা কর। এ রাক্ষস অধিক দিন

দেবদ্বেষী ; তিনি এইরূপ কাজে অনুমতি দিলে তাঁহার স্ত্রৈণতাই প্রকাশিত হয়। নির্মলকুমারী যে যোধপুরী বেগমের আশ্রয়ে থাকিয়া বাদশাহের কাছে হিন্দু রমণীর গৌরব সম্পর্কে অনায়াসে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া নিস্তার পাইবে ইহাও সম্ভব বা বিশ্বাসযোগ্য নহে। এইখানেও বুড়ার উপর কন্দর্পের অত্যাচার হইয়াছিল, এই ব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়াছেন। যোধপুরী বেগমের যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র আঁকিয়াছেন ইতিহাস তাহা সমর্থন করে না। তিনি কাশ্মীরী রাজপুতের কন্যা ছিলেন বটে। কিন্তু তিনি মুসলমানী। তাঁহারি নাম প্রথমে ছিল রহমতুন্নেছা এবং পরে ঔরংজেব তাঁহাকে নবাব বাঈ আখ্যা দিয়াছিলেন।

যুদ্ধাদির বর্ণনায়ও বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা যথেষ্ট প্রসার লাভ করে নাই। প্রথমতঃ, তিনি মেবার যুদ্ধকে অতিশয় বড় করিয়া দেখিয়াছেন। রাজপুত যুদ্ধের মূল কারণ যোধপুরের শিশুকুমার অজিত সিংহ এবং ইহার প্রধান নায়ক দুর্গাদাস রাঠোর। এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল মাড়বারে, শেষ হইয়াছিল দাক্ষিণাত্যে। অজিতসিংহকে আশ্রয় দিয়া এবং জিজিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে যাইয়া রাণা রাজসিংহ এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েন এবং প্রভূত বিক্রমের পরিচয় দেন। ঔপন্যাসিক সর্ব্ববিষয়ে ইতিহাসকে মানিয়া চলিবেন এইরূপ দাবী করা অসঙ্গত এবং সেইরূপ দাবী করিলে উপন্যাসের মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু যে যুদ্ধের বা যে ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হইবে পারি-

---

বাঁচিলে হিন্দু নাম লোপ পাইবে।" (!) এই যোধপুরী বেগমই ঔরংজেবের বিরুদ্ধে রাজসিংহকে সশস্ত্র করিবার জন্য চঞ্চলকুমারীকে প্রণোদিত করিয়াছিলেন।

পারিপার্শ্বিক ঘটনার সঙ্গে তাহার সংযোগ সম্পর্কে গ্রন্থকার অচেতন হইলে তাহা তাহার উপযুক্ত মূল্য পাইবে না। যাহা বড় তাহা ছোট হইয়া যাইবে, যাহা গৌণ তাহা প্রধান দেখাইবে। বঙ্কিমচন্দ্র টডের বর্ণনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন; টড রাজস্থানের ইতিহাস লিখিয়াছেন খণ্ড খণ্ড করিয়া। তাই বঙ্কিমচন্দ্র মেবারকে মাড়বার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন, মারাঠার সঙ্গে রাজপুতের মিলন তাঁহার উপন্যাসে খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। কোন একজন হিন্দুকে বড় করিতে যাইয়া তিনি সমগ্র হিন্দুস্থানকে ছোট করিয়া দেখিয়াছেন। যুদ্ধের ফল যাহা লিখিয়াছেন তাহাও অসত্য ও অবিশ্বাস্য। এবং এই জাতীয় বর্ণনায় রাজপুতের গৌরব বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা যে ঔরংজেবকে দেখিতে পাই তিনি অসতর্ক ও অক্ষম এবং তাঁহাকে হতবুদ্ধি করিয়া পরাস্ত করা খুব সহজ। রন্ধ্রপথে ঔরংজেবকে আবদ্ধ করার কথা বঙ্কিমচন্দ্র অর্ম ও মনুচীর গ্রন্থে পাইয়াছিলেন এবং তিনি ইহাকে তাঁহার উপন্যাসে প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু ঔরংজেবের চরিত্র ও যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে যে ধারণা আমরা ইতিহাসে পাই তাহার সঙ্গে এই পরাভবের কাহিনী সম্পূর্ণরূপে বেমানান হইয়া পড়ে।*

---

* এই সম্পর্কে ঐতিহাসিকপ্রবর স্যর যদুনাথ সরকার বলেন, "The Emperor was methodically guarded in full force during his stay in Mewar. When he stopped at Deobari, his van occupied Udaipur; when he himself went to Udaipur, a strong force under Hassan Ali Khan advanced westwards pursuing the Rana to Gagonda. The Rana, who

প্রায় সকল দিক্ দিয়া বিচার করিলেই দেখা যায় যে ঔরংজেবের চিত্রে এবং রাজপুত যুদ্ধের কাহিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের দাবী মিটাইতে পারেন নাই; ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিক অংশ রূপকথার মত মনে হয়।

শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাসে দেখিতে পাই যে গ্রন্থকার কল্পনার সাহায্যে সত্যের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন; কাল্পনিক চরিত্র ও কাল্পনিক ঘটনার সাহায্যে অতীতকালের যে চিত্র আঁকা হয় ইতিহাস তাহার মধ্যে সজীব হইয়া উঠে। এইখানে সেই উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক কাব্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে 'দুর্গেশ-নন্দিনী', 'মৃণালিনী' বা 'কপালকুণ্ডলা'র ঐতিহাসিক অংশ 'রাজসিংহ'

was at at this time, a fugitive, could not have attacked the Emperor who occupied the centre, without destroying the left or western wing of the Mughal army. On the contrary he was actually defeated by this wing on 22nd January............As the Mughal line from Deobari to Udaipur was unbroken, Aurangzeb's communication with his rear could not have been cut off nor could his wife have been captured, unless she had ventured west of Udaipur with a slender escort, which is highly improbable." অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের নিকট হইতে আমরা উচ্চাঙ্গের কল্পনা দাবী করিতে পারি। তিনি যদি ঔরংজেবের চরিত্রের যথাযথ পরিকল্পনা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি এই সকল রাজপুত কাহিনীর অসম্ভাব্যতা সহজেই অনুধাবন করিতে পারিতেন। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে বঙ্কিমচন্দ্রের আমলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক এলফিন-ষ্টোন এই গল্প অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই অংশ বাদ দিলে এই উপন্যাসে অনেক প্রশংসনীয় বিষয় ও আছে। প্রথমতঃ মনে আসিবে ইহাতে অগণিত ঘটনা ও চরিত্রের সম্মেলন এবং কাহিনীর দ্রুতগতি। বাদশাহ ঔরংজেব হইতে আরম্ভ করিয়া রঙমহালের সরাব-তৃষিত তাতারী প্রহরিণী, রাজসিংহ হইতে আরম্ভ করিয়া দস্যু মাণিকলাল পর্য্যন্ত বড় ছোট বহু নরনারী এইখানে একত্রিত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা ভীড় করিয়া বসিয়া থাকে নাই। সেই জন্য পাঠকের কখনও ক্লান্তি বোধ হয় না। বহু ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে, কিন্তু তাহারা এমন অনিবার্য্য গতিতে সঞ্চরণ করিয়াছে যে আখ্যায়িকায় কোথাও কোন অস্পষ্টতা আসে নাই, কোন ঘটনা পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা পরবর্ত্তী ঘটনার কাঁধে চাপিয়া বসে নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "রাজসিংহ প্রথম হইতে উল্টাইয়া গেলে এই কথাটি বারম্বার মনে হয় যে, কোন ঘটনা কোন পরিচ্ছেদ বসিয়া কালক্ষেপ করিতেছে না। সকলেই অবিশ্রাম চলিয়াছে। এবং সেই অগ্রসর গতিতে পাঠকের মন সবলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিণামের দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিতেছে।"

আর একটি কৌশলে বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্স ও বাস্তবের সমন্বয় করিয়াছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সম্ভাবনা খুব বেশী নাই, কারণ মানুষের হৃদয় এইখানে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে। বাহিরের ঘটনা তাহাকে বারংবার দোলা দিতেছে, একটি ধাক্কা সামলাইতে না সামলাইতে আর একটি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র নরনারীর দৈনন্দিন জীবনে ঐতিহাসিক বিপর্য্যয়ের প্রভাব অঙ্কিত করিয়াছেন। তাই যে সকল ঘটনা গার্হস্থ্য

বা সামাজিক উপন্যাসে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইত তাহা এইখানে তীব্র বাস্তবতা লাভ করিয়াছে। মোগল-রাজপুতের যুদ্ধে যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার গতিবেগ তিনি নরনারীর হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন। রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারী, মাণিকলাল, নির্ম্মলকুমারী, মবারক, জেবউন্নিসা, দরিয়া—ইহাদের মধ্যে যে সকল বৃত্তির চিত্র আঁকিয়াছেন তাঁহা সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান। কিন্তু ইহাদের দৈনন্দিন সুখ দুঃখের মধ্যে ইতিহাসের বিরাট স্পন্দন অনুভব করিতে পারি। এই আলোড়নের ফলে শুধু যে ইহাদের সঙ্কোচের বাধা সরিয়া গিয়াছে, তাহাই নহে ইহাদের অনুভূতি অসাধারণ তীব্রতা লাভ করিয়াছে। চঞ্চলকুমারী রাজসিংহের ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই আকর্ষণ হয়ত যুবতীহৃদয়ের বহু আকাশকুসুমের মধ্যে মিলাইয়া যাইত। কিন্তু ঘটনাচক্রে ইহা বাস্তবে পরিণত হইল; চঞ্চলকুমারী মহিষী হইবার পূর্ব্বেই প্রণয়িনীর দাবী জানাইয়া দিলেন। মবারক ও রাজসিংহের মাঝে দাঁড়াইয়া রাজকুমারী যে ভাবে যুদ্ধ থামাইতে চেষ্টা করিলেন তাহা অতিনাটকীয় বলিয়া মনে হইতে পারে; স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় চঞ্চলকুমারী এইরূপ সম্ভাবনা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। কিন্তু সেই পার্ব্বত্য যুদ্ধে মবারক ও রাজসিংহের মধ্যে দাঁড়াইয়া কুলকামিনী যে দোস্‌রা চাঁদ সুলতানাতে রূপান্তরিত হইবেন তাহা অতিনাটকীয় হইলেও একেবারে অবিশ্বাস্য নহে। নির্ম্মলকুমারী ও মাণিকলালের মধ্যে বিবাহে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই; সাধারণ অবস্থায় এই বিবাহ সংঘটিত হইতে বহু সময় লাগিত, বহু ঘটকালির

প্রয়োজন হইত। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে নির্ম্মলকুমারী অতিশয় নিঃসহায় অবস্থায় রক্ষকের অভাব অনুভব করিল এবং ঠিক সেই সময়েই সৈনিক মাণিকলালের শিশুসন্তানের জন্য একটি রক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন হইল। যে বিবাহ সাধারণভাবে অন্য পাঁচজন নরনারীর বিবাহের মতই সংসাধিত হইতে পারিত তাহা আসিল একান্ত অতর্কিতে, অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে, অঘটন সংঘটনের আকারে। এইরূপ অস্বাভাবিকতার জন্য ঐতিহাসিক বিপর্য্যয়ই দায়ী এবং ইহাই অস্বাভাবিককে সম্ভাব্যতা দান করিয়াছে। দরিয়ার হৃদয়ে দুইটি প্রধান প্রবৃত্তি—স্বামীর প্রতি দৃঢ় প্রেম ও প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা। এই দুইটি প্রবৃত্তির মধ্যে অনন্যসাধারণ কিছুই নাই, দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনে ইহাদের বিকাশ হইত শান্ত সংযত ভাবে। কিন্তু সেই প্রলয়ের আলোড়নে ক্ষুদ্র দরিয়ার হৃদয়ের আশা ও আশঙ্কা অস্বাভাবিক প্রাবল্য লাভ করিল। দরিয়া আর সাধারণ রমণী রহিল না; সে সুবিশাল ইতিহাসের মহাকোলাহলের মধ্যে আসিয়া অসাধ্য সাধন করিয়া ফেলিল। সে গান গাহিয়া সেনাপতি হাসানআলি খাঁকে খুসী করিয়া সৈনিক সাজিল, সৈনিক সাজিয়া মবারকের জীবন রক্ষা করিল আবার যুদ্ধশেষে পর্ব্বতের আড়াল হইতে মবারকের জীবন হরণ করিল। যে নিদারুণ বিপর্য্যয়ে অভ্রভেদী মোগল সাম্রাজ্য কাঁপিয়া উঠিল, বাদশাহজাদী জেবউন্নিসা ঐশ্বর্য্য ও অহঙ্কারের ঊর্দ্ধ শিখর ত্যাগ করিয়া ধুলায় অবলুণ্ঠিত হইলেন সেই বিপর্য্যয়ের ফলেই দীনা দরিয়া উন্মাদিনী প্রলয়ঙ্করীতে রূপান্তরিত হইল। এম্নি করিয়া ইতিহাসের সংস্পর্শে আসিয়া নরনারীর ক্ষুদ্র

গার্হস্থ্য জীবন বিশালতা ও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং মানব জীবনের নিবিড় রসধারায় ইতিহাস অপরূপ সজীবতা লাভ করিয়াছে।

উপন্যাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর চিত্র মবারক্ ও জেবউন্নিসার কাহিনী। সেই সময়ে বাদ্শাহজাদীদের বিবাহের প্রথা ছিল না। ঔরংজেব এই প্রথা উঠাইয়া দিয়া তাঁহার কোন কোন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন বটে। কিন্তু শাহ্জাদীরা সাধারণ রমণীর চরম পরিণতি বিবাহকে তুচ্ছ করিতেই শিখিয়া থাকিবেন। বিবাহের গোড়ার কথা একনিষ্ঠ প্রেম। তাঁহারা এইরূপ মনে করিয়া থাকিবেন যে তাঁহারা ভালবাসার সুখ ভোগ করিবেন কিন্তু তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিবেন না। জেবউন্নিসা এইরূপ মনে করিতেন এবং শাহজাদীরা যে ভাবে লালিত হইতেন তাহাতে এইরূপ মনে করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সমগ্র ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য যাঁহার করায়ত্ত, তিনি ভালবাসার ফুল আহরণ করিবেন, তাহার কাঁটা থাকিবে অপরের জন্য। রূপনগরে যাইবার পূর্ব্বে মবারক ও জেবউন্নিসার বিদায়-সম্ভাষণ হইল এই ভাবে :—

"মবারক। আপনি যাই বলিবেন তাই করিব। কিন্তু এ গরিবকে একটু ভালবাসিতে হইবে।

জেবউন্নিসা। বলিলাম না যে, তুমি আমার প্রাণাধিক?

মবা। ভালবাসিয়া বলিয়াছেন কি?

জেব। বলিয়াছি ভালবাসা গরিব দুঃখীর দুঃখ। শাহজাদীরা সে দুঃখ স্বীকার করে না।"

জেবউন্নিসা কঠিন আঘাতের মধ্য দিয়া তাঁহার আজন্মসঞ্চিত গর্ব্ব ভুলিয়া গরিব দুঃখীর সঙ্গে একাত্মতা বোধ করিলেন। বাহিরের

সমস্ত পার্থক্য ও আসবাবের অন্তরালে যে রমণী হৃদয় লুক্কায়িত আছে তাহা যে কত দীন, কত করুণ তাহা শাহজাদী রংমহালের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মধ্যে জানিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। ইহার জন্য ঐতিহাসিক বিপর্য্যয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই বিপর্য্যয় না হইলে দরিয়া মবারককে ফিরিয়া পাইত না এবং তাহা না হইলে মবারকের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইত না। তাহারি পরে মোগল-রাজপুতের সংঘর্ষের সঙ্গে জেবউন্নিসার হৃদয়ে নানা প্রবৃত্তির কলরোল তাল রাখিয়া চলিয়াছে। এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক অংশ "ভারত ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে" আর জেবউন্নিসার হৃদয়ের গভীরতম বেদনা বাহিরের সমস্ত আবরণ সবলে নিক্ষেপ করিয়া আত্মসচেতন হইয়া উঠিয়াছে।

(৫)

বঙ্কিমচন্দ্র তিনখানি [রাধারাণী, যুগলাঙ্গরীয়, ইন্দিরা] গল্প লিখিয়াছেন যাহা আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এই গল্প তিনটিতে অনেক অসম্ভাব্যতা আছে এবং ইহাদের মধ্যে গ্রন্থকার জোর দিয়াছেন ঘটনার মিলের উপর, চরিত্রের গভীরতার উপরে নহে। এই জন্য তিনি ইহাদের নাম দিয়াছেন, 'উপকথা'। উপকথার মতই ইহাদের মধ্যে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে, নানা বিপদের মধ্য দিয়া নায়ক-নায়িকা আপনাদের অভীষ্ট লাভ করিয়াছে। রমণী বিদ্যাধরীর রূপ ধরিয়াছে, আবার বিদ্যাধরী গৃহিণীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে; চোখ বাঁধিয়া অপরিচিত বরকে অপরিচিতা কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেওয়ান হইয়াছে এবং বহু কাল

পরে দেখা গিয়াছে তাহারা সুপরিচিত বাল্যপ্রণয়ী। বড় বড় উপন্যাসে দেখি বাল্যপ্রণয় দৈবাহত ; শৈবলিনী প্রতাপকে পায় নাই, রামসদয় মিত্র ললিতলবঙ্গলতাকে অমরনাথের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাধারাণী রুক্মিনীকুমারের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। হিরণ্ময়ী ও পুরন্দর দৈবকে ফাঁকি দিয়া বাল্যপ্রণয়কে সার্থক করিয়াছে। রাধারাণী, হিরণ্ময়ী ও ইন্দিরা যে ভাবে তাহাদের বাঞ্ছিতকে লাভ করিয়াছে তাহার মধ্যে প্রতিপদে অঘটন-সংঘটিত হইয়াছে। সুদূর অবিশ্বাস্য সম্ভাবনা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থকারের কল্পনা সকল বাধা অতিক্রম করিয়া প্রণয়কে সার্থকতা দান করিয়াছে। এই সকল কাহিনী উপন্যাস নহে—উপকথা।

আর একটি দিক্ হইতেও এই সকল আখ্যায়িকার রচনারীতি লক্ষ্য করিতে হইবে। ইহারা আয়তনে ছোট, কিন্তু ছোটগল্পের লক্ষণ ইহাদের মধ্যে নাই বলিলেই চলে। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে তাহা কোন একটি ক্ষণস্থায়ী সংঘাত লইয়া রচিত হয়। নরনারীর জীবনে এমন কোন একটি মুহূর্ত্তের আবির্ভাব হয় যাহা অনন্যসাধারণ, যাহা হৃদয়কে দোলা দিয়া থামিয়া যায় ; ছোট গল্প তাহাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে। ছোট গল্পের আদি ও অন্ত নাই ; ইহার কেন্দ্রীয় বিষয়ের অভ্যাগম অতর্কিত, কিন্তু আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ। তাহাকে বড় করিয়া দেখিতে গেলে, আরম্ভ ও পরিসমাপ্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহার নবীনতা, অতর্কিততা নষ্ট হইয়া যাইবে। ছোট গল্পের ঐক্য একটি সম্পূর্ণাবয়ব কাহিনীর ঐক্য নহে ; যে বিশিষ্ট অপ্রত্যাশিত অনুভূতি ইহার প্রাণ তাহাই ইহাকে সুসংবদ্ধ করিয়া তোলে। এই দিক্ দিয়া

দেখিতে গেলে ছোটগল্পের সাদৃশ্য রহিয়াছে একাঙ্ক নাটক ও গীতি-কবিতার সঙ্গে—বড় উপন্যাসের সঙ্গে নহে। 'ক্ষুধিতপাষাণ' 'কাবুলি-ওয়ালা', 'একরাত্রি' প্রভৃতি গল্পকে বড় করা অসম্ভব। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই শ্রেণীর ছোট গল্প লিখেন নাই। 'রাধারাণী', 'যুগলাঙ্গরীয়', 'ইন্দিরা'—ইহারা ছোটগল্প নহে, বড় উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার। * ইহাদের আর্ট ও টেক্‌নিক ছোটগল্পের আর্ট ও টেক্‌নিক হইতে স্বতন্ত্র। এই সকল আখ্যায়িকায় কোন একটি মুহূর্ত্ত প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। প্রত্যেকটি আখ্যায়িকার আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; শুধু মাঝের স্তরগুলিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। যখনই কোন কঠিন বাধা আসিয়াছে তখনই কবির কল্পনা অতি সহজে তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। পাঠকের কৌতূহল নানা বিষয়ে জাগ্রত হইয়াছে; কিন্তু গ্রন্থকার চেষ্টা করিয়াছেন যেন প্রতিপদেই তাহা অতিশয় উপযোগী উত্তর পাইয়া শান্ত হইয়া যায়। এই সকল ছোট আখ্যায়িকায় উপকথা ও উপন্যাসের আর্টের সমন্বয় হইয়াছে এবং ইহাদের বিচারও সেই দিক্ হইতেই করিতে হইবে।

উপকথার জন্ম অসম্ভবের রাজ্যে এবং শ্রেষ্ঠ উপকথার গুণ এই যে তাহা আমাদের উদ্যত অবিশ্বাসকে নিরস্ত করে। উপন্যাসের প্রধান কাজ চরিত্রসৃষ্টি। সুতরাং আলোচ্য তিনটি গল্পের প্রধান বিচার্য্য বিষয় দুইটি: (১) ইহাদের মধ্যে যে সকল অসম্ভব কথা আছে তাহা আমরা মানিয়া লইতে পারি কিনা (২) ইহাতে চরিত্রসৃষ্টি-নৈপুণ্যের

---

* এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র 'ছোট' ইন্দিরাকে 'বড়' করিয়াছিলেন।

পরিচয় আছে কিনা। উভয় দিক্ দিয়া বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে 'রাধারাণী' ইহাদের মধ্যে সর্ব্বনিকৃষ্ট।

রাধারাণী ও রুক্মিনীকুমারের মধ্যে প্রথম দৃষ্টিতেই যে প্রেম সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। রাধারাণী দশ এগার বৎসরের বালিকা; রুক্মিনীকুমার (অথবা দেবেন্দ্রনারায়ণ) তখন প্রাপ্তবয়স্ক এবং বিপত্নীক। ইহাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতা ও করুণার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক কেমন করিয়া প্রেমে রূপান্তরিত হইল তাহার চিত্র গল্পে দেওয়া হয় নাই। রাধারাণী যে সাহায্য সেই রাত্রিতে পাইয়াছিল তাহা তাহার মনে গভীর রেখাপাত করিবে ইহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু রুক্মিনীকুমারের পক্ষে এই সাহায্যদান ধনীর দরিদ্রের প্রতি দয়া। এই দয়া প্রেমে পরিণত হইল, অথচ তিনি আট বৎসর রাধারাণীর খোঁজ করিলেন না। এই খোঁজ না করার যে সমস্ত কারণ তিনি দেখাইয়াছেন তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে এবং তাঁহার এই ঔদাসীন্যের সঙ্গে পরবর্ত্তী প্রেমোচ্ছ্বাসের সামঞ্জস্য নাই। ইহাই গল্পের মৌলিক ত্রুটি। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে এই ত্রুটি অতিক্রম করিতে হইলে আখ্যায়িকা বড় হইয়া পড়িত; ইহার দ্রুতগতি ও সংক্ষিপ্ততা নষ্ট হইয়া যাইত।

'রাধারাণী'র চরিত্রচিত্রণ সম্পর্কে দুই একটা কথা বলা প্রয়োজন, কারণ এই জাতীয় গল্পে উপকথা ও উপন্যাস উভয় প্রকারের উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়। এক রাধারাণী ছাড়া অন্য কোন চরিত্র প্রস্ফুট হয় নাই। রাধারাণীর চরিত্রও নিতান্ত একটানা ভাবে আঁকা হইয়াছে; কোন বৈচিত্র্য বা বিরুদ্ধতা না থাকায় তাহা সম্পূর্ণরূপে

বিকশিত হইতে পারে নাই। শুধু শেষের দিকে প্রার্থিত জনের সহিত সাক্ষাতের সময়ে প্রগল্‌ভতা ও লজ্জাশীলতার সম্মিলন অতিশয় মধুর হইয়াছে। বিশেষতঃ দেবেন্দ্রনারায়ণের হৃদয়ের প্রবৃত্তি যত বেগবান্; বুঝিবার ক্ষমতা তত তীক্ষ্ণ নহে। রাধারাণী একটু একটু করিয়া তাঁহার মনের কথা বাহির করিয়া লইয়াছে আবার একটু একটু করিয়া তাঁহার কৌতূহল জাগ্রত করিয়া তাহা নিবৃত্ত করিয়াছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে কথোপকথন্ অতিশয় সরল ও ক্ষিপ্রগতি; রাধারাণীর কৌতূহল, আশঙ্কা ও আশা দ্রুতবেগে চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। *

'যুগলাঙ্গুরীয়' গল্পে অলৌকিকের স্পর্শ আছে; কিন্তু ইহার মূল

* 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'রাধারাণী' প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে গল্পের উন্নতি হইয়াছে। দুইটি পরিবর্ত্তনের কথা এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথম খসড়ায় দেখিতে পাই যে রুক্মিণীকুমার রাধারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার পূর্ব্বেই কর্ম্মচারীর নিকট জানিতে পারিয়াছিলেন যে রাধারাণী কুমারী। ('সধবাও নন্—বিধবাও নন্—উনি বিবাহ করেন নাই।... বঙ্গদর্শন, ১২৮২ পৃঃ ৩৩৯) গ্রন্থে দেখিতে পাই যে রাধারাণী এই রহস্য প্রকাশ করিয়াছে সর্ব্বশেষে। দ্বিতীয়তঃ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় রাধারাণী অতিশয় প্রগল্‌ভা, এমন কি রুক্মিণীকুমারের প্রকৃত নাম জানিবার পূর্ব্বেই সে বলিতেছে, "প্রভু সেদিন তুমি আমাদিগের জীবনদান করিয়াছিলে। এ পৃথিবীতে তুমি আমার দেবতা।" (বঙ্গদর্শন, ১২৮২ পৃঃ ৩৪৩) গ্রন্থে রাধারাণী অনেক বেশী সংযতবাক্ ও কৌশলময়ী। সে একবার রুক্মিণীকুমারকে নিজের আরাধ্য দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল, কিন্তু তখনই নিজের কথার সরল অর্থ অস্বীকার করিয়া রুক্মিণীকুমারের মনে ধাঁধা লাগাইয়াছে। গ্রন্থে রাধারাণী যে অভিনব উপায়ে বিবাহের প্রস্তাব করিল তাহাও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পে নাই।

ভিত্তি খুব স্বাভাবিক ও সাধারণ—বাল্যসঙ্গীর প্রেম ও তাহার পরিণতি। এই প্রেমের সার্থকতার পথে বাধা আনিয়াছে নিয়তির বিধান, কিন্তু শেষে নিয়তি বাল্যপ্রণয়কে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। হিরণ্ময়ী ও পুরন্দরের বিবাহ প্রাত্যহিক জীবনের বিবাহ হইতে স্বতন্ত্র; তবু ইহাদের অবস্থার অসাধারণত্ব স্মরণ করিলে এই অদ্ভুত বিবাহকে সম্ভবপর বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। ঘটনার অসাধারণত্ব রোমান্সের একটি প্রধান উপাদান; 'যুগলাঙ্গুরীয়' গল্পের বিশেষ গুণ এই যে কাহিনী অসাধারণ ও সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহার মধ্যে নায়িকার চরিত্রের অপরূপ বিশ্লেষণ ও বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। হিরণ্ময়ীর বিবাহপ্রস্তাব যে ভাবে ভাঙ্গিয়া গেল ও যে ভাবে তাহার বিবাহ হইল তাহা অতিশয় বিস্ময়কর। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, এই বিস্ময়কর ঘটনার অন্তরালে যে প্রেম ও সুখাকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে তাহা সার্বজনীন, সর্বরমণীসুলভ। হিরণ্ময়ীর চরিত্রের বিশ্লেষণে কোথাও চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা করা হয় নাই, কোথাও কোন উঁচু আদর্শ আসিয়া হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের গতিতে বাধা দেয় নাই।

প্রথম পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই যে হিরণ্ময়ী পুরন্দরের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে সঙ্কল্প করিতেছেন, কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই নিজের সুখের লালসা প্রাণবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে প্রশমিত করিয়াছে, কিন্তু তাহার পরই আবার কান্না আসিয়া তাঁহাকে বিবশ করিয়াছে। ইহার পর হিরণ্ময়ীর অদ্ভুত বিবাহ, পিতা ধনদাসের মৃত্যু এবং পুরন্দরের বিলম্বে প্রত্যাবর্তন। পুরন্দরের প্রত্যাবর্তনে হিরণ্ময়ী দুঃখিত হইয়াছেন, কারণ তিনি যাহার কথা দিবারাত্র ভাবিয়াছেন সেই পুরন্দর তাঁহাকে

ভুলিয়াছেন বলিয়াই তাম্রলিপ্তে ফিরিয়াছেন। আবার ইহাও ভাবিলেন যে পুরন্দরের কথা তাঁহার পক্ষে চিন্তা করা অন্যায়, কারণ পুরন্দর এখন পরপুরুষ। কিন্তু পুরন্দর বিবাহ করেন নাই, ইহা শুনিয়া হিরণ্ময়ীর ইন্দ্রিয়সকল পুনরায় অবশ হইল। দুর্ব্বল হৃদয়ও ধর্ম্মবুদ্ধির মধ্যে লুকোচুরি খেলা চলিতে লাগিল এবং এই খেলা চরমে পৌঁছিল সেই দিন, যে দিন রাজা মদনদেব স্বামীর রূপ ধরিয়া হিরণ্ময়ীর কাছে উপস্থিত হইলেন। হিরণ্ময়ী পাঁচ বৎসর স্বামীকে জানেন নাই, সুতরাং পুরন্দর তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া ছিলেন। কিন্তু এখন আর সেই সম্ভাবনা রহিল না। হিরণ্ময়ী প্রথমে তাঁহার নূতন অবস্থাকে মানিয়া লইতে চাহিলেন। রাজা মদনদেবকে আর্য্যপুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন এবং পুরন্দর সম্পর্কে তিনি যে অভিযোগ করিলেন তাহা স্বীকার না করিয়া বরং তাহার ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই হিরণ্ময়ী বুঝিতে পারিলেন যে বাহিরের সত্য অপেক্ষা হৃদয়ের সত্য প্রবল এবং মিথ্যা অভিযোগকেই তিনি শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন কারণ তাহাই তাঁহার জীবনের চরম সত্য। পুরন্দরের প্রতি আসক্তিকে হিরণ্ময়ী এত দিন নিজের হৃদয়ে সসঙ্কোচে পোষণ করিতে ছিলেন; কঠিন পরীক্ষার মুহূর্ত্তে তাঁহার সঙ্কোচ চলিয়া গেল, যে হীরকহারকে তিনি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন তাহার বিক্রয় পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া লইলেন। সত্যনিষ্ঠা, রাজমহিষীর গৌরব, বিবাহিতা স্ত্রীর পতিভক্তি—সকল আবরণ ভেদ করিয়া প্রণয়িনীর গোপন রহস্য প্রকাশ হইয়া গেল। 'যুগলাঙ্গুরীয়' ক্ষুদ্রাবয়ব উপকথা এবং ইহার কেন্দ্রীয় ঘটনা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে; কিন্তু

নায়িকার চরিত্রে যে বৈচিত্র্য, বিরোধ ও সঙ্গতির চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহা শুধু মনোরম নহে, অপূর্ব্ব মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ-কৌশলের পরিচায়ক।

'ইন্দিরা' 'রাধারাণী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' অপেক্ষা আয়তনে অনেক বড়। ইহাকে একখানা ছোট উপন্যাস বলা যাইতে পারে, যদিও ইহার মধ্যে নৈতিক ও মানসিক তত্ত্ব খুব কমই আছে এবং উপকথাসুলভ অবিশ্বাস্য ঘটনারও অভাব নাই। 'ইন্দিরা'র আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছে ইন্দিরা নিজে। সে উপন্যাসের প্রধান চরিত্রমাত্র নহে, প্রকৃতপক্ষেই নায়িকা। ঘটনাগুলি শুধু তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে নাই; সর্ব্বত্র সে তাহার প্রাধান্যের ছাপ মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে। সে যে নিজের কাহিনী নিজে বর্ণনা করিয়াছে ইহা অতিশয় সুসঙ্গত হইয়াছে, কারণ এই কাহিনীর মধ্যে অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক যাহাই থাকুক না কেন তাহাকে সেই নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে এবং তাহার সহজপ্রাধান্যবোধ তাহার চরিত্রের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। এই প্রাধান্যবোধ নিজের বর্ণনায় যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে অপরের বর্ণনায় তাহা সম্ভব হইত না। ইন্দিরার প্রাধান্যবোধ ছিল, কিন্তু মূঢ় দুরহঙ্কার ছিল না; তাহা হইলে তাহাকে আমরা সহ্য করিতে পারিতাম না। দাসীবৃত্তির প্রথম উল্লেখে, মাহিনার বন্দোবস্তে, সমর্থ বয়সের প্রতি ইঙ্গিতে হরমোহন দত্তের কন্যা ব্যথিত ও অপমানিত বোধ করিয়াছে, কিন্তু সহায়হীনা ইন্দিরা আপনার অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, কৌতুকময়ী কুমুদিনী এই নিদারুণ দুঃখকে হাসির রসে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছে। ইন্দিরার চরিত্রের অন্যতর প্রধান লক্ষণ প্রাণরসের প্রাচুর্য্য—সম্পদে বিপদে তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কৌতুকপ্রিয়তা, নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস, ভরা যৌবনে স্বামিসঙ্গ-

লাভের আকাঙ্ক্ষা উছলিয়া উঠিয়াছে। একটি অধ্যায়ের নাম 'বাজিয়ে যাব মল'—ইহা সমগ্র গ্রন্থের শিরোনামা হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

'ইন্দিরা' ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাস। সুতরাং কোথাও গভীর বিশ্লেষণ বা আলোচনা নাই, কিন্তু নায়িকা ও অন্যান্য কয়েকটি চরিত্র অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালির বোতল, হারাণী ঝি, সোনার মা—ইহারা খুবই গৌণ চরিত্র, কিন্তু ইন্দিরার দৃষ্টি এত প্রখর যে তাহার উজ্জ্বল আলোকে ইহারা অতি সহজেই স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র সুভাষিণী বা সুবো। সুবোর বুদ্ধি ও সহৃদয়তা অনন্যসাধারণ। ইন্দিরার সঙ্গে সে যে ভাবে সখিত্ব সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে তাহা অতিশয় বিস্ময়কর; তবু মনে হয় সুভাষিণীর পক্ষে ইহা অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিক। হাঁস যেমন অনায়াসে জলে সাঁতার দেয় সুভাষিণী তেমনি করিয়া কর্ত্রীর অভিমান ও প্রাধান্য বোধ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দিরার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোথাও যে বিস্ময়কর কিছু থাকিতে পারে আমাদের তাহা মনে হয় না, কারণ সুভাষিণীর নিজেরই তাহা মনে হয় নাই। আর একটি কারণে এই চিত্র সরল ও আতিশয্যবর্জ্জিত হইয়াছে। সুভাষিণী ও ইন্দিরা যখন মিলিত হইয়াছে তখন ইহাদের পদমর্য্যাদায় পার্থক্যের অবধি নাই, কিন্তু বুদ্ধিতে ইহারা একেবারে সমকক্ষ। সেই কারণে এই অদ্ভুত সখীত্ব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াছে। বাহিরের যে দূরত্ব ছিল তাহা যে কত অলীক তাহা সুভাষিণী পলকের দৃষ্টিতে বুঝিতে পারিয়াছে এবং ইন্দিরা বিনা আয়াসে বুঝাইতে পারিয়াছে।

এই উপন্যাসে চরিত্রগুলি যেমন উজ্জ্বল, বর্ণনারীতিও তেমনি

কৌশলময়। নায়ক নায়িকা গ্রন্থের বর্ণনা করিলে একটি প্রশ্ন প্রথমেই জাগে—কাহিনীর ঠিক কোন্ সময়ে এই বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে উপন্যাসবর্ণিত ঘটনা শেষ হইয়া গেলেই এই বর্ণনা আরম্ভ হয় এবং সেই কারণে বর্ণনার সহজ সাবলীলতা নষ্ট হইয়া যায়। যে বর্ণনা করিতেছে সে নিজের পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতার সাহায্যে অতীত ঘটনা না দেখিয়া পারে না, সুতরাং মনে হয় ঘটনাগুলি যে ভাবে ঘটিয়াছিল, ঘটিবার সময় তাহাদের যে তাৎপর্য্য ছিল আমরা ঠিক তাহা পাইতেছি না। কিন্তু ইন্দিরার বর্ণনাভঙ্গী অতিশয় কৌশলময়। পরে সে একটা নির্লজ্জতার অভিনয় করিয়াছিল এইরূপ দুই একটি অস্পষ্ট ইঙ্গিত ছাড়া ইন্দিরা কোথাও ভবিষ্যতের আভাস দেয় নাই। যে ভাবে যাহা ঘটিয়াছে সে ঠিক সেই ভাবে তাহা বর্ণনা করিয়াছে। ইহা তাহার বুদ্ধিমত্তা, বর্ণনা নৈপুণ্য ও নিজেকে কবির অনাসক্ত দৃষ্টিতে দেখিবার ক্ষমতার পরিচয় দেয়। ইন্দিরা যখন আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন তাহার স্বামিলাভ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তবু বিরহিণীর আকাঙ্ক্ষা, দস্যু-অপহৃতা সহায়হীনার আশঙ্কা, মায়াময়ীর ছলনা—তাহার অতীত জীবনের প্রত্যেক অবস্থা তাহার স্মৃতিতে জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে, ভবিষ্যতের সৌভাগ্যে কোন অভিজ্ঞতাই ম্লান হইয়া যায় নাই। সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়া ইন্দিরা তাহার অতীত জীবনের মধ্যে ফিরিয়া গিয়াছে।

নায়ক বা নায়িকাকে উপন্যাসের বক্তা করিলে বর্ণনা অপেক্ষাকৃত সজীব হয়। কিন্তু এই রীতির অসুবিধাও আছে। প্রধান অসুবিধা

এই যে অন্যান্য সকল চরিত্রকেই বক্তার দৃষ্টি দিয়া দেখিতে হয়। বক্তার সকল কথা মানিয়া লইতে হয়। এই জন্য অন্যান্য চরিত্রগুলি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারে না। এই উপন্যাসের প্রারম্ভে ইন্দিরা শ্বশুরবাড়ীর সংজ্ঞা দিতে যাইয়া বলিয়াছে যে সে এক নন্দনপুরী যেখানে রমণী অপ্সরায় রূপান্তরিত হয়, পুরুষ ভেড়া হয়। কলিকাতা নন্দনপুরী নহে, ইন্দিরা রূপসী ও চতুরা হইলেও অপ্সরা নহে, কিন্তু তাহার স্বামীর যে পরিচয় পাই তাহাতে ইন্দিরার শ্বশুর বাড়ীর সংজ্ঞার কথা মনে পড়ে। বাস্তবিকপক্ষে স্বামীকে বশ করিয়া ইন্দিরা তাহার যে কাহিনী রচনা করিয়াছে তাহাতে তাহার নিজের কৃতিত্ব ও রসিকতার পরিচয় দিতে সে এত ব্যস্ত যে তাহার স্বামীর চরিত্র বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। স্বামীর একমাত্র কাজ ইন্দিরার রূপে মুগ্ধ হওয়া, ইন্দিরার বশীভূত হওয়া, ইন্দিরা ও তাহার ভগিনীর কৌতুক নীরবে সহ্য করা এবং নিজের ব্যবহারের দ্বারা তাহাদের রসিকতার রসদ সংগ্রহ করা। তাহার যে একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে কোথাও তাহা মনে হয় না। অথচ তাহাকে শুধু খেলার পুতুল মনে করিলেও উপন্যাস একেবারে লঘু হইয়া যায়।

আখ্যায়িকার বিচার করিলেও এই ত্রুটি চোখে পড়ে। সকল কথা ইন্দিরা যে ভাবে বর্ণনা দিয়াছে সেইভাবে গ্রহণ করিতে হয়; অথচ কতকগুলি সন্দেহ থাকিয়া যায়। ইন্দিরা প্রখর বুদ্ধিশালিনী; সে ডাকঘর বা জেলার নাম জানিবে না ইহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। আর একটি অসম্ভব ব্যাপার এই যে কলিকাতায় আসার পূর্ব্বে কেহ ইন্দিরার পিতার কাছে সংবাদ দেওয়া বা চিঠি লিখার

কথা ভাবে নাই। ইন্দিরা যেখানে প্রথম আশ্রয় পাইয়াছিল, সেইখান হইতে তাহার পিত্রালয় মহেশপুর খুব দূর নহে। সেইখানকার লোকেরা মহেশপুরে সংবাদ দিতে বা চিঠি 'লিখিতে' তেমন কোন চেষ্টা করে নাই। তারপর স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর ইন্দিরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহাই যে একমাত্র পথ এই কথাও আমাদিগকে ইন্দিরার কথা হইতেই মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে যে ইন্দিরাকে লইয়া এমন কোন সামাজিক গোলযোগ হয় নাই যাহার জন্য এত বড় ষড়যন্ত্রের প্রয়োজন হইতে পারে। অবশ্য এই কথা বলা যাইতে পারে যে যদি ইন্দিরা স্বামীকে বশীভূত করিতে না পারিত তাহা হইলে শ্বশুরালয়ে তাহার স্থান হইত না। কিন্তু এই কথা মানিয়া লইলেও বিদ্যাধরীঘটিত অংশের প্রয়োজনীয়তা ছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে ইন্দিরা খুব কৌতুকপ্রিয়; যে স্বামী বশীভূত হইয়াছে হয়ত তাহাকে লইয়া সে আরও একটু খেলিয়া লইয়া নিজের প্রাধান্য সম্পূর্ণ করিল। এইভাবে বিচার করিলেও সেই পূর্ব্বের আপত্তি অন্য আকারে দেখা দেয়। গ্রন্থ মধ্যে ইন্দিরা এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যে অন্য কাহারও দেখিবার ভঙ্গী বা বক্তব্যকথার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইন্দিরার স্বামীর বিচারবুদ্ধি এত কম যে ইন্দিরার কথায় সে রমণীকে বিদ্যাধরী বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছে; এবং কুমুদিনীই যে ইন্দিরা এই সরল সহজ সত্যকেও ইন্দিরা নিজে স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিবার পূর্ব্বে সে গ্রহণ করিতে পারে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আনন্দমঠ—দেবীচৌধুরাণী—সীতারাম

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' লইয়া নানাপ্রকারের সমালোচনা হইয়াছে। যাঁহারা এই উপন্যাস লইয়া আলোচনা করেন তাঁহাদের অনেকেই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় কি তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন না। দেশকে বঙ্কিমচন্দ্র ভালবাসিতেন এবং 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থের শেষ কথা হইতেছে— "সকল ধর্ম্মের উপর স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।" কিন্তু তিনি ইহাও মনে করিতেন যে লোকবাৎসল্য দেশবাৎসল্য অপেক্ষা বড়। স্বাধীনতা আমাদের দেশে নূতন কথা, স্বাধীনতা অপেক্ষা প্রজার সুখ অনেক বেশী মূল্যবান্ এবং ইংরেজ রাজত্বের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দাবী এই যে এই সময়ে নিম্নশ্রেণীর প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে স্বাধীনতা অরাজকতারই নামান্তর মাত্র তাহাকে বঙ্কিমচন্দ্র কামনার উপযুক্ত বলিয়া বিচার করেন নাই। তিনি দেশকে ভালবাসিতেন, মাতাকে বন্দনা করিতেন, কিন্তু স্বাধীনতার বিনিময়ে দেশীয় লোকের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন না এই দ্বৈধভাব ও তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য আনিবার চেষ্টা 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে দেদীপ্যমান। উপন্যাসের প্রধান ব্যক্তি মহাপুরুষ চিকিৎসক যিনি সত্যানন্দকে সন্তান সম্প্রদায় গঠন করিতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, যিনি সত্যানন্দের নিকট হইতে অকুণ্ঠিত ভক্তি দাবী করিয়াছিলেন এবং যিনি বিজয়ের মুহূর্ত্তে

সত্যানন্দকে বিসর্জ্জনের পথে চালিত করিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার (এবং বঙ্কিমচন্দ্রের) মতে বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী এবং সন্তানসম্প্রদায় দেশস্থ লোকের ধন ও প্রাণ অপহরণ করিয়া যে সমাজবিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। সত্যানন্দ শুধু যে মুসলমান রাজত্বের উচ্ছেদসাধন করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাই নহে হিন্দুরাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠাও তাঁহার অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সত্যানন্দ ও সাধারণ হিন্দুগণ যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে—যাহার প্রধান উপকরণ তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর অর্চ্চনা—তাহা এই মহাপুরুষের মতে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্মমাত্র। ইংরেজ রাজত্বে সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃতরূপ প্রকাশ পাইবে এবং তাহার অনুশীলনের পথ সহজ হইবে। সুতরাং ইংরেজ রাজত্বে দেশের ও হিন্দুর মঙ্গল হইবে। ভবিষ্যতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হইবে, কিন্তু তখনও হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এমন কোন সম্ভাবনার পোষকতা তিনি করেন নাই।' *

* কেহ কেহ মনে করেন 'আনন্দমঠ' মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করে এবং ইহার উদ্দেশ্য হিন্দুরাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। যাঁহারা এইরূপ মনে করেন তাঁহারা উপন্যাসখানি পড়িয়া দেখেন নাই। ভবানন্দ ও সত্যানন্দের মত বঙ্কিমচন্দ্রের মত নহে। ভবানন্দ ও সত্যানন্দের অনেক গুণ ছিল; কিন্তু তাঁহাদের মতের সঙ্কীর্ণতা প্রমাণ করাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ভবানন্দ ও সত্যানন্দ মুসলমানবিদ্বেষী বিদ্রোহী। ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাই: "সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র; বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী"। সত্যানন্দ হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। মহাপুরুষ সেই কার্য্যে বাধা দিলেন এবং ভবিষ্যতে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মচর্চ্চার সুবিধার কথা বলিলেন, কিন্তু হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠায় তিনি পোষকতা করিলেন না। উপন্যাসটি আদ্যন্ত পাঠ করিলে কাহারও মনে এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে

মহাপুরুষের মধ্যে যে দিব্যদৃষ্টি বা ভবিষ্যৎজ্ঞানের পরিচয় পাই তাহা সমসাময়িক কোন নেতার অনধিগম্য। এইজন্য মহাপুরুষ উপন্যাসের প্রধান ব্যক্তি হইলেও উপন্যাস হইতে অনেকটা দূরে আছেন। তিনি কাহিনীর ব্যাখ্যাতা, তিনি নায়ক সত্যানন্দকে নিয়ন্ত্রিত করেন কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কোন কার্য্যে ব্রতী হয়েন না। যদি তিনি সকল কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন ও তাঁহার দূরদৃষ্টির দ্বারা সবাইকে চালিত করিতেন তাহা হইলে উপন্যাস তাহার বাস্তবতা হারাইয়া ফেলিত। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যানন্দের কর্ম্মের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন—হিন্দু-রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে মহাপুরুষ তাঁহাকে বিরত করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সত্যানন্দের মত স্বদেশসেবকের সাধনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই জন্য সেই সাধনার যে রূপ তিনি দিতে পারিয়াছিলেন তাহা সজীবতায় ও উজ্জ্বলতায় অনন্যসাধারণ। বাস্তবিক পক্ষে এই চিত্রের সৌন্দর্য্য এত বিচিত্র ও সমৃদ্ধ যে সত্যানন্দকেই বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শের প্রতীক বলিয়া মনে করা হয় এবং যাঁহারা

পারে না। গ্রন্থমধ্যে শুধু চিকিৎসকই গ্রন্থকারের মতের সন্ধান রাখেন। যে সময়ের ইতিহাস লইয়া এই উপন্যাস রচিত হইয়াছে সেই সময়ের মুসলমান-রাজশক্তি যে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ও অচল হইয়া পড়িয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় যে শাসক দুর্ব্বল, দুর্ভিক্ষের সময় তাহার অপটুতা আরও বেশী করিয়া প্রকট হয় এবং প্রজাগণ সকল প্রকার দুঃখের জন্য তাহাকেই দায়ী করে। এই সময়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহীদের দ্বারা স্বতন্ত্ররাজ্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা উভয়ই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যানন্দ ও ভবানন্দকে ঘোর মুসলমানবিদ্বেষী করিয়া ইতিহাসজ্ঞান ও শিল্পকৌশলেরই পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার [illegible]ের যে প্রশস্ততর দৃষ্টি ছিল তাহারও প্রমাণ দিয়াছেন।

ইংরেজরাজত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিতে চাহিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সত্যানন্দকে আদর্শ করিয়া সন্তান সম্প্রদায়ের অনুরূপ সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন। ইহা বঙ্কিমের বর্ণনানৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মহাপুরুষের সঙ্গে সত্যানন্দ ও তাহার সম্প্রদায়ের সম্পর্ক গণিতের একটা সঙ্কেতের সাহায্যে প্রকাশ করা যাইতে পারে। গণিতে দুইটি বন্ধনী-চিহ্নের মাঝখানে একটা অঙ্ক থাকে। তাহার একটা নিজস্ব মূল্য আছে, কিন্তু বন্ধনীর অব্যবহিত বামদিকে যে সংখ্যাটি থাকে তাহার উপরে ভিতরের যে অঙ্ক (সে যত বড়ই হউক) তাহার মূল্য নির্ভর করে। সত্যানন্দ ও সন্তানধর্ম্ম বন্ধনীর ভিতরের অঙ্ক; তাহার বাহিরে রহিয়াছেন মহাপুরুষ চিকিৎসক। কিন্তু সত্যানন্দ ও আনন্দমঠ এত প্রাধান্য পাইয়াছে যে আমরা বাহিরের সংখ্যাটিকে অনেক সময় ভুলিয়া যাইতে পারি।

প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি সন্তানধর্ম্মকে গৌণ করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল তাহা হইলে উপন্যাসে তাহাকে এইরূপ প্রাধান্য দেওয়া হইল কেন, বন্ধনীর বাহিরে যে সংখ্যাটি রহিল তাহাকে অস্পষ্ট করা হইল কেন? সাহিত্য ও গণিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের শাস্ত্র—গণিত প্রাণহীন সঙ্কেত লইয়া আলোচনা করে, সাহিত্যের প্রধান গুণ সজীবতা। সত্যানন্দকে বঙ্কিমচন্দ্র সজীব ও উজ্জ্বল করিয়াছেন—তাঁহার বিশ্বাসের দৃঢ়তা, তাঁহার দেশাত্মবোধ, তাঁহার সম্প্রদায়গঠনের ক্ষমতা, তাঁহার সংযম ও তাঁহার হিংসা নানাবর্ণে প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা কোন বিরাট্ অভিযানে প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহাদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ একাগ্রতা। বিরুদ্ধ বাহিরের শক্তি যেখানে অনতিক্রমণীয় সেখানে

হৃদয়ে দ্বিধা বা ভয় থাকিলে চলিবে না। তাই বঙ্কিমচন্দ্রও সত্যানন্দের মনে কোন প্রকারের সঙ্কোচ বা সন্দেহের অবকাশ রাখেন নাই। যখন মহাপুরুষ তাঁহাকে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন, যখন আরব্ধ কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া যাইবার আদেশ আসিয়াছে তখনও তিনি বলিয়াছেন, "শত্রুশোণিতে মাতৃভূমিকে শস্যশালিনী করিব।" সত্যানন্দ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, কিন্তু দেশপ্রেমের কাছে অন্য কোন ধর্ম্মকে তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার নীতি ও ধর্ম্ম স্বতন্ত্র; দেশকে বাদ দিলে তিনি অনন্যমাতৃক এবং দেশের জন্য লুঠ, হিংসা, হত্যা, বন্ধুত্যাগ কোন কর্ম্ম হইতেই তিনি বিরত হইবেন না। তিনি গতানুগতিককে মানিতে প্রস্তুত নহেন; তাঁহার দেশপ্রেম অগ্নিস্বরূপ—ইহা আলো করে, দগ্ধও করে।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু শূন্যগর্ভ বক্তৃতা করেন [illegible] সন্তানধর্ম্ম কেবল বাক্যের মধ্য দিয়া প্রচারিত হয় নাই, কর্ম্মের [illegible] প্রত্যক্ষ হইয়াছে। নূতন সভ্যের দীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া [illegible] কর্ম্মীর প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত সকল প্রকারের কর্ম্মে এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্তি পাইয়াছে। সন্তানধর্ম্ম কবির স্বপ্ন, ঋষির ব্রত ও কর্ম্মীর সাধনা; ইহার মহিমা ও দুর্ব্বলতা নানা অবস্থার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সেই জন্যই এই ধর্ম্মকে শিরোধার্য্য না করিলেও ইহাকে অস্বীকার করা যায় না; কারণ ইহা স্পষ্ট, জীবন্ত, ফুলে ফলে সমৃদ্ধ; আবার অপরিসীম ব্যর্থতায় ইহার শক্তি অপচীয়মান। ভবানন্দ ও জীবানন্দের জীবনে এই ধর্ম্মের ব্যর্থতার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানবজীবনের প্রধান লক্ষণ তাহার অতর্কিততা; অপ্রত্যাশিতের অভ্যাগমে সকল প্রকারের ধ্যান-

ধারণার অন্তর্দ্ধান। ভবানন্দ প্রথম 'বন্দেমাতরম্' গীত গাহিয়া আমাদিগকে মোহিত করিয়াছেন ; তিনি ব্রহ্মচারীদলের অন্যতম প্রধান সেনাপতি ; দেহের ও মনের শক্তিতে তিনি অতুলনীয়। কিন্তু বাহিরের সিপাহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যত সহজ হৃদয়ের প্রবলতম রিপুকে প্রশমিত করা তত সহজ নহে। পৃথিবী ভূমিকম্পের জন্য প্রস্তুত থাকে না; নিশ্চিন্ত মনে তাহার কাজ করিয়া যায়। কিন্তু এক মুহূর্ত্তে অভ্যন্তর হইতে যে আলোড়ন জাগিয়া উঠে তাহাতে যুগ যুগ ধরিয়া যাহা গড়া হইয়াছিল সমস্তই বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ভবানন্দের জীবনে এইরূপ প্রলয়ঙ্কর বিক্ষোভ আসিয়া তাঁহার সমস্ত সাধনা ব্যর্থ করিয়া দিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। বঙ্কিমচন্দ্র ভবানন্দের চরিত্রের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন যে, যে রিপুর কাছে এই সন্তান সেনাপতি অবনত হইলেন তাহা পাত্রাপাত্র বিচার করে না, তাহার আবির্ভাব হইলে সকলকেই মাথা নত করিতে হয়।

সন্তানদের অন্যতম নায়ক জীবানন্দের জীবনেও সেই একই সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টাও করিয়াছেন, যদিও তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। বোধ হয় এই সমস্যা সমাধানাতীত। সন্তানধর্ম্ম ও পত্নীসঙ্গ—ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য সম্ভব কিনা, দেশসেবককে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইয়াছে। শান্তি সাহসী, বলিষ্ঠ ও যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ। * শান্তি

* শান্তির চরিত্রের এই পরুষতা বাঙ্গালী রমণীতে সম্ভব নহে, এইরূপ সমালোচনা কেহ কেহ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই সমালোচনার যৌক্তিকতা আংশিকভাবে স্বীকার করিয়া পঞ্চম সংস্করণে শান্তিকে অপেক্ষাকৃত শান্ত করিয়াছেন। শান্তি বাঙ্গালী সমাজে

বিবাহের যৌন সম্পর্ককে অগ্রাহ্য করিয়া স্বামীর সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিয়াছিল। ইহাতে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বঙ্কিমচন্দ্র এড়াইয়া গিয়াছেন। শান্তিকে দেখিয়া জীবানন্দ মুহূর্ত্তের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাহার পর শান্তি আসিয়া আনন্দমঠের সদস্য হইল, জীবানন্দের ঘরে পৃথক্ শয্যা রচনা করিয়া বসবাস করিতে লাগিল। এই সুদীর্ঘ পৃথক্ সহবাসে ইহাদের আর কখনও আত্মবিস্মৃতি আসিয়াছিল এমন কোন প্রমাণ নাই। ইহা কি সম্ভব ও স্বাভাবিক? শান্তি গাহিয়াছে "এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?" কিন্তু তাহার ব্যবহারে যৌবনের বিশিষ্ট তরঙ্গের ক্ষীণতম উচ্ছ্বাসেরও পরিচয় নাই। শান্তির বাহুতে বল আছে, মনে শক্তি ও সাহসের অভাব নাই, কিন্তু ইহাদের সঙ্গে যে প্রণয়ভীরু, স্বামিসঙ্গলোলুপ, আর্ত্ত রমণীহৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়া থাকিবে তাহার পরিচয় উপন্যাসে কোথাও নাই। নরনারীর মধ্যে যে বিশিষ্ট আকর্ষণ প্রণয়-বিরহ-মিলনের সৃষ্টি করে জীবানন্দ ও শান্তির জীবনে নিশ্চয়ই তাহা সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাহা না হইলে ইহাদের একত্র থাকা অর্থহীন হইয়া পড়ে। অথচ শান্তি বলিতেছে, "ইহকালের জন্য যে বিবাহ, মনে কর, তাহা আমাদের হয় নাই।" নরনারীর আকর্ষণ—ইহা কি মনে করা না করার উপর নির্ভর করে? ইহকালের সম্পদ্ যদি এত তুচ্ছই হয়

মানানসই কিনা তাহার আলোচনা অবান্তর; ১১৭৬ সালে ভরুইপুর, পদচিহ্ন ও আনন্দমঠের সমাজে তাহার পরুষতা সম্পূর্ণরূপে শোভন। শান্তির চরিত্র অনন্যসাধারণ, কিন্তু অস্বাভাবিক নহে। বিপ্লবের সময়ের অনন্যসাধারণ চরিত্রের সমধিক বিকাশ হইয়া থাকে। কল্যাণীর অন্তরালে রহিয়াছে; শান্তি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে।

তাহা হইলে তাহাকে অবলম্বন করিয়াই পরকালকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য এই ঐকান্তিক চেষ্টা কেন? শান্তি যে যুক্তির সাহায্যে জীবানন্দকে লইয়া হিমালয়ে চলিয়া গেল তাহা আরও কৌতুকজনক। পুনরুজ্জীবিত হইয়া জীবানন্দ মাতৃসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে চাহিলে শান্তি বলিল, "তাহাতে তোমার আর অধিকার নাই—কেননা, তোমার দেহ মাতৃসেবার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছ। যদি আবার মার সেবা করিতে পাইলে, তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত কি হইল?...... আমরা আর গৃহী নহি; এমনই দু'জনে সন্ন্যাসী থাকিয়া চির ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব।" যদি চিরব্রহ্মচর্য্য পালনই ইহাদের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে পরস্পরের সান্নিধ্যের প্রয়োজন কি? স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রায়শ্চিত্ত হইল স্ত্রীর সঙ্গে চিরকাল একত্র বসবাস! এই প্রকারের যুক্তি আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর মাত্র।

'আনন্দমঠ' সম্পর্কে দুইটি প্রশ্নের আলোচনা করিতে হইবে যাহাদের সঙ্গে সাহিত্য অপেক্ষা বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের সংযোগ নিবিড়তর। প্রথম প্রশ্ন হইল সত্যানন্দের দেশভক্তি লইয়া। এই প্রশ্নটি নানাভাবে উঠিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে সত্যানন্দের মধ্যে যে জাতীয়তার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নিতান্ত আধুনিক কালের বস্তু; ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় এইরূপ অনুভূতি বা চেষ্টা সম্ভব হইতে পারে না। তখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইতে পারিত, কিন্তু "দেশ বাদ দিলে আমরা অনন্যমাতৃক"—এইরূপ মনোভাব তখনকার কালের লোকের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে সত্যানন্দের মধ্যে প্রকৃত দেশভক্তি ছিল না; তিনি হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুরাজত্বের

পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেন।* সন্তানগণ নিজেদের বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত করিতেন এবং সত্যানন্দ স্বয়ং বলিয়াছেন, "......কেবল মুসলমানেরা ভগবান বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাহি।" এই দুইটি আপত্তি পরস্পরকে খণ্ডন করে। সত্যানন্দকে বঙ্কিমচন্দ্র যে বিশেষভাবে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী করিয়াছেন তাহা কেবল কালধর্ম্মের খাতিরে। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু স্বজাতিবৎসল ছিলেন না; তিনি ঔপন্যাসিকও বটে। তিনি যে সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন তখন মুসলমান রাজশক্তি অতিশয় অসমর্থ। তখন বিদ্রোহ বুঝাইতে মুসলমান রাজার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ বুঝাইতে পারে এবং তখনকার বিদ্রোহী মুসলমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকে একত্র করিয়া দেখিবে ইহাই স্বাভাবিক। সত্যানন্দের হৃদয়ে স্বাদেশিকতা ও স্বধর্ম্মানুরাগের যে মিলন দেখিতে পাই তাহাই উপন্যাসখানিকে সম্পূর্ণ বাস্তবানুগামী করিয়াছে।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বাধিক প্রচলিত অংশ "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত। এই সঙ্গীতের অর্থ ও ভারতের জাতীয় সাধনার সহিত ইহার সংযোগ লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। প্রথম কথা হইতেছে—কে ইহা রচনা করিয়াছিল? এই সঙ্গীত "আনন্দমঠের প্রত্যেক সন্তানের কণ্ঠে" রহিয়াছে; কিন্তু উপন্যাস মধ্যে সম্পূর্ণ সঙ্গীতটি গান করিয়াছেন ভবানন্দ। কিন্তু ভবানন্দ এই গান

* "........The essence of the story is a Hindu revival, necessitating the overthrow of the enemies of Hinduism." Ronaldshay.

এই মত যে কত ভ্রান্ত তাহা পূর্ব্বেই বিস্তারিত ভাবে দেখান হইয়াছে।

রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সত্যানন্দ মঠের মন্ত্রদাতা, তবু তিনিও এই গান রচনা করিয়াছেন এমন কোন প্রমাণ নাই। যদি ইহা তাঁহার নিজের রচনা হইত তাহা হইলে কোন না কোন উপায়ে তাহার উল্লেখ থাকিত। সত্যানন্দ "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রকে তাঁহার বুদ্ধি অনুসারে কার্য্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন মহাপুরুষ চিকিৎসক ; এই মন্ত্র তিনি সেই মহাপুরুষের নিকট হইতেই পাইয়া থাকিবেন। অথবা ইহাও হইতে পারে যে জাতীয় সঙ্গীত জাতির সম্পত্তি ; জাতির মধ্যে আপনা হইতেই ইহার উদ্ভব হইয়াছে। ইহার রচয়িতা অন্য যেই হউক, সত্যানন্দ ও ভবানন্দ যে নহেন তাহা সহজেই অনুমেয়। সমস্ত উপন্যাসটি পড়িলে ইহাই মনে হয় যে এই মন্ত্রের প্রেরণা আসিয়াছে মঠের বাহির হইতে। তাঁহারা শুধু ইহাকে নিজেদের বিশ্বাসানুরূপ অভিব্যক্তি দিয়াছেন। তাঁহারা জীবন পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যানন্দের ভক্তি অসম্পূর্ণ ; তিনি কর্ম্মকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরোদ্দিষ্ট করিতে পারেন নাই। তাঁহার জ্ঞানও খুব অস্পষ্ট ; তাই তাঁহার অভিযান হইয়াছে খণ্ডিত।

মূল গান ও সত্যানন্দের ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য যে কত গুরুতর একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। সঙ্গীতের মধ্যে যে দেশমাতার পরিকল্পনা আছে তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে "দ্বিসপ্তকোটীভুজৈধৃর্তখরকরবালে" বলিয়া এবং তাঁহাকে বন্দনা করা হইয়াছে শ্যামলা সুস্মিতা ভূষিতা ধরণী ভরণী মাতৃমূর্ত্তিতে। কিন্তু সত্যানন্দ সন্তানধর্ম্মের উপাসক এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের তিনি এক স্বকীয় ব্যাখ্যা

দিয়াছেন। তিনি মন্দিরে যে মাতৃমূর্তি গড়িলেন তাহার মধ্যে তাঁহার নিজস্ব ধর্মের বৈশিষ্ট্য রহিয়া গেল। এই পূজা আবেগময়, শক্তিময় কিন্তু অজ্ঞানের জন্য অসম্পূর্ণ। তিনি বৈষ্ণব, তাই তাঁহার মাতা বিষ্ণুর অঙ্কোপরি স্থাপিতা, এই মাতৃমূর্তি দশভুজা গৌরী; দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালা, শ্যামলা, ধরণী, ভরণী নহে। এই মাতা "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের মাতা নহে, সত্যানন্দের পরিকল্পনা। "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের মাতা দেশ ও দেশের সন্তান হইতে অভিন্ন। তিনি শস্যশ্যামলা মলয়জশীতলা আবার 'কোটি কোটি কণ্ঠের নিনাদে ভয়ঙ্করী'। কিন্তু সত্যানন্দের মাতা রহিয়াছেন দেশ ও দেশের সন্তান হইতে বহু দূরে। তিনি শত্রুবিমর্দ্দিনী, জগদ্ধাত্রী, তাঁহার চতুর্দ্দিকে জ্ঞান ও সিদ্ধির প্রতীক রহিয়াছে। কিন্তু তিনি দেশের রক্ষয়িত্রী হইলেও তাঁহাকে দেশের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

সত্যানন্দ মাতাকে গৌরী, নারায়ণী বলিয়া পূজা করিয়াছেন, এবং 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে দুর্গার উল্লেখ আছে। ইহা হইতে কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন যে, যে মাতাকে বন্দনা করিব তাঁহার সঙ্গে দুর্গার কোন বিশেষ সাদৃশ্য বা সম্পর্ক থাকিতে পারে। এই সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। দুর্গার উল্লেখের পরই দেখিতে পাই,

কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং।

ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে তিনি বিশেষ কোন দেবতা নহেন তাঁহার মধ্যে মিলিত হইয়াছে দুর্গার শক্তি, কমলার ঋদ্ধি ও সরস্বতীর জ্ঞানের ঐশ্বর্য্য। তিনি তিলোত্তমার মত নূতন সৃষ্টি, সকল দেবতার গুণ

তাঁহার মধ্যে আছে, কিন্তু তিনি কাহারও মধ্যে আপনাকে বিলীন করেন নাই।

কবির প্রতিভা স্বকীয় সম্পদ্। কিন্তু তাঁহার প্রকাশ হয় সর্ব্বজন-গ্রাহ্য রূপকের মধ্য দিয়া। শব্দ, সুর ও মূর্ত্তি—ইহা সকলের সামগ্রী, কবি ইহাদিগকে গ্রহণ করেন এবং ইহাদের মধ্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার করেন। শেক্সপীয়র তাঁহার নাটকের প্লট অপরের গল্প হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নিষ্ঠাবান্ খ্রীষ্টান ছিলেন কিন্তু তিনি তাঁহার মত প্রচার করিবার জন্য গ্রীক্ কিংবদন্তীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেলী ছিলেন বিদ্রোহী কবি; গ্রীক্ সভ্যতা ও সাহিত্যে সাধারণতঃ দৈবের প্রতি অবিচলিত ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু শেলী গ্রীক্ কিংবদন্তী গ্রহণ করিয়া তাহাকে বিদ্রোহমন্ত্রের বাহন করিয়াছেন। তাঁহার প্রমেথিয়ুস গ্রীক্ প্রমেথিয়ুস হইতে ভিন্ন, কিন্তু তবু তিনি প্রমেথিয়ুস-সম্পর্কিত কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতে বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকার মূর্ত্তি আঁকিতে চাহিয়াছেন। এই মূর্ত্তির পরিকল্পনা তাঁহার নিজস্ব, কিন্তু ইহার রূপকে স্পষ্ট করিতে তিনি হিন্দুর দেবদেবী-বিষয়ক বিশ্বাসের সাহায্য লইয়াছেন, কারণ এই বিশ্বাস এদেশে এত প্রচলিত যে ইহার দ্বারা তাঁহার মত বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিবে। এই মাতার মধ্যে হিন্দুর দেবদেবীর সকল গুণের সম্মিলন হইয়াছে; যাঁহারা এই সকল দেবদেবী-পূজার সহিত পরিচিত তাঁহারা সহজেই সেই কল্পনার সাহায্যে এই সকল গুণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন, কিন্তু এই সাদৃশ্য মাতার পক্ষে গৌণ। সঙ্গীতে ছাব্বিশটি ছত্র আছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম আঠার ছত্রে মাতার

নিজস্ব মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। পরে সেই মূর্ত্তিকে অধিকতর স্পষ্ট করিয়াছেন তিনটি দেবীর সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য দেখাইয়া। কিন্তু তিনি ইঁহাদের কাহারও সঙ্গে অভিন্ন নহেন, তাহা হইলে তিন বিভিন্ন মূর্ত্তির উল্লেখ থাকিত না। আর ইঁহাদিগকে একত্র করিয়া কল্পনা করিলেও মাতৃমূর্ত্তি সম্পূর্ণ হয় না। কারণ মাতা দেশের প্রতীক, দেশের শ্যামল রূপ, দেশের সন্তানের আশা, বল, ধর্ম্ম ও মর্ম্মের মূলে রহিয়াছেন এই অমলা, অতুলা, শস্যশ্যামলা মাতা।

'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের বিরুদ্ধে বহু আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন ইহা সংস্কৃতগন্ধী, কেহ বলিয়াছেন ইহা পৌত্তলিকতা-দোষদুষ্ট, কেহ বলিয়াছেন ইহা হিংসাপরায়ণতার পরিচায়ক। তবু ইহা সর্ব্বসময়ে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়াছে, ইহার মধ্যে যে প্রেরণা ও আবেগ রহিয়াছে তাহা সকল প্রকারের সমালোচনাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। ইহার আকর্ষণের মূল কোথায়? আমাদের চিত্ত এত সহজে ইহার ঝঙ্কারে ও চিত্রসৌন্দর্য্যে সাড়া দেয় যে ইহার বিশ্লেষণ প্রায় অসম্ভব এবং হয়ত সর্ব্বাপেক্ষা নিখুঁত বিশ্লেষণেও ইহার মাধুর্য্য ধরা পড়িবে না বরং সেই মাধুর্য্য বিকৃত ও অপমানিত হইবে। তবু বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে এই সঙ্গীতের রস কোন্ মূলদেশ হইতে উৎসারিত হইয়া জনসাধারণের মন প্লাবিত করিয়াছে। শ্রেষ্ঠ জাতীয় কাব্য বিচার করিলে দেখা যাইবে যে সাধারণতঃ ইহারা দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। কোন কোন কাব্যে দেখি মাতার অপ্রতিরোধনীয় আকর্ষণের উপরে জোর দেওয়া হইয়াছে। দেশের সন্তানগণ নানা অবস্থায় নানা কাজে ব্যস্ত আছে, দেশের দাবী

সম্পর্কে তাহারা প্রায় অচেতন। কিন্তু দেখা যায় সহসা এমন এক আহ্বান আসিয়া উপস্থিত হইল যাহার কাছে অন্য সকল ধ্যান ধারণা ধর্ম্ম কর্ম্ম তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। যে মাতাকে কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই, যাহার দাবী ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিপন্থী তাঁহার মন্ত্র শিরোধার্য্য করিতেই হইবে, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই, তাঁহার আহ্বান মানুষকে ক্ষুদ্র লাভ ক্ষতি বিচারের বহু উর্দ্ধে লইয়া যায়। এই শ্রেণীর কাব্যের প্রধান লক্ষ্য মাতার রূপ নহে, তাঁহার অনিবার্য্য আকর্ষণ। আয়র্ল্যাণ্ডের জাতীয় কবি ইয়েট্‌স্‌ এই শ্রেণীর কাব্যের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা। Cathleen ni Houli Han সুন্দরী নহেন, সবলা নহেন, তিনি জোর করেন না, কিন্তু তিনি উপস্থিত হইবামাত্র আয়র্ল্যাণ্ডবাসীদের সকল কাজ থামিয়া যাইতেছে, সকল প্রচেষ্টা শান্ত হইতেছে ; অন্য সকল চিন্তা স্তব্ধ হইয়া আসিতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা অন্যপথে চালিত হইয়াছে। তিনি মাতার পরিপূর্ণ রূপ আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন—সেই বিশাল বিস্তীর্ণ মাতৃ-মূর্ত্তিতে সকলের জাতীয়তা লীলায়িত হইবে। দেশমাতার জল, ফল, কুসুম ও দ্রুমদলের শোভা—এই সকলই তাঁহার রূপের উপাদান। তাঁহার রূপ শুধু নয়নাভিরাম নহে, তিনি সুমধুরভাষিণী ; তিনি সুখদা ও বরদা। যাহাদিগকে তিনি সুখ ও বর দান করেন তাহাদের নিকট হইতে তিনি দূরে থাকেন না। তিনি শস্যশ্যামলা ধরণী, কিন্তু দেশের সন্তানের সহিতও তিনি অভিন্ন। তাহাদের কণ্ঠের কলকলনিনাদে তিনি ভীমা, তাহাদের হস্তস্থিত কৃপাণ তাঁহাকে বল দান করিয়াছে ; তাহাদের কণ্ঠই তাঁহার কণ্ঠ, তাহাদের বাহুই

তাঁহার বাহু; তিনি তাহাদিগকে শক্তি দিয়াছেন, আবার তাহাদের সঞ্চীয়মান শক্তিই তাঁহাকে বীর্য্যশালিনী করিতেছে। প্রকৃতির শোভা তাঁহাকে শ্যামল কোমলতা দান করিয়াছে, কিন্তু কোটি কোটি সন্তানের শক্তি তাঁহাকে শত্রুবিমর্দ্দিনী করিয়াছে। তিনি দেশ ও দেশের সন্তানের মধ্যে বিলীন হইয়া আছেন। তিনি তাহাদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত; কিন্তু তিনি তাহাদের অপেক্ষা অনেক বড়। সন্তানগণ যে অন্য দেবীর পূজা করে সেই পূজা তাঁহারই প্রাপ্য, কারণ দেবতারা তাঁহার খণ্ড অংশ মাত্র। কিন্তু তবু তিনি অতুলনীয়া, কারণ তিনি শুধু মন্দিরের দেবতা নহেন, তিনি ধরণী, তাঁহার শ্রী আসিয়াছে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র হইতে, তাঁহার ভূষণ সকল নরনারীর শক্তি, ধর্ম্ম, ভক্তি ও আকাঙ্ক্ষা। তাঁহার সত্তা বহু বিস্তীর্ণ, কিন্তু তিনি একক, কারণ তিনি সকলের মাতা। দেশলক্ষ্মীর এইরূপ পরিপূর্ণ সমগ্র মূর্ত্তি কোন দেশের সাহিত্যে কেহ আঁকিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাই এই সঙ্গীত সকল সমালোচনাকে অতিক্রম করিয়া নরনারীর হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মনে হয় বিরুদ্ধ সমালোচনাও কোটি কোটি কণ্ঠের করাল নিনাদের অংশ মাত্র।

(২)

'দেবীচৌধুরাণী'তে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের একটি দিকের অভিব্যক্তি দিতে চাহিয়াছেন এবং সেই অভিব্যক্তির জন্য বাঙ্গালার ইতিহাসের সাহায্যও গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই উপন্যাসের সর্ব্বাপেক্ষা সার্থক চিত্র—ধর্ম্মতত্ত্বের বা ইজারাদারের অত্যাচারের নহে, হিন্দুর

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের। কেমন করিয়া প্রতিবেশীরা দল পাকাইয়া নিরপরাধ বিধবাকে বিপন্ন করিতে পারে এবং কেমন করিয়া সেই প্রতিবেশীরাই প্রকৃত সঙ্কটমুহূর্ত্তে নিজেদের দোষ স্বীকার করিয়া নিরুপায় যুবতীর সাহায্যার্থে অগ্রসর হয় তাহার বর্ণনা অতিশয় প্রত্যক্ষ হইয়াছে। অন্যান্য ঘটনার বর্ণনায় ও গার্হস্থ্যজীবনের চিত্রেও এই বাস্তবপ্রিয়তাই আমাদিগকে সমধিক আকৃষ্ট করে। দুর্লভ চক্রবর্ত্তী ফুলমণি, সাগরবৌ, নয়ানবৌ, তাহাদের শাশুড়ী, মায় ব্রহ্মঠাকুরাণী—ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের নীচতা, দুর্ব্বলতা, স্নেহশীলতা ও মাধুর্য্য প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চিত্র—হরবল্লভ রায় ও তাঁহার পুত্র ব্রজেশ্বর। হরবল্লভ নরাধম, ব্রজেশ্বর ভাল মানুষ; কিন্তু ইহারা কেহই অনন্যসাধারণ নহে। প্রথমে হরবল্লভের কথাই আলোচনা করা যাক্। হরবল্লভ পাপাত্মা, কিন্তু পাপের যে প্রলয়ঙ্কর পৈশাচিক মূর্ত্তি কাপালিক, পশুপতি, গুরগন্ খাঁ অথবা হীরাদাসীতে দেখিতে পাই হরবল্লভে তাহার প্রকাশ হয় নাই। হরবল্লভ স্বার্থান্বেষী, অপবাদভীরু; তিনি গায়ে পড়িয়া কাহারও ক্ষতি করেন না, কিন্তু বিন্দুমাত্র স্বার্থের জন্য পরের প্রতি অবিচার বা অত্যাচার করিতে তাঁহার মনে দ্বিধার সঞ্চার হয় না। তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান শুধু সমাজের কাছে সুনাম রক্ষার চেষ্টা ও কলঙ্কভীতির আকারে প্রকাশ পায়। প্রফুল্লের সঙ্গে তিনি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা অতিশয় নির্ম্মম। কিন্তু তিনি যে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন সেইখানে নারীর কোন বিশিষ্ট মূল্য নাই। অসহায় বিধবার কলঙ্ক ভিত্তিহীন কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিবার মত সাহস ও সহৃদয়তা তাঁহার নিকট

প্রত্যাশা করা যায় না। সেই সমাজে পুরুষের একাধিকবার দারপরিগ্রহ নিন্দনীয় নহে। সুতরাং তিনি নিঃসঙ্কোচে কৃতদার পুত্রের জন্য পাত্রী অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহার যতই নিন্দনীয় হউক অসাধারণত্বের পরিচয় দেয় না। দেবীরাণীকে ধরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা এবং শেষে বিপাকে পড়িয়া যে কোন প্রস্তাবে সম্মত হওয়া, প্রফুল্লকে গ্রহণ করা কিন্তু নূতন বৌ বলিয়া প্রচলিত করা—তাঁহার সকল ব্যবহারেই একটি সঙ্কীর্ণমনা, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি লোকের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জাতীয় লোক কাছের জিনিষকে বড় করিয়া দেখে এবং ইহাদের কাছে নিজের সামান্য স্বার্থের তুলনায় পরের মঙ্গলের কোন মূল্য নাই। এই জাতীয় সঙ্কীর্ণমনা লোকই সমাজভীত; আবার ইহাদের দুর্ব্বলতাই উৎপীড়নশীল সমাজশক্তির প্রধান অস্ত্র। হরবল্লভ কোন কাজের নৈতিক দিক্ বিচার করেন না। তাঁহার অন্তরের মধ্যে কখনও সুমতি-কুমতির সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই; তাঁহার কাছে কোন লোকের বা ঘটনার নিজস্ব কোন মূল্য নাই, প্রত্যেক জিনিষকে বিচার করিতে হইবে লাভক্ষতি বা যশ ও অপবাদের দিক্ হইতে।

ব্রজেশ্বর হরবল্লভের মত পাপিষ্ঠ নহে; কিন্তু তাহার চরিত্রেও কোন অনন্যসাধারণত্ব নাই; তাহার ভালমানুষি সঙ্কীর্ণদৃষ্টির পরিচায়ক। সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া স্বীয় মনুষ্যত্বকে স্বাধীনতা দিতে পারে নাই। সামাজিক বিধিনিষেধ ও তাহার অন্তরাত্মার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সর্ব্বদা লুকোচুরি চলিয়াছে; যেখানে সেই আলো ও ছায়ার লুকোচুরি থামিয়া গিয়াছে, সেইখানেই ব্রজেশ্বরের চরিত্র অতি-নাটকীয় বলিয়া মনে হইয়াছে। ব্রজেশ্বর পিতার আদেশে প্রফুল্লকে

ঘরের বাহির করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু যে যুবতীকে বিবাহ করিয়া আপনার করিয়া লইবার পূর্ব্বেই সে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার সম্পর্কে তাহার মনে অদম্য কৌতূহল সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে; তাহার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ এবং প্রথম প্রেমের অপরাজেয় নবীনতা ও অতলস্পর্শগভীরতায় সে আত্মহারা হইয়াছে। প্রফুল্লকে সে ঘরে ডাকিয়া আনিতে পারে নাই, কিন্তু লুকাইয়া দেখিতে গিয়াছে। সাধারণতঃ সে জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু দেবীচৌধুরাণীর রূপ, সৌজন্য ও সহৃদয়তায় বিবশ, বিহ্বল হইয়া সে দেবীর অশ্রুনিষিক্ত বিম্বাধরে অসংযমের চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে; আবার পরমুহূর্ত্তেই লজ্জিত হইয়া দেবীর সংস্পর্শ হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। প্রফুল্ল ডাকাত—এই সংবাদে তাহার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই ডাকাতের টাকা গ্রহণ করিয়া পিতাকে রক্ষা করিতে তাহার কুণ্ঠাবোধ হয় নাই। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লের সত্য পরিচয় পিতামাতার নিকট হইতে গোপন করে নাই, কিন্তু পিতা যে বাহিরে নূতন বৌয়ের কথা প্রচার করিলেন ব্রজেশ্বর সেই মিথ্যা অম্লান বদনে স্বীকার করিয়া লইল। ব্রজেশ্বর সকল সময়ে "পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম" মন্ত্র কার্য্যে পরিণত করিতে যাইয়া পদে পদে ভুল করিয়াছে, নিষ্ঠুরতার পোষকতা করিয়াছে, কখনও অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। কিন্তু সংসারের গতি বিচিত্র। এই অতি সাধারণ লোকটিই হরবল্লভকে দেবীসিংহের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে আর দস্যুনেত্রী দেবীচৌধুরাণীর অন্তরালে একটি কোমল প্রেমবিহ্বল রমণীহৃদয় জাগাইয়া তুলিয়াছে।

এই সকল চরিত্র যতই কৌশলের সহিত অঙ্কিত হউক না কেন

মোটের উপর 'দেবীচৌধুরাণী'কে উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাস বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যে Culture বা নিষ্কাম ধর্ম্ম গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু তাহার চিত্র অতিশয় অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে চাহেন যে প্রফুল্ল ভবানী পাঠকের নিকট যে যোগ ও নিষ্কামধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিল তাহা সে সংসারের কাজে নিয়োজিত করিয়া নিজে সুখী হইল ও পরকে সুখী করিল। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে প্রফুল্লের গৃহধর্ম্ম পালনই উপন্যাসের প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়ায়; ইহার পূর্ব্বের অংশ উপক্রমণিকা মাত্র। অথচ এই তথাকথিত প্রধান অংশ বর্ণিত হইয়াছে মাত্র দুইটি অধ্যায়ে (দ্বিতীয় খণ্ড—ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে)। এইখানেও শুধু এক বাসনমাজা ও দেবীনিবাস নির্ম্মাণ ছাড়া এই অভিনব গৃহধর্ম্মের কোন প্রত্যক্ষ চিত্র পাই না। প্রফুল্লের নিষ্কামধর্ম্ম ও সাগর বৌয়ের গৃহস্থালীর মধ্যে কি মৌলিক প্রভেদ রহিয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রফুল্লের চরিত্রের কোন স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ চিত্র আঁকা হয় নাই, তাহার কর্ম্মের সারাংশ বর্ণিত হইয়াছে মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন। 'দেবী-চৌধুরাণী'তেও তিনি ঐতিহাসিক ঘটনার সন্নিবেশ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল ঘটনার সঙ্গে উপন্যাসবর্ণিত কাহিনীর সম্পর্ক খুব নিবিড় নহে। অথচ দেবী সিংহের অত্যাচার, তজ্জনিত অরাজকতা, দস্যুদলের প্রাদুর্ভাব প্রভৃতির বর্ণনা উপন্যাসের অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া বসিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা এইখানে ইতিহাসের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া বিপথগামী হইয়াছে। একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে প্রফুল্লের সঙ্গে ভবানী পাঠকের দলের সংস্রব একেবারেই ঘনিষ্ঠ নহে।

ভবানী পাঠক দস্যুবৃত্তি করিত, দেশ শাসন করিত, উৎপীড়িতকে রক্ষা করিত, উৎপীড়ককে পীড়ন করিত। এই কাজে প্রফুল্ল তাহার বিশেষ কোন সাহায্য করিয়াছিল এমন মনে হয় না। প্রথম খণ্ডের শেষ ভাগে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, "প্রফুল্লের অন্য শিক্ষা হইয়াছে। কর্ম্মশিক্ষা হয় নাই। এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া কর্ম্মশিক্ষা হৌক।" প্রফুল্ল কি কর্ম্ম করিল তাহার কোন প্রত্যক্ষ বর্ণনা নাই। সে বলিয়াছে যে সে ডাকাতি করে নাই, শুধু দান করিয়াছে। যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে মানিতে হইবে ভবানী ঠাকুরের কাজে সে একটা অনাবশ্যক অলঙ্কার মাত্র। ভবানী পাঠক একাধিকবার দোকানদারীর কথা বলিয়াছে; সেই সূক্ষ্মবুদ্ধি রাজনীতিবিশারদ দেবীচৌধুরাণীকেও দোকানদারীর অংশ বলিয়াই মনে করিয়া থাকিবে। শুধু একটি দৃশ্যে দেবীর দরবারের পরিচয় পাই—কিন্তু তাহার রাজদরবার দাতা ও আশ্রিতের সম্মেলন ছাড়া আর কিছুই নহে। রাজা হরিশ্চন্দ্রের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিককাল পর্য্যন্ত বহু বিত্তশালী লোক অর্থ দান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই নিষ্কামধর্ম্মের সুবিস্তীর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। উপন্যাসের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুল্লকে অবতাররূপে কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন :

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

উপন্যাসমধ্যে উল্লিখিত তিনকর্ম্মের একটিরও পরিচয় নাই।

প্রফুল্ল যে অর্থদান করিয়াছে তাহার মধ্যেও নিষ্কাম ধর্ম্মের লক্ষণ সুস্পষ্ট নহে। প্রফুল্ল অর্থ চাহে নাই, ব্রজেশ্বরকে চাহিয়াছিল। সে

কামনা তাহার কোনদিন মনে হয় নাই * তাহা নিরোধ করিতে কোন বিশেষ শিক্ষার দরকার হয় নাই। কিন্তু যেখানে তাহার প্রকৃত কামনা ছিল ভবানীপাঠকের শিক্ষা সেইখানে, পহুছাইতে পারে নাই। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার সময় সে একাদশীতে মাছ খাইত এবং ব্রজেশ্বরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর সে ভবানীকে বলিয়াছে, "আমাকে অব্যাহতি দিন—আমার এ রাণীগিরিতে আর চিত্ত নাই।" অনাবশ্যক আবরণের মত এই রাণীগিরি ফেলিয়া দিয়া সে স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গেল। সুতরাং প্রফুল্লের জীবনচরিত নিষ্কামধর্ম্মসাধনার নিষ্ফলতাই প্রমাণ করে। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্য্যবোধ, ইতিহাসপ্রিয়তা ও ধর্ম্মতত্ত্বের সম্মিলন হইয়াছে, কিন্তু সামঞ্জস্য হয় নাই।

উপন্যাসের আর একটি ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই আলোচনা শেষ করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের বুদ্ধি ও প্রকৃতির লীলার মধ্যে এক অদ্ভুত সমন্বয়ের সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাকৃতিক লীলা বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বরেরই লীলা। প্রফুল্ল যে রক্ষা পাইয়াছে তাহার প্রধান কারণ সময়ে মেঘোদয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে চাহেন যে ইহা ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ; যে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির অনুশীলন করিয়াছে ঈশ্বর তাহার উদ্ধারের পন্থা রচনা করেন। ভগবানের কার্য্য ও তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ। এই বিষয়ে মানুষের মনে যে ধারণা আছে তাহার বর্ণনা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত, কারণ মানবহৃদয়ের

* নিষ্কামধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই প্রফুল্ল ভবানী পাঠককে বলিতেছে: "আমি বড় কাঙ্গাল......আমি ধন চাই না......। এ ধন তুমি সব নাও—আমি নিষ্পাপে যাতে এক মুঠো অন্ন পাই, তাই ব্যবস্থা করিয়া দাও।"

নানা প্রবৃত্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া উপন্যাসের মূল বিষয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মানবমনের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও অনুমানের বর্ণনা দেন নাই। তিনি ঈশ্বরের দুর্জ্ঞেয় কর্ম্মপদ্ধতির সরল, ন্যায়সঙ্গত বিবরণ দিতে চাহিয়াছেন। এই বিবরণ রূপকথা অপেক্ষাও অলীক। অবশ্য ভগবান্ সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় হইলেও প্রকৃতির লীলা আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি এবং তাহার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কও খুব ঘনিষ্ঠ। তবু মনে রাখিতে হইবে প্রকৃতি জড়; আমাদের মত চেতনা তাহার নাই। সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে মানবের সম্পর্ক ও সংঘর্ষ আকস্মিক; সাধুর পরিত্রাণ ও দুষ্টের দমনের দিকে লক্ষ্য করিয়া ঝড় উঠে না, বৃষ্টি পড়ে না বা সূর্য্য আলো দেয় না। বরং প্রকৃতিকে নিরপেক্ষ বলিয়া মনে হয়—ভূমিকম্প ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক বিচার করে না; ফুলের গন্ধ ও পাখীর গান সকলকেই মুগ্ধ করে। এইকারণে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক চেতনের সঙ্গে অচেতনের সম্পর্ক—জটিল ও রহস্যময়। বঙ্কিমচন্দ্র যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার মধ্যে অনির্দ্দেশ্য, অস্পষ্ট, সঙ্কেতময় কিছুই নাই। প্রকৃতি যেন পূর্ব্ব হইতেই এমনভাবে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল যে প্রত্যেকপদে প্রফুল্লের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। প্রফুল্লের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই যেন প্রকৃতি তাহার কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এইরূপ কল্পনা ঈশ্বরের গভীর বিশ্বাসের পরিচয় দেয় কিন্তু মানবজীবনের গতিবিধি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার প্রমাণ দেয় না।

(৩)

'সীতারাম' উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার বিস্তৃতি ও ঘটনাবহুলতা। গ্রন্থমধ্যে তিনটি গল্পের সন্নিবেশ হইয়াছে। প্রধান কাহিনী সীতারাম ও শ্রীর বিচিত্র দাম্পত্যজীবনকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সীতারাম শ্রীর প্রতি আসক্ত হইয়াছে, শ্রী সীতারামকে ভালবাসিয়াছে কিন্তু জয়ন্তীর সন্ন্যাসধর্ম্ম তাহাকে বৈরাগ্যের পথে চালিত করিয়াছে। সীতারামের শ্রীর প্রতি আসক্তির সঙ্গে হিন্দুর রাজ্যস্থাপন চেষ্টা জড়িত হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বের কালে হিন্দুরা বিধর্ম্মী শক্তির পীড়ন অনুভব করিয়াছে, বিদ্রোহ করিয়াছে, আবার এক মাতৃভূমির সন্তান বলিয়া শাসক ও শাসিত সম্প্রদায় সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। মুসলমান ফৌজদার, হিন্দু জমিদার, সাধারণ হিন্দু প্রজা এবং ইহাদের কলহবিগ্রহ ও সন্ধি—উপন্যাসে প্রোজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের এই যুদ্ধের অন্তরালে আরও একটি ক্ষুদ্র, পঙ্কিল প্রণয়কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। গঙ্গারাম এই কাহিনীর নায়ক। এই অবৈধ প্রণয় নিরবচ্ছিন্ন ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করিয়াছে। গঙ্গারাম নিহত হইয়াছে ; রমাও রক্ষা পায় নাই। এই তিনটি আখ্যায়িকার সমাবেশের ফলে বহু অপ্রধান চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। তাহারা উপন্যাসের প্রয়োজনে আসিয়াছে, আবার সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া যবনিকার অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু অল্প পরিসরের মধ্যে ইহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মুরলার ক্ষুদ্রতা, লুব্ধতা ও তেজস্বিতা, যমুনার বুদ্ধিতে অর্থনীতি ও নীতির অদ্ভুত সামঞ্জস্য, তাহার চালচলনে প্রাচীনতা ও নবীনতার সমন্বয়, রাজবৈদ্যদের অপরিসীম আত্মসম্মান

বোধ, চন্দ্রচূড়ের ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র তেজ, চাঁদশাহ ফকীরের প্রসারিত দৃষ্টি—মানবচরিত্রের এইরূপ নানা রহস্য ও বৈচিত্র্যে এই উপন্যাসখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে।

শুধু ইহাই নহে। বিরাট্ যুদ্ধবিগ্রহ কেমন করিয়া ক্ষুদ্র লোকের জীবনে প্রতিফলিত হয় শ্যামচাঁদ ও রামচাঁদের কথোপকথনে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এইখানে স্কট্‌প্রবর্ত্তিত রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। স্কট্ নিম্নশ্রেণীর লোকদের জীবনযাত্রার সম্পূর্ণাবয়ব-চিত্র আঁকিতেন। ইতিহাস উচ্চনীচনির্ব্বিশেষে সকলকে প্রভাবান্বিত করে। স্কটের উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রার যে সাদৃশ্য দেখা যায় তাহা অতি সহজ, অনায়াসলব্ধ বলিয়া মনে হয়। শ্যামচাঁদ ও রামচাঁদ সম্পর্কে সে কথা খাটে না। তাহাদের নিজেদের জীবনযাত্রার যে পরিচয় পাই তাহা অতি সামান্য; যেন টিপ্পনী করিবার জন্যই তাহারা উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন বিক্ষুব্ধ জনতার কার্য্যকলাপের বর্ণনায়। জনতার প্রধান গুণ তাহার রসবোধ; সে এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে যাহার সঙ্গে তার্কিকের বিচার ও আঙ্কিকের হিসাবের সম্পর্ক নাই। জনতা জড় হয় তামাসা দেখিতে; তারপর অবস্থা বুঝিয়া সময়োপযোগী ব্যবস্থা করে। সেই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এই যে কে প্রথম আরম্ভ করিল তাহার স্থিরতা নাই, কোথায় মন্ত্রণা, কোথায় উদ্যোগ, কোথায় সমাপ্তি তাহার নিশ্চয়তা নাই। অথচ সর্ব্বশেষে দেখা যায় যে জনতার কার্য্য সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত। গঙ্গারামকে জীয়ন্তে

সমাধিস্থ করার যখন বন্দোবস্ত হইতেছিল এবং সীতারাম যখন তাহার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছিলেন তখন সম্মিলিত জনসমুদ্র স্তব্ধ হইয়া ছিল। যেই গঙ্গারাম পলাইয়া গেল ও সীতারাম তাঁহার অনুচরবর্গকে ইঙ্গিত করিল, অম্নি যাহারা তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল তাহারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া "মার, মার" করিয়া আকাশ প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া মুসলমানদিগকে মারিয়া হটাইয়া দিল। গঙ্গারাম ও জয়ন্তীর বিচারের দৃশ্যে জনতার সংহত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। জনসাধারণের সম্মিলিত আশ্বাসবাণীই রমাকে সাহস দিয়াছিল এবং তাহাদের সমর্থনের জন্যই নন্দা জয়ন্তীকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। অথচ ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে কোন পরামর্শ বা বন্দোবস্ত ছিল না। বিদ্যুতের বেগে জনতা আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লয় এবং বজ্রের বেগে সে আপনার শক্তি সঞ্চারিত করে।

'সীতারাম' উপন্যাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষের চিত্র আঁকা হইয়াছে। মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে হিন্দুপ্রজা কেমন করিয়া সংঘবদ্ধ হইত এবং কি ভাবে সেই সংহতি নষ্ট হইত তাহার জীবন্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ করিয়া হিন্দুদের কথা লিখিয়াছেন এবং এই উপন্যাসের সর্ব্বাধিক প্রচারিত কথা হইতেছে সীতারামের কাছে শ্রীর প্রার্থনা। শ্রী স্বামীর কাছে স্ত্রীর দাবী জানায় নাই, হিন্দুর কাছে হিন্দুর প্রাপ্য চাহিয়াছে। "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?" * উপন্যাসের আরম্ভ

---

* এই উপন্যাসে নিসর্গরূপ ও স্থাপত্যশিল্পের যে বর্ণনা আছে তাহার মধ্যে ও হিন্দুর প্রতি এই অনুরাগের চিহ্ন আছে। উড়িষ্যার পাহাড় ও নদী সুন্দর, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের

ও হইয়াছে ফকীর ও কাজীর অত্যাচারের বর্ণনা দিয়া। এইখানেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রসারিত দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সামাজিক জীবনের এক খণ্ডাংশ গ্রহণ করিয়াছেন—সেইখানে সবাই আপনার যোগ্য জায়গা পাইয়াছে, কেহ অনাবশ্যক প্রাধান্য পায় নাই, কোন সম্প্রদায়ের পাপ অতিরঞ্জিত হয় নাই। শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে দুই চার জন এমন লোক থাকিবেই যাহারা সম্প্রদায়ের ক্ষমতার সুবিধা লইয়া অপরধর্মাবলম্বীর প্রতি অত্যাচার করিবে। শাহ্‌ সাহেব এই শ্রেণীর লোক। আবার শাসিতের মধ্যে দুই চার জন থাকিবে যাহারা নিজের স্বার্থের জন্য কৃতঘ্নতা করিতে ও সমাজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। গঙ্গারামের চরিত্র ও কার্য্যকলাপ এই প্রকারের বিশ্বাসঘাতকতার চরম দৃষ্টান্ত। কিন্তু এমনও কেহ কেহ থাকিবেন যাঁহাদের জীবন উচ্চ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত, যাঁহাদের চিত্ত উক্ত পীড়ন ও কৃতঘ্নতা হইতে বহু উর্দ্ধে বিচরণ করে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থের উপরে যে মহান্ সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম আছে ইঁহারা তাহাই সমাজের কাছে প্রচার করেন। এই সার্ব্বজনীন প্রীতির চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র আঁকিয়াছেন একজন মুসলমান ফকীর চরিত্রে। তিনি সীতারামের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু তোরাব খাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই, স্বীয় ধর্ম্মের অন্যথাচারণ করেন নাই। তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেন এবং উভয়ের প্রতি সমদর্শী ছিলেন। সীতারামকে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সীতারামের অনাচার ও অত্যাচার

কাছে এই সৌন্দর্য্য সমধিক মনোহারী হইয়াছে, কারণ এইখানে হিন্দুসংস্কৃতির পরিচয় রহিয়াছে।

দেখিয়া নৌকায় চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় অতিশয় ব্যথার সহিত বলিয়া গেলেন, "যে দেশে হিন্দু আছে, সে দেশে আর থাকিবনা। এ কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।"

আখ্যায়িকার জটিলতা ও বিস্তৃতিতে 'সীতারাম' অনবদ্য হইলেও ইহা উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস নহে। ইহার কেন্দ্রস্থ দুর্ব্বলতা সীতারাম ও শ্রীর চরিত্র। সীতারাম মহানুভব ব্যক্তি। তিনি পরের জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান্, বিবেচক, রাজ শক্তির সঙ্গে কলহ করিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু কলহে প্রবৃত্ত হইয়া অমানুষিক শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়া রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেও তাঁহার অনাবশ্যক গোঁড়ামি নাই এবং নিজের সীমা সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদাই সচেতন। তাই তাঁহার রাজ্যের নাম হইল মহম্মদপুর, তিনি বাদ্‌শাহ হইতে সনন্দ আনিলেন, এবং মুর্শিদকুলিখাঁর প্রাধান্য তিনি মানিয়া লইলেন। এই বিচক্ষণ, সাহসী, কৌশলী বীরপুরুষের হৃদয় রমণীর রূপে মুগ্ধ হইল। এই রমণী তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রী, কিন্তু তাঁহার পক্ষে অপ্রাপণীয়া। যদি সম্পূর্ণরূপে অপ্রাপণীয়া হইতেন তাহা হইলে সীতারাম তাহার কথা ভুলিতে পারিতেন, অন্ততঃ অন্য কাজে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন। কিন্তু শ্রী কাছে আসিয়াও দূরে রহিল, রাজা সর্ব্বদা তাহার নিকটে বসিয়া থাকিতেন, তাহার কথা শুনিতেন, তাহার রূপ দেখিতে পাইতেন কিন্তু তাহাকে পাইতেন না। এইখানে রাজার চিত্ত "বিশ্রাম" লাভ করিতে পারিলনা, বিভ্রান্ত হইল। রাজা শ্রীকে পাইলেন না, কিন্তু রাজ্য হারাইলেন। সীতারামের এই পতনের কাহিনী উপন্যাসের প্রধান বিষয়।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

"সীতারামের চরিত্রে...লেখক এই কথাগুলি উদাহরণের দ্বারা পরিস্ফুট করিতে যত্ন করিয়াছেন।" সীতারাম শ্রীর বিষয় ধ্যান করিতে করিতে তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। আসক্তি হইতে কামনা, কামনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে সম্মোহ, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটিয়াছিল। ক্রোধ, স্মৃতিভ্রংশ ও বুদ্ধিনাশ চরমে পৌঁছিয়াছিল জয়ন্তীকে বেত্রাঘাত করিবার প্রচেষ্টায়।

এই পতনের যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহাতে গীতার বাণীর "উদাহরণ" পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা আর্টের দাবী মিটাইতে পারে নাই—তাহা জীবন্ত নহে। মনুষ্য চরিত্রের প্রধান গুণ তাহার বৈচিত্র্য, রহস্যময়তা ও দুর্জ্ঞেয়তা। যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে কল টিপিয়া দিলে তাহা এক পথে অবিচলিতভাবে অগ্রসর হইবে; যতক্ষণ দম থাকিবে তাহা থামিবেনা বা অন্য পথে যাইবে না। মানুষের মন কখনও একটানাভাবে একই পথে বিচরণ করে না—তাহা দক্ষিণে বামে হেলিবে, অগ্রসর হইতে যাইয়া পশ্চাৎপদ হইবে, পিছু হটিতে যাইয়া সম্মুখের দিকে যাইবে। সীতারামের পতনে এই বৈচিত্র্য নাই। তাঁহার মহানুভবতা ক্রোধ ও বুদ্ধিভ্রংশের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া নিজেকে বিলীন করিয়া দিয়াছিল, আবার বিপদের দিনে ইহা মেঘমুক্ত

সূর্য্যরশ্মির ন্যায় অবিমিশ্র উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইল। এই পতন ও উত্থানে মনুষ্যচরিত্রের জটিলতা বা বর্ণবহুলতার পরিচয় নাই। যে সীতারাম গঙ্গারামকে রক্ষা করিয়াছিলেন আর যে সীতারাম জয়ন্তীকে বেত্রাঘাত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন—ইঁহারা যে একই ব্যক্তি তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে সীতারামের অধঃপতনের চিত্র অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "সীতারাম-চরিত্রের এই ভীষণ পরিবর্ত্তন অদ্ভুত মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দ্বারা আমাদের সম্মুখে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়া ধরা হইয়াছে। সীতারামের এই অধঃপতনের চিত্র সর্ব্বতোভাবে বীর ম্যাক্‌বেথের রক্তপিপাসু পশুতে পরিণতির সহিত তুলনীয় এবং এই চরিত্রবিশ্লেষণে বঙ্কিম সগৌরবে ধর্ম্মতত্ত্বের ক্ষীণতম প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছেন।" ম্যাক্‌বেথের সহিত তুলনা ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তির পোষকতা করে বলিয়া মনে হয় না। ম্যাক্‌বেথ সিংহাসন পাইবার লোভে এবং নিজের ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য বহু পাপ করিয়াছে, কিন্তু তাহার সর্ব্বাপেক্ষা নৃশংস কাজের মধ্যেও একটা গৌরব আছে। অতিথি, প্রতিপালক রাজা ডান্‌ক্যান্‌কে হত্যা করিবার পূর্ব্বে তাহার মনে নানা বাধা জাগিয়াছে, হত্যা করিবার পরে অনুশোচনা ও ভয় তাহাকে পীড়া দিয়াছে। যখন হত্যার পর হত্যা করিয়া তাহার হিংস্রতা চরমে পঁহুছিয়াছে, যখন নিজের স্ত্রীর মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার পাষাণ হৃদয়ে দাগ বসাইতে পারিতেছে না তখনও তাহার কল্পনার সমৃদ্ধি অটুট রহিয়াছে, তাহার চিন্তায় দার্শনিক মনোবৃত্তির ছাপ অক্ষুন্ন রহিয়াছে :

Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time
....
Life's but a walking shadow, ...
....
................................it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.

অবনতির শেষ সীমায় যাহার কল্পনা এত ঐশ্বর্য্যবান্, পরিমাণ বোধ এত সূক্ষ্ম তাহার সঙ্গে সীতারামের তুলনা করিলে সীতারামের চরিত্রের অসম্পূর্ণতা ও তাহার পরিণতির অসম্ভাব্যতাই প্রমাণিত হয়। ম্যাক্‌বেথের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসেই এই সৃষ্টিনৈপুণ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। নগেন্দ্রনাথের চরিত্রে অধঃপতন আসিয়াছিল; তিনিও বিষয়কার্য্যে অমনোযোগী ও অপরের প্রতি উদাসীন হইয়াছিলেন এবং মদ খাইতে সুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অধঃপতন অতিশয় বৈচিত্র্যময়, নিজের অবনতি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন এবং অনিবার্য্য প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করিবার সময়ও তিনি সংযমের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। সীতারাম চরিত্র ধর্ম্মকথার উদাহরণ মাত্র; ইহা শিল্পীর সৃষ্টি নহে।

(শ্রীর চরিত্রেও অনুরূপ অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে। / জয়ন্তীর শিষ্যা ও সীতারামের স্ত্রী—ইহাদের মধ্যে যে প্রভেদ রহিয়াছে তাহা অনতি-

ক্রমণীয়। স্বামী শ্রীকে পরিত্যাগ করিলেও তাহার অনুরাগ ও ভক্তির লাঘব হয় নাই—সে স্বামীর উদ্দেশে ভালবাসা ও সেবা পাঠাইয়া মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছে। তারপর জ্যোতিষগণনার কথা শুনিয়া নিজেই স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়াছে ও সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর কাছে সন্ন্যাস শিক্ষা করিয়াছে। ইহার পর যেদিন আবার স্বামিসন্দর্শনের ডাক আসিল, সেই দিন শ্রীর আর পূর্ব্বের উৎসাহ নাই বরং স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছা আসিয়াছে। সে নিজেই জয়ন্তীকে বলিয়াছে, "যে শ্রীকে ফিরাইবার জন্য তিনি ডাকাডাকি করিয়াছিলেন, সে শ্রী আর নাই—তোমার হাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন আছে কেবল তোমার শিষ্যা। তোমার শিষ্যাকে লইয়া মহারাজাধিরাজ সীতারামরায় সুখী হইবেন কি? না, তোমার শিষ্যাই মহারাজাধিরাজ লইয়া সুখী হইবে?" এই যে অনুরাগিণী স্ত্রী হইতে সন্ন্যাসিনীতে পরিবর্ত্তন—শ্রীর জীবনে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। কেমন করিয়া অদম্য আসক্তি গভীর ঔদাসীন্যে পরিণত হইল, নারী হৃদয়ের সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্যই ঔপন্যাসিক উদ্ঘাটন করিবেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই রহস্যকে একেবারে বাদ দিয়াছেন; বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সংগ্রামকে উপন্যাসের বাহিরে রাখিয়াছেন। পরে 'চিত্তবিশ্রামে' শ্রী যখন অধিষ্ঠিত হইল তখন তাহাকে জীবন্ত রমণী অপেক্ষা অনুভূতিহীন প্রতিমা বলিয়াই মনে হয়। রাজা দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা লইয়া তাহার কাছে সর্ব্বদা উপস্থিত, সে শুধু রাজাকে গীতোক্ত নিষ্কামধর্ম্মের মহিমা শুনাইয়াছে। কাহারও সংযম সম্পূর্ণ নহে, পাষাণেরও ক্ষয় হয়। তাই শ্রীও নিজের উপর আস্থা হারাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সে জয়ন্তীকে বলিয়াছে "পলায়ন ভিন্ন ত উপায়

দেখি না। কেবল রাজার জন্য বা রাজ্যের জন্য বলি না। আমার আপনার জন্যও বলিতেছি।……শত্রু, রাজা লইয়া বারো জন।" ইহার পরই শ্রীর পলায়ন। তাহার হৃদয়ে কেমন করিয়া প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষা পুনরায় সঞ্জীবিত হইল, কেমন করিয়া চির নূতন অথচ চির পুরাতন আবেগ ধর্ম্মবুদ্ধির সঙ্গে বোঝাপাড়া করিতে লাগিল, তাহার কোন চিত্র নাই। অথচ এই পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির সংঘর্ষ ও সমন্বয়ই শ্রীর চরিত্রের গভীরতম রহস্য। বঙ্কিমচন্দ্র এই রহস্যের আভাস দিয়াছেন, কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ করেন নাই। 'দেনাপাওনা'য় ষোড়শীর চরিত্রে শরৎচন্দ্র ভৈরবীর মধ্যে প্রণয়িনীকে জাগ্রত করিয়াছেন এবং নানা সঙ্কটের মধ্য দিয়া ষোড়শীর হৃদয়ের অন্তরতম দ্বন্দ্বের চিত্র আঁকিয়াছেন। 'সীতারাম' উপন্যাসের পরিধি খুব বিস্তৃত; একটি নারীর হৃদয়ের রহস্য যত গভীর ও বিচিত্রই হউক না কেন তাহা প্রকাশ করিবার মত অবকাশ বোধহয় এই উপন্যাসে নাই। তবু মনে হয় আখ্যায়িকার বিস্তৃতি ও জটিলতা এবং ধর্ম্মব্যাখ্যার জন্য নায়ক ও নায়িকার চরিত্র ম্লান হইয়া গিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কমলাকান্তের দপ্তর—মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত—লোকরহস্য

(১)

শোনা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তর'কে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া মনে করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বহু সরস, কৌতুকোজ্জ্বল বর্ণনা আছে, গজপতি বিদ্যাদিগগ্‌জ প্রভৃতি দুই একটি কমিক চরিত্রও আছে, কিন্তু তবু কোন উপন্যাসেই হাস্যরসের প্রাচুর্য্য নাই। উপন্যাসের বৃহত্তর প্রয়োজনের জন্য হাস্যরস স্ফূর্ত্তি পায় নাই। এই বৃহত্তর প্রয়োজনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র আর একটি দাবীকেও অনেক সময় উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি লোকশিক্ষক ছিলেন; কিন্তু নীতিপ্রচারকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাধান্য দিতে পারেন নাই। উপন্যাসের প্রধান উপাদান গল্প ও চরিত্র। আখ্যায়িকাকে সকল দিক্ দিয়া সম্পূর্ণ করিতে হইবে, চরিত্রের গূঢ়তম রহস্যকে প্রকাশ করিতে হইবে। তারপর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে কল্পনার প্রকাশ ও মতের প্রচারের মধ্যে প্রভেদ রক্ষা করা যায় না, সুতরাং যে মতকে কল্পনার সাহায্যে রূপ দেওয়া যায় না তাহা অপ্রকাশিতই থাকিয়া যায়। উপন্যাসের এই অসুবিধা অতিক্রম করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের সৃষ্টি করিয়াছেন। কমলাকান্ত একটি শ্রেষ্ঠ কমিক চরিত্র; সেই দিক্ দিয়া বিচার করিলে কমলাকান্ত অনন্যসাধারণ, কিন্তু তাহার মারফতে বঙ্কিমচন্দ্র মানবজীবন সম্পর্কে বহু মতও প্রচার করিয়াছেন।

কমলাকান্ত ব্যঙ্গপ্রিয়। তাহার অধিকাংশ মত একটা বিশেষ অনুভূতির, একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়। তাহার কথাকে সবসময় বঙ্কিমচন্দ্রের মনের চরম অভিব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা না গেলেও ইহা মানিতেই হইবে যে যে সকল ভাব কমলাকান্তের সাহায্যে প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাদের স্পষ্টতা, উজ্জ্বলতা ও তীব্রতা অনন্যসাধারণ।

কমলাকান্ত কেমন করিয়া হাস্যরসের উদ্রেক করে এবং কেমন করিয়া হাস্যরসের মধ্য দিয়া নিজের অনুভূতি ও মতের জোরাল অভিব্যক্তি দিয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে, হাস্যরসের প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। হাস্যরসের সৃষ্টি হয় নিয়মের ব্যতিরেকে। যখন আমরা দেখি কোন একটি লোক এমন কাজ করিল যাহা সাধারণ মানুষে করিতনা তখন হাস্যরসের অবতারণার অবকাশ ঘটে। অবশ্য নিয়মের যে কোন ব্যতিক্রমেই হাস্যরসের সৃষ্টি হয় না। যাহারা মহৎ তাহারাও অনন্যসাধারণ। হাস্যরসের তখনই সৃষ্টি হইবে যখন আমরা মনে করি যে যাহা অনন্যসাধারণ তাহার মধ্যে কোন সত্য নাই, তাহা মিথ্যার মায়াজালে আচ্ছন্ন। যে নেপোলিয়নকে বীর বলিয়া মনে করে নেপোলিয়নের অনন্যসাধারণত্ব তাহার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে, আর যে মনে করে যে নেপোলিয়নের যুদ্ধকৌশল ডন্‌কুইক্সোটের যুদ্ধকৌশলের মত একটা মোহমাত্র, তাহার মনে নেপোলিয়নের বিচিত্র জীবনকথা শুধু হাসির উদ্রেক করিবে। হাস্যরসের সৃষ্টির জন্য দুইটি ভাবধারার সৃষ্টি করিতে হইবে। যে হাস্যরসিক, তাহার মনে সত্যের অবিকৃত ছবি থাকিবে; আর যে হাস্যরসের রসদ জোগাইবে সে মিথ্যার জাল বুনিবে। হাস্যরসিক

সত্য ও মিথ্যার বৈপরীত্য উপলব্ধি করিয়া আনন্দ ও কৌতুক অনুভব করিবে। শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের প্রধান লক্ষণ এই যে কৌতুকের পাত্র তাহার মোহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন। সে যে কোথায় সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, কোথায় অভ্যস্ত পথ হইতে সরিয়া গিয়াছে, কোথায় বাস্তবের প্রোজ্জ্বল আলোক হইতে মায়ায় অন্ধকারে চলিয়া গিয়াছে সে সম্পর্কে তাহার কোন চৈতন্য নাই। আমরা যখনই কাহাকেও লইয়া কৌতুক করি তখনই লক্ষ্য করি যেন সেই ব্যক্তি আমাদের মনোভাব এবং তাহার অপূর্ণতা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। ঘুমের মধ্যে যাহার মুখে চূণকালি মাখাইয়া দিয়াছি তাহার অদ্ভুত রূপ লইয়া ততক্ষণই মজা করা যায়, যতক্ষণ সে দর্পণের কাছে উপস্থিত হয় নাই।

নিজের সম্পর্কে এই অচৈতন্য মনুষ্যজীবনে অফুরন্ত হাস্যধারার সৃষ্টি করে। সর্ব্বাপেক্ষা সপ্রতিভ ব্যক্তি ও কোন কোন বিষয়ে নিজের সীমা ও দুর্ব্বলতা সম্পর্কে অচেতন এবং তাহা লইয়া তাহার প্রতিবেশী কৌতুক করিয়া থাকে। নিজের সম্পর্কে এই অচৈতন্য অপরূপ স্বপ্নাবেশের সৃষ্টি করে এবং শ্রেষ্ঠ কমিক চরিত্র (যেমন ডন্ কুইক্সোট, পিকউইক্) সম্পর্কে মনে হয় যে তাহারা ঘুমের ঘোরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং তাহারা স্বপ্ন দেখিয়া অপূর্ব্ব মায়াময় জগৎসৃষ্টি করিতেছে। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে গীতিকবিতার সঙ্গে ইহাদের স্বপ্নের সাদৃশ্য আছে। প্রভেদ এই যে গীতিকবি আমাদের মনে একটা মোহাবেশের সঞ্চার করিতে পারে যাহার ফলে আমরা তাহার স্বপ্নের অলীকতার কথা ভুলিয়া যাই। যে দুইটি ভাবধারার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের একটি অপরটিতে মিশিয়া যায়। কিন্তু ডন্‌কুইক্সোট ও পিক্‌উইক যে

মোহমায়ার দ্বারা আবিষ্ট হইয়া পদে পদে ভ্রমে পতিত হইতেছে তাহার অলীকতা সম্পর্কে গ্রন্থকার আমাদিগকে সর্ব্বদা সচেতন করিয়াছেন।

আমরা সাধারণ লোক; জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমাদের একটা সুনির্দ্দিষ্ট ধারণা আছে এবং সেই ধারণার মাপকাঠিতে আমরা ছিটগ্রস্ত দুর্ব্বলতাপীড়িত লোকদিগকে বিচার করি, সর্ব্ববাদিসম্মত নিয়মের সাহায্যে নিয়মের ব্যতিক্রমের পরিমাপ করি। কিন্তু অভ্যস্ত নিয়মকে যে সম্মানের আসন আমরা দিই তাহারও কোন নিগূঢ় কারণ নাই; ইহা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ফল মাত্র। যে মাপকাঠি আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহা একান্তভাবে আপেক্ষিক। একটু বিচার করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে পার্থিব মাপকাঠির কোন বৃহত্তর সার্থকতা নাই। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতে যাহাকে পাইয়াছি, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার দ্বারাই তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করি। কিন্তু যদি কল্পনা করা যায় যে কোন লোক এই পার্থিব লাভালাভ, ভালমন্দ হইতে বহুদূরে বসবাস করিতেছে, এখানকার বিচার তাহাকে স্পর্শ করে না তাহা হইলে যে অভ্যস্ত জীবনযাত্রা আমাদের কাছে অভ্রান্ত, ধ্রুব বলিয়া মনে হয় তাহা তাহার কাছে অতিশয় কৌতুকাবহ বলিয়া ঠেকিবে। যাহাকে আমরা বাতিকগ্রস্ত বলিয়া মনে করি তাহার অনাসক্ত অনুভূতির কাছে আমাদের রীতি নীতি অতিশয় অদ্ভুত বলিয়া প্রতিভাত হইবে, আমাদের সভ্যতার খোলসের অন্তরালে যে তুচ্ছতা, মূর্খতা ও সঙ্কীর্ণতা আছে তাহা তাহার দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে অনাবৃত হইয়া পড়িবে।[১] বাস্তবকে অবাস্তবের কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে। এই জাতীয় চরিত্র শেক্সপীয়রের ফল্‌স্টাফ, এই জাতীয় চরিত্র কমলাকান্ত। কমলাকান্ত নির্ব্বোধ নহে, তাহার

বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ, তাহার বিদ্যা অনন্যসাধারণ। কমলাকান্ত নিজের সীমা সম্পর্কে সচেতন, অথচ অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও সে খাপছাড়া। আমরা যেমন তাহাকে লইয়া কৌতুক করি, সেও তেমনি আমাদিগকে লইয়া কৌতুক করে। প্রসন্নগোয়ালিনী ও অহিফেন—ইহাছাড়া সংসারে তাহার আর তৃতীয় বন্ধন নাই। প্রসন্নগোয়ালিনীর সঙ্গে কাব্যরস অপেক্ষা গব্যরসের সংস্রব বেশী, আর অহিফেনও দিব্য দৃষ্টিলাভের উপায় মাত্র। কমলাকান্তের এই বন্ধনহীনতাই আমাদের কাছে হাসির সামগ্রী। 'পাকা খেলোয়াড় যেমন দর্শকের সমালোচনা কৌতুকের সহিত গ্রহণ করে, আমরাও কমলাকান্তের 'উদরদর্শন', রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ক বক্তৃতায় তেমনি আমোদ অনুভব করি, কিন্তু তাহার দ্বারা চালিত হইনা। কমলাকান্ত পার্থিব সাফল্য লাভ করে নাই, কিন্তু ইহার অন্তরস্থিত শূন্যতাকে সে চিনিয়াছে। সুতরাং আমাদের ব্যঙ্গকে সে ব্যঙ্গের সহিত গ্রহণ করিতে পারে, আমাদের অবজ্ঞাকে সে অবজ্ঞা করিতে পারে।

কমলাকান্তের দিব্যদৃষ্টি আমাদের সভ্যতার আবরণ ভেদ করিয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের গভীরতম তলদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেইখানে যে ক্ষুদ্রতা ও নীচতা দেখিতে পাইয়াছে তাহার অবিকৃত রূপ আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছে। কমলাকান্ত প্রথমে দেখাইয়াছে যে, যে বাহ্য সম্পদের আমরা পূজা করি তাহাতে কাহারও সুখবৃদ্ধি হয় নাই, সুতরাং তাহার কোন মূল্য নাই। কমলাকান্ত অহিফেন প্রসাদাৎ ইহাও বুঝিতে পারিয়াছে যে, আমরা সামাজিক জীবনে যে জাতিবিভাগ ও শ্রেণী বিভাগ করিয়া থাকি তাহা একেবারেই অর্থহীন। প্রকৃতপক্ষে যাহাদিগকে

আমরা পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত মনে করি তাহারা সবাই সমশ্রেণীভুক্ত এবং যদি তাহাদের মধ্যে পার্থক্য করিতে হয় তাহা হইলে নূতন কোন মাপকাঠি সৃষ্টি করিতে হইবে। আমরা 'হি' ও 'শী' অথবা স্ত্রী ও পুরুষের প্রভেদ করিয়া স্থির করিয়াছি যে এই প্রভেদ শুধু দেহগত নহে, চরিত্রগতও বটে। কিন্তু "যে ওয়াজিদালী শাহ লক্ষ্ণৌ নগরী হইতে স্বচ্ছন্দে চতুর্দ্দোলারোহণে মুচিখোলায় আগমন করিয়া, হংস, হংসী, কপোত-কপোতী লইয়া ক্রীড়া করেন, গোলাব সহিত বারিহ্রদে নিত্য স্নান করিয়া, স্বীয়ানুরূপী পিঞ্জরস্থ বুলবুলিকে সঘৃত পলান্ন প্রদান করেন, তিনি 'হি' না 'শী'? এবং যে মহিষী দেশবাৎসল্যে ঐহিক সুখসম্পত্তি বিসর্জ্জন করিয়া রাজপুরুষগণের শরণাপন্ন হওয়া অপেক্ষা ভিক্ষান্ন শ্রেয়োবোধে, নেপালের পার্ব্বতীয় প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি শী না হি?" শুধু যে স্ত্রীপুরুষের প্রভেদই ভ্রান্ত তাহা নহে। পুরুষে পুরুষে আমরা যে প্রভেদ করিয়া থাকি তাহাও অতিশয় অর্থহীন। আমরা সাধারণতঃ মনে করি শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান পরিচয় সফলতা, কৃতী না হইলে কৃতকর্ম্মা হইল কি প্রকারে? কিন্তু কমলাকান্ত দেখিতে পাইয়াছে যে গ্লাডষ্টোন ও ডিস্রেলি প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন অথচ জন ষ্টুয়ার্ট মিল বেশী দিন পার্লামেন্টের সদস্য থাকিতে পারেন নাই; দার্শনিক ম্যাকিণ্টশ অপেক্ষা অলঙ্কারবিশারদ্ মেকলে অধিক জনপ্রিয় হইয়াছেন। গ্লাডষ্টোন, ডিস্রেলি ও মেকলে গলাবাজিতে পটু; গলাবাজিতে তাঁহাদের শূন্যগর্ভতা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, যেমন বসন্তের কোকিল পঞ্চমস্বরের মাধুর্য্যের সাহায্যে কালো রং চাপাইয়া দেয়।

কমলাকান্তের সমালোচনার প্রথম ও প্রধান গুণ এই যে সে শুধু

যে সামাজিক পার্থক্য অস্বীকার করিয়াছে তাহা নহে, মানুষ যে পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ ও ফুলফল হইতে আপনাকে পৃথক্ মনে করিয়া প্রচুর আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিয়াছে তাহারও ভিত্তিহীনতা সে প্রমাণ করিয়াছে। বিষ্ণুশর্ম্মা ও ঈশপ পশুজীবন হইতে অনেক নীতিকথা সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু সেই নীতিশাস্ত্র বিশেষভাবে মানুষেরই রচিত, পশুজীবনেও তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে এই পর্য্যন্ত। এই বিচারে পশু সিঁড়ির কয়েক ধাপ অতিক্রম করিয়া মানুষের সঙ্গে এক শ্রেণীতে উপনীত হইয়াছে। কমলাকান্ত জাগতিক নীতিশাস্ত্র উল্টাইয়া নূতন প্রথায় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সুইফ্‌ট্‌'এর অন্তর্দৃষ্টি বিষ্ণু শর্ম্মার কল্পনার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে; এখানে মানুষ নীচে নামিয়া পশুপক্ষী ফুলফলের সঙ্গে একত্র হইয়াছে। কমলাকান্ত শুধু মোটামুটি ভাবে সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াই বিরত হয় নাই, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়া মানবের শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কারে আঘাত করিয়াছে এবং তাহার আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছে। বিস্‌মার্কের পলিটিক্স ও বাঙ্গালীর পলিটিক্স যথাক্রমে কুকুরের পলিটিক্স ও বৃষের পলিটিক্সের সহিত তুলনীয়। যে বিড়াল দুধ চুরি করে সে মূলতঃ সোশ্যালিষ্ট আর যে মানুষ বিড়ালকে তাড়াইয়া দুধ রক্ষা করে সে মূলতঃ ক্যাপিটালিষ্ট। কমলাকান্তের কল্পনা যেমন সুদূর প্রসারী তাহার দৃষ্টি তেমনি বন্ধনহীন ও সর্ব্বব্যাপী। দৃষ্টির এই বন্ধনহীনতার জন্যই কমলাকান্ত অপরিসীম বৈষম্যের মধ্যে অপরূপ সামঞ্জস্য আবিষ্কার করিয়াছে। ঢেঁকিশালে যাইয়া কমলাকান্তের চোখের ঠুলি খুলিয়া গিয়াছে এবং কিছুক্ষণ পরে জ্ঞাননেত্রে কমলাকান্ত দেখিতে পাইয়াছে, "এ সংসার কেবল ঢেঁকিশাল। বড় বড় ইমারত

বৈঠকখানা, রাজপুরী সব ঢেঁকিশালা—তাহাতে বড় বড় ঢেঁকি গড়ে নাক পুরিয়া খাড়া হইয়াছে।" জমীদার, প্রজা, ধনী-দরিদ্র, আইনকারক বিচারক, বাবু, লেখক—কেহ কমলাকান্তের দৃষ্টি এড়ায় নাই, সবাই ঢেঁকিশালে পিষিতেছে অথবা পিষ্ট হইতেছে।

কমলাকান্তের দৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে—'বড়বাজার' স্বপ্নদর্শনে। আমরা মনে করি যে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের আদান-প্রদান উচ্চ আদর্শের দ্বারা নিয়মিত হয়। কমলাকান্ত ইহার মধ্যে কোন নীতি দেখিতে পায় নাই—সে দেখিয়াছে সর্ব্বত্র বাজারের আদবকায়দা। রমণীর রূপসজ্জা, পণ্ডিতের বিদ্যাদান, ইংরেজের রাজ্যশাসন, সাহেবের সংস্কৃত গবেষণা, উমেদারের উমেদারি, সাহিত্যিকের সাহিত্যচর্চ্চা, যশোলোভীর যশের আকাঙ্ক্ষা, বিচারকের দণ্ডবিধান—এই সকল পরস্পর-অসম্পৃক্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে কমলাকান্ত ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছে; কারণ সর্ব্বত্রই ক্রয়-বিক্রয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহাদের বৈচিত্র্য সম্পর্কে কমলাকান্ত অচেতন নহে—রমণীর রূপসজ্জা ও বিচারকের বিচার এক সামগ্রী নহে, এবং ইহাদের সন্ধান মিলে বাজারের বিভিন্ন অংশে। প্রত্যেক যুবতীই রূপকে পণ্যের মত বিক্রয় করে, কিন্তু তাহার মধ্যেও পার্থক্যের অবধি নাই। "পৃথিবীর রূপসীগণ মাছ হইয়া ঝুড়িচুপরির ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। দেখিলাম, ছোট বড় রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ, চুনো, পুঁটি, কই, মাগুর খরিদ্দারের জন্য লেজ আছড়াইয়া ধড়ফড় করিতেছে।" খরিদ্দারকে খুসী করিবার জন্য প্রত্যেকে তাহার নিজস্ব পন্থা অবলম্বন করিতেছে, কিন্তু মূলতঃ সবাই মৎস্যধর্ম্মী। রূপের বাজারের সঙ্গে সাহিত্যের বাজারের কোন

সাদৃশ্য নাই, কিন্তু উভয়ই বাজার বটে। নরনারীর বিভিন্ন, বিচিত্র কার্য্যকলাপ সম্পর্কে কমলাকান্তের কৌতূহল তন্দ্রাহীন, তাহার পর্য্যবেক্ষণ সর্ব্বব্যাপী, তাহার বর্ণনা সূক্ষ্মানুপুঙ্খ, তাহার বিচার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, কারণ তাহার মন একেবারে বন্ধনহীন। এই গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্মদৃষ্টির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় আর একটি প্রবন্ধে—যেখানে ('মনুষ্যফল') মনুষ্যজাতি ফলের সঙ্গে উপমিত হইয়াছে। "আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে, আমার বোধ হয়, মনুষ্যসকল ফল-বিশেষ—মায়াবৃন্তে সংসারবৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে; পাকিলেই পড়িয়া যাইবে।" কমলাকান্ত মায়াবৃন্তবিচ্ছিন্ন অথচ সংসারবৃক্ষ হইতে পড়িয়া যায় নাই। তাহার দেখিবার ও বুঝিবার অবকাশ সীমাহীন; কিন্তু যে মানব সংসারে থাকিয়াও নাই, যে বৃন্তহীন অথচ বৃক্ষ হইতে বিচ্যুত হয় নাই তাহার বিশ্লেষণ ও সমালোচনা যতই গভীর হউক কৌতুকের উদ্রেক না করিয়া পারে না।

কমলাকান্তের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার নির্লিপ্ততা। সংসারের সহিত তাহার একমাত্র বন্ধন এই যে সে ভোজনবিলাসী ও অহিফেন-সেবী। আফিমের বন্ধনকে সাংসারিক বন্ধন বলা যায় না, কারণ ইহার সাহায্যে তাহার জ্ঞাননেত্র ফুটিয়া উঠে। সে দেখিতে পাইয়াছে বেন্থাম প্রভৃতি যাহাকে হিতবাদ বলেন তাহাও মূলে ভোজনবিলাসিতা; পণ্ডিতগণ দার্শনিক ব্যাখ্যার দ্বারা ভোজনবিলাসিতাকে ঝাঁকাল করিতে পারেন, কমলাকান্তও সংস্কৃতদর্শনের সূত্রের দ্বারা তাহাকে কণ্টকিত করিয়াছে, কিন্তু দার্শনিক আবরণে ঔদরিকতার স্বরূপ চাপা পড়ে নাই। কমলাকান্ত নির্লিপ্ত হইলেও নিরাকাঙ্ক্ষ নহে। মানুষের বন্ধনের

প্রয়োজন আছে, কারণ জীবকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কমলাকান্ত অপরের মোহাচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণতা লইয়া কৌতুক করিয়াছে, কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারিয়াছে যে অবিমিশ্র 'মুক্তিও বন্ধনের ন্যায়ই পীড়াদায়ক'। তাই তাহার ব্যঙ্গকৌতুক ছাপাইয়া একটা গভীর ব্যথার করুণ সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কখনও কখনও ব্যঙ্গের মধ্য দিয়াই এই গভীর বেদনা, এই নিবিড় আকাঙ্ক্ষা বাজিয়া উঠিয়াছে। কমলাকান্ত পতঙ্গের বহ্নিমুখবিবিক্ষুতা লইয়া কৌতুক করিয়াছে, কিন্তু সে ইহাও বুঝিয়াছে যে এই ধ্বংসোন্মুখীনতাই মানবকে পরিচিত ক্ষুদ্র আবেষ্টন হইতে দুর্জ্ঞেয় ভূমার দিকে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছে। "তুমি কি তা আমি জানি না······তুমি আমার বাসনার বস্তু, আমার জাগ্রতের ধ্যান, নিদ্রার স্বপ্ন, জীবনের আশা—মরণের আশ্রয়! তোমাকে কখন জানিতে পারিব না; জানিতে চাহিও না······কাম্য বস্তুর স্বরূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে?" কাম্যবস্তুর অভাব কমলাকান্তকে অনুক্ষণ পীড়িত করিয়াছে। কমলাকান্ত দারিদ্র্য ও চির কৌমারদ্বারা পরাজিত হয় নাই, সুতরাং পৃথিবীর লোকের যা কাম্য তাহার সে সন্ধান করে নাই। তবু তাহার মন চঞ্চল হইয়াছে—কিসের জন্য সে নিজেই স্থির করিয়া বলিতে পারে নাই। তাহার মন কোথায় গেল তাহা সে বলিতে পারে না। বন্ধনহীন মনকে সে বাঁধিতে চাহিয়াছে, কিন্তু কি দিয়া বাঁধিবে স্থির করিতে পারে নাই। তাহার এই যে অনির্দ্দেশ্য বেদনা ইহার সঙ্গে মানবের চিরন্তন ট্র্যাজেডির গভীর যোগ আছে। সকল মানব কাম্যবস্তুর সন্ধান করে, কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধন কমিয়া আসে, পাকিলে মনুষ্যফল বৃন্তচ্যুত হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কামনার তেজ

ম্লান হয়, আর যাহা পূর্ব্বে আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া মনে হইত অভিজ্ঞতার ফলে তাহা মূল্যহীন বলিয়া মনে হয়। এই যে অনিবার্য্য ট্র্যাজেডি ইহা কমলাকান্ত অতি নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল এবং তাহার রচনায় এই চিরন্তন সার্ব্বজনীন বেদনা তীব্র অভিব্যক্তি পাইয়াছে।

আমাদের কার্য্যকলাপের প্রতি কমলাকান্তের কোন অনুরাগ বা শ্রদ্ধা নাই—সকলই অন্ধের মৃগয়া। অন্ধকে আলো দিবে কে?—বিশ্বপ্রীতি। মানবসাধারণের প্রতি যদি প্রীতি থাকে, কর্ম্ম যদি স্বার্থ প্রণোদিত না হইয়া ঈশ্বরোদ্দিষ্ট হয় তাহা হইলে কাম্য বস্তুর অভাব হয় না অথচ সংসারের যে মোহমায়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। মানবপ্রীতির যে বন্ধন তাহা বার্দ্ধক্যের অভিজ্ঞতায় শিথিল হইতে পারেনা, কারণ এই বন্ধন মোহাচ্ছন্ন নহে, ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে ইহার সংস্রব নাই বলিয়া ইহা মুক্তি হইতে অভিন্ন। কমলাকান্ত বলিয়াছে, "মনুষ্যজাতির প্রতি যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাহি না।" কমলাকান্তের সকল স্বপ্ন, সকল পাগলামির মধ্যে মনুষ্যজাতির প্রতি সুগভীর প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কখনও ইহা উচ্চ কবিকল্পনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে আবার কখনও ইহা ব্যঙ্গবিদ্রূপের সাহায্যে সরস হইয়াছে।

কমলাকান্তের জবানবন্দী হাস্যরসের অফুরন্ত ভাণ্ডার। কমলাকান্ত আদালতের বিচারপদ্ধতি লইয়া খুব ব্যঙ্গ করিয়াছে। * তাহার কারণ

* কেহ কেহ মনে করেন যে কমলাকান্তের জবানবন্দী ও Pickwick Papers'র Sam Weller'র জবানবন্দীর মধ্যে সাদৃশ্য আছে এবং হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র এই চিত্রের জন্য ডিকেন্সের নিকট ঋণী। Sam Weller'র সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ধারণা নাই; সে

কমলাকান্ত জানে বিচারালয় বড়বাজারের কসাইখানা আর হাকিম মনুষ্য ফলের মধ্যে কুষ্মাণ্ডফল। কমলাকান্ত কোন বিশেষ হাকিম বা উকিলকে লইয়া ব্যঙ্গ করে নাই; সে জানে আইনের শৃঙ্খল ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি নহে। স্বার্থান্ধ মানবসমাজ বিচার করিতে বসিলে তাহার চেষ্টা মিথ্যা প্রতিজ্ঞা, অর্থহীন প্রশ্নোত্তর ও শূন্যগর্ভ আইনকানুনের দ্বারা কণ্টকিত হইবে। কমলাকান্ত এই যন্ত্র হইতে দূরে আছে। সুতরাং প্রতিপদে সে ইহার শূন্যগর্ভতা লইয়া ব্যঙ্গ করে, এবং আমরা নিজেদের রচিত কল-কৌশল ছাড়িতে পারিনা বলিয়া এই নিয়মবহির্ভূত ব্যক্তির পাগলামিতে কৌতুক অনুভব করি কিন্তু বিব্রতও বোধ করি।* কমলাকান্ত সর্ব্বশেষে মামলার যে মীমাংসা প্রস্তাব করিল তাহা অতিশয় অদ্ভুত, তাহা বর্ত্তমান সভ্যতার মূলদেশে আঘাত করে, কিন্তু তাহা যত আজগুবিই হউক লোকবাৎসল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত। যে সভ্যতা প্রবলের সম্পত্তি অপহরণ-অধিকার স্বীকার করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, যে সভ্যতা দুর্ব্বলকে অনাহারে রাখিয়া সম্পত্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছে তাহার বিচার করিবার প্রচেষ্টা বিড়ম্বনা ও বাতুলতা মাত্র। তাই কমলাকান্ত মীমাংসা করিল যে বসুন্ধরা বীরভোগ্যা হইলে ধেনুও তস্করভোগ্যা হইবে।

কমলাকান্ত যেখানে ব্যঙ্গ ছাড়িয়া মানবমনের আকাঙ্ক্ষা ও

* যে কৌতুকের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা অনেকটা অনিচ্ছাকৃত। কিন্তু কমলাকান্ত সমাজকে ভাল করিয়া জানে, সুতরাং সে Sam Weller অপেক্ষা অনেক বেশী প্রত্যুৎপন্নমতি এবং সূক্ষ্মদর্শী। আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। Pickwick'র বিচারে Sam Weller'র সাক্ষ্য গৌণ। এইখানে বাদিনী ও আসামী অপেক্ষা সাক্ষীই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

বার্দ্ধক্যের বেদনার কথা লিখিয়াছে সেইখানে সে অপূর্ব্ব গদ্যগীতিকাব্য রচনা করিয়াছে। কমলাকান্ত লোকবাৎসল্যের কবি। কখনও কখনও লোকবাৎসল্য দেশবাৎসল্যের রূপ ধরিয়া তাহার মনকে আলোড়িত করিয়াছে এবং সেইখানে তাহার কবিপ্রতিভা সর্ব্বাপেক্ষা মধুর, উজ্জ্বল ও তীব্র হইয়াছে। বৈষ্ণবকবি যখন গান রচনা করিয়াছিলেন:

এসো এসো বঁধু এসো- আধ আঁচরে বসো
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।

তখন তিনি একটি বিশিষ্ট নাগরকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কমলাকান্ত এই ব্যক্তিগত প্রেমোন্মাদ (অথবা ধর্ম্মোন্মাদ) কে হৃত স্বদেশলক্ষ্মীর জন্য দেশভক্তের আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত করিয়াছে। বঙ্গের ভাগ্যে ভবিষ্যতে আর যাই আসুক, হিন্দুরাজত্বের পুনরুদ্ধার হইবে না। তাই যে রাজলক্ষ্মী ১২০৩ সালে এইদেশ হইতে চলিয়া গিয়াছেন, যিনি আর কখনও আসিবেন না, কমলাকান্ত তাঁহাকেই বঁধুরূপে কল্পনা করিয়া নানাভাবে আবাহন করিয়াছে এবং বাঙ্গালী হিন্দু যে যে দোষের জন্য তাঁহাকে হারাইয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া দেশাত্মবোধের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে। বৈষ্ণব কবির গান অসাধারণ বিস্তৃতি পাইয়াছে এবং স্বদেশ-প্রীতি বিরহিণী নায়িকার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলিত হইয়া অপরিসীম তীব্রতা ও করুণতা লাভ করিয়াছে। কমলাকান্তের কল্পনা বৈষ্ণব কবিতার সীমাবদ্ধ পরিবেশ অতিক্রম করিয়া প্রাচীন বঙ্গের হিন্দু সভ্যতার এবং সেই সভ্যতাবিলোপের মধুর স্বপ্নচিত্র রচনা করিয়াছে। "কমলাকান্ত এইখানে যে স্বদেশবাৎসল্যের বর্ণনা দিয়াছে তাহা বিশেষভাবে হিন্দুর দেশবাৎসল্য। কিন্তু অন্য

ধর্ম্মের এই সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিয়া সে আরও বৃহত্তর অনুভূতির দ্বারা উদ্বোধিত হইয়াছে। হিন্দুর দুর্গোৎসব বিশেষভাবে হিন্দুর উৎসব —তেত্রিশ কোটি দেব দেবীর মধ্যে একজন বিশিষ্টদেবীর আরাধনা। বাঙ্গালী হিন্দুর ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব, সকল দেব দেবী পূজার উপরে ইহার স্থান। কমলাকান্ত হিন্দুর দেবীকে দেশমাতৃকার প্রতীক হিসাবে কল্পনা করিয়াছে। দেবী, দেবীর সহচর সহচরী, পূজার সকল উপকরণ, উৎসবের সকল আয়োজন—কমলাকান্ত কাহাকেও বাদ দেয় নাই, কিন্তু তাহার কল্পনায় দেবী নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, দুর্গোৎসবের নূতন দ্যোতনা আহুত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিতে দেবী শুধু হিন্দুর দেবী নহেন, তিনি সকল বাঙ্গালীর মাতা, তিনি নববল-ধারিণী, নবদর্পে দর্পিণী, নবস্বপ্নদর্শিনী—এ মাতা শুধু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অর্চ্চনীয় নহেন, দেশবিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া তাঁহাকে প্রণামি দিবে, ইহাকে পাইতে হইলে ইন্দ্রিয়াসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে, দ্বেষকে হত্যা করিতে হইবে, ইহার দাবী ভ্রাতৃবাৎসল্য ও পরের মঙ্গল সাধন। ইনি শুধু হিন্দুর দেবী নহেন—ইনি সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।*

---

* কমলাকান্তের দপ্তর সম্পর্কে একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। দুইটি সংখ্যা ('চন্দ্রালোকে' ও 'স্ত্রীলোকের রূপ') বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত নহে। তাঁহার বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই দুইটি সংখ্যা লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতি এইখানে এইরূপ আয়ত্ত করিয়াছেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের মত কঠোর সমালোচকও এই দুই প্রবন্ধকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অতি সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া অল্প বিস্তর পার্থক্য আবিষ্কার করিয়াছেন। উপরে যে সমালোচনা দেওয়া হইল তাহাতে এই পার্থক্য লক্ষ্য করা হয় নাই।

(২)

'মুচিরামগুড়ের জীবন চরিত' সম্পূর্ণ ব্যঙ্গ রসাত্মক গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র দুই এক স্থানে লঘু কৌতুকের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু মোটের উপর কঠোর বিদ্রূপই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। মুচিরাম দরিদ্রের সন্তান, ক্রমে সে উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইয়া, জমিদারী খরিদ করিয়া, ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়নের সভ্য হইয়া, কৌন্সিলের সদস্যপদ পাইয়া 'রাজা'-উপাধি পর্য্যন্ত অর্জ্জন করিয়াছিল। বাহিরের দিক্ হইতে বিচার করিলে ইহা একটি অপূর্ব্ব গৌরবের কাহিনী, স্বনামা পুরুষসিংহো ধন্যঃ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বাহিরের সাফল্যের আবরণ সরাইয়া মুচিরামের চরিত্রগত তাহার কৃতিত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। এইখানে হাস্যরসের মূল উপাদান—সত্য ও মিথ্যার বিরোধ—অতি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। একদিকে মুচিরামের ক্রমোন্নতির বর্ণনা অপরদিকে তাহার অপরিবর্ত্তনীয় নীচতা ও অক্ষমতার চিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র কোন একটিকে অধিক প্রাধান্য দেন নাই। তাঁহার বর্ণনা সংযত; ঐতিহাসিকের নিষ্ঠার সহিত তিনি শুধু সত্যের অবিকৃতরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

'মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত' শুধু ইতিহাস নহে, ইহা জটিল উপন্যাস ও বটে। 'এই জীবনকাহিনীতে নানা ঘটনার সম্মেলন হইয়াছে, নানা শক্তির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় মুচিরামের ভাগ্য নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু যাহা কিছুই ঘটুক না কেন, মুচিরাম সর্ব্বত্র জয়ী হইয়াছে। মুচিরাম মূর্খ অশিক্ষিত, চরিত্রহীন। কিন্তু সকল শক্তির সংঘাত ও সম্মিলনের ফলে মুচিরামের সর্ব্বত্র সফলকাম হইয়াছে। তাহার সামর্থ্য ও সম্বল সামান্য; কিন্তু দেখা যাইতেছে যে অক্ষমতাই তাহার সাফল্যের পথ অধিক সুগম

করিয়া দিয়াছে। এইখানেও যেন দৈবশক্তি পার্থিব জগৎ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, মূর্খ, অপটু মুচিরামের স্বার্থসিদ্ধিকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য। নিয়তির পরিহাস লইয়া ট্র্যাজেডির সৃষ্টি, মনোরমা ও কুন্দনন্দিনী কোন দুরতিক্রম্য বিধানকে রোধ করিতে পারে নাই। নিয়তির লঘু কৌতুক মানবজীবনে অফুরন্ত কমেডির সৃষ্টি করে। এইখানেও সেই দুরতিক্রম্যতা রহিয়াছে; কেহ মুচিরামকে তাহার সাফল্য ও গৌরব হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। মোটাবুদ্ধির জন্য মুচিরাম যাত্রা পণ্ড করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু রাজসরকারে উচ্চপদ লাভ করিতে এই মোটাবুদ্ধিই তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছিল। যাত্রার অধিকারী তাহাকে সামান্য কয়েকটি পাওনা টাকা ঠকাইয়াছিল, কিন্তু যেন প্রতিশোধ লইতেই নিয়তি মুচিরামকে প্রচুর অর্থ সম্মান ও যশের অধিকারী করিল যাহা সে কখনও দাবী করিতে পারিত না, বোধহয় স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিত না। ভজগোবিন্দ খুব কশ্মঠ ও চতুর লোক, কিন্তু সে মুহুরীর গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে নাই, তাহাকে ভর করিয়া মুচিরাম কর্ম্ম জীবনের উচ্চতম শীর্ষে আরোহণ করিয়াছে। শঠকুলচূড়ামণি রামচন্দ্র বাবু মুচিরামের সর্ব্বনাশ করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু তাহাকে বাহন করিয়াই "অচিরাৎ অনারেবল বাবু মুচিরাম রায় বাঙ্গালার কৌন্সিলে আসন গ্রহণ করিলেন" এবং রামচন্দ্র বাবুর শঠতার জন্যই যেন দৈব প্রেরিত হইয়া মীনওয়েল সাহেব মুচিরামের রাজা-উপাধি পাওয়ার উপায় করিলেন। এইখানে নিয়তির কৌতুক চরমে পঁহুছিয়াছে। মুচিরাম তালুকে গিয়াছিল টাকা আদায় করিতে—দান করিতে নহে। দুর্ভিক্ষ নিবারণের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই; সে কাহাকেও অন্নদান

করে নাই। কিন্তু ইংরেজসরকারের শাসননীতি, মীন্‌ওয়েল সাহেবের বাঙ্গালা ভাষার অজ্ঞতা, চাষার সাহেবের কথা বুঝিবার অক্ষমতা—এই নানাশক্তির ষড়যন্ত্রে মুচিরামের সৌভাগ্যের ষোলকলা পূর্ণ হইল। সে এমন সম্মান পাইল যাহার জন্য সে চেষ্টা করে নাই, যাহার আশা পর্য্যন্ত সে পোষণ করে নাই। ইহা আকস্মিক নহে, নিয়তির বিধান।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে দেশী হাকিম ছিলেন। দেশী ও বিলাতী হাকিমের সমস্ত প্রকার ত্রুটি অপরাধ সম্পর্কে তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি নিজের প্রতিবেশকে কখনও বড় করিয়া দেখেন নাই, চাকুরি জীবনের পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিমান ছিল না। এই জন্যই কমলাকান্ত দেশী হাকিমকে কুষ্মাণ্ডের সহিত তুলনা করিয়াছিল। মুচিরাম এই কুষ্মাণ্ডকুলের অগ্রণী। এই জাতীয় কুষ্মাণ্ড যে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার কারণ বিদেশী শাসনতন্ত্র। 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "বিভিন্ন দেশীয় লোক কোন দেশে রাজা হইলে একটি অত্যাচার ঘটে। ....…পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীর লোকে স্বীয় বুদ্ধি, শিক্ষা, বংশ এবং মর্য্যাদানুসারে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন না।" বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এই পরজাতি প্রাধান্যের কুফল ভোগ করিয়াছেন। সুতরাং মুচিরামগুড়ের কাহিনীতে তিনি ইহা লইয়া খুব কঠোর শ্লেষ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন অধিকাংশ সাহেব এদেশীয় অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, রাজ্যশাসন সম্পর্কে উদাসীন; ইহাদের সর্ব্বপ্রধান দোষ অতিরিক্ত জাত্যভিমান। দেশীয় লোকদের মধ্যে তাহারাই মর্য্যাদা পায় যাহারা মূর্খ, যাহারা ইংরেজি জানেনা,

যাহারা অতিরিক্ত সেলাম করিতে প্রস্তুত, যাহারা কোন অপমানেই ক্ষুব্ধ হয় না। যাহারা বানরশ্রেণীয় মানুষ পরতন্ত্র রাজ্যে তাহাদেরই শ্রীবৃদ্ধি হইবে। অবশ্য "দ্বিজ দর্পনারায়ণ ভণে, কে বানর? যে মেজাজ বুঝে, না যাহার মেজাজ বুঝিতে হয়? যে কলা খায়, না যে কদলী প্রলোভন দেখায়?" মূর্খতা, অপমানসহিষ্ণুতা এবং খোসামুদিতে অদ্বিতীয় নৈপুণ্যের জোরেই মুচিরাম অসামান্য সফলতা লাভ করিয়াছে। বিদেশীয় রাজকর্মচারী এ দেশীয় লোকের গুণের আদর করিতে আরম্ভ কারণে তাহাদের নিজেদের প্রাধান্যবোধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন; গুণের তো কোন বিশিষ্ট জাতি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা ও শ্লেষ অতিশয় জীবন্ত হইয়াছে। কারণ এই গ্রন্থ একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসের আকারে লিখিত হইয়াছে। হোমসাহেব, গঙ্গারাম সাহেব, মীন্‌ওয়েল সাহেব, কমিশনর সাহেব, লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর বাহাদুর—ইঁহাদের প্রত্যেকের চরিত্র দুই একটি কথায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইঁহারা বিভিন্ন চরিত্রের লোক এবং বিভিন্ন ব্যাপারে ইঁহারা মুচিরামের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে এক বিষয়ে ইঁহাদের মধ্যে ঐক্য রহিয়াছে—মুচিরাম নম্র, নিরহঙ্কারী, নির্ব্বিরোধী লোক। সেই হিসাবে তাঁহাদের কাছে মুচিরাম নিজের স্বদেশবাসীদিগের দৃষ্টান্তস্থল। এইভাবে ইংরেজ রাজকর্মচারীদিগকে মুচিরামের পৃষ্ঠপোষকরূপে চিত্রিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রূপ করিয়াছেন।

(৬)

'লোকরহস্য' 'কমলাকান্তের দপ্তর' বা 'মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত'

হইতে পৃথক্ রীতিতে লিখিত। এই গ্রন্থ কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি; কোন একটি চরিত্র এই প্রবন্ধগুলির কেন্দ্র নহে। কিন্তু লঘু কৌতুক ও তীব্রব্যঙ্গের যে সমন্বয় বঙ্কিমের রসিকতার প্রধান উপাদান এই প্রবন্ধ সমষ্টিতে তাহার অভাব হয় নাই বরং অদ্ভুত ও উদ্ভটের সৃষ্টিতে বঙ্কিমের কল্পনা এখানে আরও তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। 'রামায়ণের সমালোচনা' ও 'কোন স্পেশিয়ালের পত্র'—এই দুই প্রবন্ধে তিনি বিদেশী মূর্খকে বিজ্ঞ সাজাইয়া তাহার দৃষ্টিতে এদেশীয় সাহিত্য ও সভ্যতার সমালোচনা করিয়াছেন। এই শ্রেণীর 'রহস্য'কে সার্থক করিতে হইলে গ্রন্থকারকে সম্পূর্ণভাবে মূর্খের মূর্খতার অন্তরালে আত্মগোপন করিতে হইবে। মূর্খ, আত্মগরিমাপরায়ণ, সঙ্কীর্ণদৃষ্টি বিদেশী সমালোচক প্রতিপদে কিভাবে প্রত্যেক ব্যাপারকে বিকৃত করিয়া দেখিতে পারে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তাহার বুদ্ধি ও কল্পনা দিয়া মাকড়সার জাল বুনিতে হইবে। মূর্খতাও ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে চলে; সুতরাং আত্মম্ভরি মূর্খের বুদ্ধি ও কল্পনা কি পথে বিচরণ করিবে তাহা অনুধাবন করিতে হইবে। যে বিদেশী রামায়ণকে নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয় কবিদিগের রচনার সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিল বলিয়া মনে করে সেই বিশ্বাস করিতে পারে যে কৃত্তিবাস রামাযবন বা রামা নামক মুসলমানের জীবন অবলম্বন করিয়া মূল রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন এবং পরে কেহ ইহা সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বল্মীকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া ইহা বাল্মীকি রামায়ণ নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে মূর্খের উদ্ভাবনী শক্তি অনন্যসাধারণ, তাহার পর্য্যবেক্ষণ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রন্ধ্রানুগামী, তাহার বিশ্লেষণনৈপুণ্য বিস্ময়কর। এই

মূঢ় সমালোচক রামায়ণকে নানা দিক্ হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমালোচনা করিয়াছে; শ্রেষ্ঠ সমালোচকের নিষ্ঠা ও গভীর অনুসন্ধিৎসা ইহার মধ্যেও আছে। ইহার আত্মম্ভরিতা ইহার মূর্খতার অনুরূপ; সুতরাং কোথাও ইহার বাধে নাই, কোথাও ইহার মনে সন্দেহ জাগে নাই। কিন্তু সমালোচকের প্রধান গুণ—বুদ্ধি ও উপলব্ধি ইহার নাই। তাই প্রতিপদে এই সমালোচক মূর্খতার গভীরতর পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছে: ইহার প্রত্যেকটি উক্তি পূর্ব্ব উক্তির সঙ্গে সুসমঞ্জস, কিন্তু প্রত্যেকটি উক্তিই ইহার মূর্খতা ও দুঃসাহসের নিবিড়তর পরিচয় দেয়। 'কোন স্পেশিয়ালের পত্র' রামায়ণ সমালোচনার অনুরূপ রীতিতে রচিত এবং কোন কোন জায়গায় রচনা অতি নিপুণ শ্লেষে পরিপূর্ণ। এই সমালোচক ও মূর্খ ও আত্মগরিমপরায়ণ, সুতরাং ইহার কল্পনা অবাধ স্বাধীনতা পাইয়া এক বিচিত্র কাহিনী রচনা করিয়াছে। বাঙ্গালী ইংরেজি ভাষা হইতে কতকগুলি শব্দ নিজের ভাষায় গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ শব্দগ্রহণ সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং ইংরেজিভাষার অধিকাংশ শব্দ অপর ভাষা হইতে গৃহীত। কিন্তু যে মূর্খ ইংরেজ বাঙ্গালা না জানিয়া বাঙ্গালা ভাষার সমালোচনা করে, সে অতি সহজেই মনে করিবে, "বাঙ্গালীরা হাইকোর্টকে হাইকোর্ট বলে, গবর্ণমেণ্টকে গবর্ণমেণ্ট বলে, ডিক্রীকে ডিক্রী বলে................ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে বাঙ্গালা ভাষা ইংরেজির একটা শাখা মাত্র।" এই লোক ভাষা ছাড়িয়া জাতিতত্ত্বের আলোচনা করিলেও অনুরূপ ভুল করিবে। ইহার মতে হিন্দুদের মধ্যে বহু জাতি আছে যথা:—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, কুলীন, বৈষ্ণব, রায়, ঘোষাল, মোল্লা, রামায়ণ, আসাম, মহাভারত,

পারিয়াডগস্ ইত্যাদি। যাহারা মাথায় হাটিয়া চলে তাহারা পৃথিবীকে অদ্ভুতভাবে দেখে। তাহাদের ধারণা খুব সুশৃঙ্খল, কিন্তু সকল বিষয়েই উল্টা রকমের। রামায়ণের সমালোচক ও "স্পেশিয়াল" এই শ্রেণীর লোক। *

ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুলের বক্তৃতা লইয়া যে দুই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে তাহাদের হাস্যরস একটু মিশ্রধরণের। ব্যাঘ্রেরা মনুষ্যের সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে অজ্ঞ, কিন্তু সেই অজ্ঞতা সম্পর্কে তাহাদের মনে কোন সন্দেহও জাগে নাই। মনুষ্যদিগকে তাহারা নিম্নশ্রেণীর জন্তু বলিয়া মনে করে। এই অজ্ঞতার জন্য ব্যাঘ্রাচার্য্য ও দীর্ঘনখ যে সকল মন্তব্য করিয়াছে তাহা কৌতুকের উৎপাদন করে। বিশেষতঃ ব্যাঘ্রাচার্য্য তাহার ফাঁদে পড়ার যে বর্ণনা দিয়াছে তাহাতে তাহার প্রশান্ত আত্মপ্রসাদ ও পরকে বুঝিবার অক্ষমতা অতি কৌতুকময় অভিব্যক্তি পাইয়াছে। মনুষ্যকে ভোজন করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের আছে এবং তাহাকে সভ্য করিবার যে যুক্তি দেখান হইয়াছে তাহা White man's burdenর কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। কিন্তু এই একটি আসক্তি বাদ দিলে ব্যাঘ্রের দৃষ্টি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। দূর হইতে তাহারা মানুষের সভ্যতা দেখিতেছে, কোন সংস্কার তাহাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে নাই। সুতরাং তাহারা মানুষের সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে যে চিত্র আঁকিয়াছে তাহার নিরপেক্ষতা অনন্যসাধারণ আর এই নিরাসক্ত, সংস্কারবিমুক্ত দৃষ্টিতে

* 'স্পেশিয়াল' সংবাদদাতা তাহার পত্রের শেষের অংশে পুষ্পধনু সম্পর্কে যে সকল কথা লিখিয়াছে তাহা তাহার অজ্ঞতার সঙ্গে সুসমঞ্জস নহে। মনে হয় এই জায়গায় বঙ্কিমচন্দ্র স্পেশিয়ালের দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করিয়া নিজে রহস্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

দেখিয়াছে বলিয়াই তাহারা মনুষ্যের সভ্যতাকে নূতন মাপকাঠিতে বিচার করিতে পারিয়াছে, তাহাকে নূতন মূল্য দিতে সক্ষম হইয়াছে। এই বিষয়ে তাহাদের অজ্ঞতা যত গভীর তাহাদের দৃষ্টি তত স্বচ্ছ, বিচারপদ্ধতি তত অভিনব এবং বিদ্রূপ তত নিবিড়। বিবাহ ও মুদ্রা সম্পর্কে দুই ব্যাঘ্রের বিভিন্ন মতব্যাখ্যান এই শ্রেণীর ব্যঙ্গের চরম নিদর্শন। তাহারা বিবাহ ও অর্থান্বেষণকে দূর হইতে দেখিয়াছে, তাহাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা অদ্ভুত মতবাদ রচনা করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি নিরাসক্ত বলিয়াই তাহারা মানবসভ্যতার গভীরতম সত্যও আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে।

'লোকরহস্য' গ্রন্থে আর এক প্রকারের ব্যঙ্গরচনা আছে যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র অন্য রকমের রচনারীতি অবলম্বন করিয়া শ্রেষ্ঠ রসসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। 'ইংরাজস্তোত্র', 'গর্দ্দভ', 'বাবু'—এই তিনটি প্রবন্ধে তিনি বাঙ্গালীর 'বাবু'গিরি, ইংরেজপদলেহন ও মনুষ্যের মূর্খতা ও অক্ষমতাকে সোজাসুজিভাবে বিদ্রূপ করিয়াছেন। এইখানে তিনি ব্যাঘ্রের বা বিলাতী সমালোচকের দৃষ্টি গ্রহণ করেন নাই। অথচ সোজাসুজি বিদ্রূপ করিলে তাহার 'রহস্য' চলিয়া যায়; ব্যঙ্গ গালাগালিতে পরিণত হয়। সুতরাং লঘু ব্যঙ্গের জন্য তিনি মহাভারতের গুরুগম্ভীর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। মহাভারতের ভাষার প্রয়োগ বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাকে প্রসারিত করিয়াছে; যাহা নিন্দনীয় তাহা শ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণিত হইয়াছে যে এই শ্রদ্ধেয়তা একটা মুখোস মাত্র। বিচিত্রবুদ্ধি বাবু

দশাবতার বিষ্ণুর সঙ্গে তুলিত হইয়াছেন, কারণ তাঁহারাও অমিতবল অসুরগণকে বধ করিবেন। কিন্তু ইহার পরেই অবতার ও বধ্য অসুরের যে ফিরিস্তি দেওয়া হইল তাহাতে বাবুর সকল মর্যাদা ধূলিসাৎ হইল। * ইংরাজস্তোত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ভক্তের ঈশ্বরোপসনার সঙ্গে বাঙ্গালীর ইংরেজ-খোসামুদির তুলনা করিয়া বাঙ্গালীর দীনতা ও তাহার রাজ-ভক্তির গভীরতা প্রমাণ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের অকিঞ্চিৎকরত্ব লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। 'গর্দ্দভ' প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র এই রীতিই অন্য আকারে অবলম্বন করিয়াছেন। এইখানে দেখিতে পাই যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নামিয়া আসিয়া বাবু বা ইংরাজের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে নাই, গর্দ্দভ উন্নীত হইয়া শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার ভূষণের অবধি নাই, তাহার পদমর্যাদা অনন্ত, তাহার মূর্ত্তি অফুরন্ত, কিন্তু সকল ভূষণের অন্তরালে, সকল মূর্ত্তির অভ্যন্তরে সে মহাকর্ণ, বৃহন্মুণ্ড, প্রকাণ্ডোদর, মহাপৃষ্ঠ গর্দ্দভ। সে কখনও রাজ্যের ভার বহন করে, কখনও পুস্তকের ভার বহন করে, কখনও ধোপার গাঁটরি বহন করে। কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হে লোমশ! কোন্‌টি গুরুভার আমাকে বলিয়া দাও।"

উপরে যে সমস্ত প্রবন্ধের আলোচনা করা হইল, তাহাদের মধ্যেই

* "কেরাণী অবতারে বধ্য অসুর দপ্তরী, মাষ্টার অবতারে বধ্য ছাত্র; ষ্টেশন মাষ্টার অবতারে বধ্য টিকেটহীন পথিক, ব্রাহ্মাবতারে বধ্য চালকলাপ্রত্যাশী পুরোহিত; মুৎসুদ্দী অবতারে বধ্য বণিক ইংরাজ, ডাক্তার অবতারে বধ্য রোগী, উকীল অবতারে বধ্য মোয়াক্কেল; হাকিম অবতারে বধ্য বিচারার্থী; জমীদার অবতারে বধ্য প্রজা, সম্পাদক অবতারে বধ্য ভদ্রলোক এবং নিষ্কর্ম্মাবতারে বধ্য পুষ্করিণীর মৎস্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরস-কৌশলের প্রধান নিদর্শন পাওয়া যায়। অন্যান্য প্রবন্ধে তিনি সোজাসুজি ভাবে নিন্দাবাদে বা কৌতুকে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; যে রহস্যময়তা ও সাঙ্কেতিকতা এই জাতীয় শিল্পের প্রধান গুণ তাহা এই সকল প্রবন্ধে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। 'সুবর্ণগোলক', গ্রাম্যকথা প্রভৃতি প্রবন্ধে ফার্সেরও অবতারণা করা হইয়াছে। এই সকল প্রবন্ধের মধ্যে 'Bransonism', ও "দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন" সমধিক প্রসিদ্ধ, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে 'বর্ষ সমালোচনা' প্রবন্ধেই বঙ্কিমপ্রতিভা সমধিক বিকাশ লাভ করিয়াছে। রাজকর্ম্মচারীরা সাধারণ ব্যাপারকে অসাধারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া নিজেদের বাহাদুরি দেখাইতে চেষ্টা করেন এবং আমাদের দেশের লোক সর্ব্বব্যাপারে ইংরাজসরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া সম্ভব, অসম্ভব সুবিধার জন্য ভিক্ষা চাহে ও এই ভিক্ষাবৃত্তিকেই পোলিটিক্যাল অ্যাজিটেশন মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কমলাকান্ত আমাদের পলিটিক্স ও মনুষ্যত্বকে এক কথায় বর্ণনা করিয়া দিয়াছিল—ইহা ঘ্যান্‌ঘ্যানানি, কুকুরের পলিটিক্স। 'বর্ষসমালোচনা'য় বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকেই বিস্তৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি ছোট কথাকে বড় করিয়া, স্পষ্টকে ঘোরালো করিয়া, প্রত্যক্ষকে বিশদ করিয়া ও অসম্ভবকে সম্ভাব্য প্রতিপন্ন করিয়া উচ্চ শ্রেণীর হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটির রচনারীতি সরল ও সহজ; কিন্তু তথ্যের ঘনসন্নিবেশে, কৌতুকের নিবিড়তায়, বর্ণনার ছদ্মগাম্ভীর্য্যে ইহার তুলনা বিরল।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসের যে বিশ্লেষণ করা হইল তাহা হইতে তাঁহার রচনার একটি লক্ষণ বিশেষ করিয়া প্রতিভাত হয়। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের

কঠোরতা। বঙ্কিমচন্দ্র যাহাদিগকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাহাদের প্রতি তাহার কোন সহানুভূতি ছিল না। কমলাকান্তের সুতীব্র বেদনা-বোধ আছে, কিন্তু তাহা তাহার বিদ্রূপের মধ্যে করুণ রসের সঞ্চার করিতে পারে নাই। এই নির্মমতা বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিকে কোথাও ঝাপ্সা হইতে দেয় নাই। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়া তিনি বিচার করিয়াছেন এবং সমৃদ্ধ কল্পনার সাহায্যে তিনি ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়াছেন। কোথাও তিনি বিদ্রূপকে স্নিগ্ধমাধুর্যে অভিষিক্ত করেন নাই, যে 'রহস্যে'র সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা এত ঘনসন্নিবেশ যে কোথাও কোন ফাঁক থাকে নাই। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে বঙ্কিমসাহিত্যে হাস্যরস ও শরৎসাহিত্যে হাস্যরসের মধ্যে গভীর পার্থক্য দেখা যাইবে। শরৎচন্দ্রের কৌতুকের প্রধান লক্ষণ তাহার বেদনাবিধুরতা। যাহারা অক্ষম, ছিটগ্রস্ত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন যাহারা প্রতিপদে ভুল করিতেছে, প্রতি মুহূর্তে পরস্পরবিরোধী কাজ করিতেছে শরৎচন্দ্র তাহাদিগকে লইয়া পরিহাস করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পরিহাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমবেদনার শিশিরে আর্দ্র। গিরিশ, সিদ্ধেশ্বরী, প্রিয়নাথ ডাক্তার, রতন দবর্শাক, এমন কি টগর বোষ্টম, মোক্ষদা ঝি—ইহারা যে হাস্যরসের সৃষ্টি করে তাহার মধ্যে শ্রদ্ধা অথবা করুণা লুক্কায়িত থাকে। শরৎচন্দ্র ব্যঙ্গবিদ্রূপও করিয়াছেন, কিন্তু এক রাস-বিহারী ছাড়া তাহার বিদ্রূপাত্মক চিত্র কোথাও সম্পূর্ণাবয়ব নহে। বঙ্কিমচন্দ্র মানুষকে ফল ও পশুর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, তাঁহার 'আম্র-ফল'ও উপাদেয় নহে। এই নির্মমতা হাস্যরসকে স্বচ্ছ, অবিমিশ্র ও তীব্র করিয়াছে; কিন্তু ইহা তাঁহার উপন্যাসের গতিও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তাঁহার সকল উপন্যাসই সজীব, কিন্তু 'ইন্দিরা' ছাড়া কোন

উপন্যাসই সরস নহে। এক গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ ছাড়া তিনি উপন্যাসের মধ্যে কোন সম্পূর্ণাবয়ব কমিক চরিত্র আঁকেন নাই, এবং বিদ্যাদিগ্‌গজ ও 'দুর্গেশনন্দিনী'তে নিতান্ত অপ্রধান চরিত্র। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র মানবজীবনের গভীর ব্যর্থতা ও সার্থকতার চিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহার নিপুণ হাস্যরসবোধ থাকিলেও সেইখানে তিনি হাস্যরসের অবতারণা করেন নাই; কমলাকান্ত ও মুচিরাম গুড় উপন্যাসে প্রবেশ করিলে মানবের জয়পরাজয়ের কাহিনী লঘু হইয়া যাইত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আর একটি লক্ষণ এই যে তিনি প্রায় কোথাও শিশুচরিত্রের অবতারণা করেন নাই। সতীশ বাবু ও সুবোর ছেলেমেয়ের চিত্র গণনার মধ্যে আসিতে পারে না। পরেশ, রাম, শ্রীকান্ত, শ্রীকান্তের ছোড়দা' ও যতীনদা', সর্ব্বোপরি ইন্দ্রনাথ—এই জাতীয় চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নাই। শিশুর সঙ্গে গভীর ট্র্যাজেডি ও প্রণয়বিরহের রোমান্সের সংস্রব কম। শিশু কৌতুকমিশ্র আনন্দের প্রস্রবণ; শিশু-মনের চিত্র আঁকিতে হইলে সহানুভূতির সহিত তাহার চিন্তাধারাকে অনুসরণ করিতে হইবে, নাটাইয়ের মূল্য ও কার্ত্তিক-গণেশ নামক রোহিত মৎস্যদ্বয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই চেষ্টা করেন নাই। যাহাদিগের চরিত্রের রহস্য তিনি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন পরিহাসচপলতার দ্বারা তিনি তাঁহাদিগকে লঘু করেন নাই। আর যখন সভ্যতার মুখোস খুলিয়া মানবের অজ্ঞতা ও নীচতাকে কশাঘাত করিয়াছেন তখন অশ্রুপাতপ্রবণতার দ্বারা কঠোর সমালোচনাকে কোমল করেন নাই, নিবিড় বিদ্রূপকে কোথাও বিরলসন্নিবেশ হইতে দেন নাই।

পরিশিষ্ট—Rajmohan's Wife

বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে ইংরেজিতে Rajmohan's Wife নামক উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে এই উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন নাই। পরে বাঙ্গালায় এই আখ্যায়িকা পুনরায় লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। কিছু দিন হইল এই গ্রন্থের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। এই পুনরুদ্ধারের জন্য বাঙ্গালার পাঠক সম্প্রদায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসন্ধিৎসা ও নিষ্ঠার নিকট ঋণী। এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশের ধারা আবিষ্কার করিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে কিনা সন্দেহ। তিনি নিজে ইহাকে প্রকাশ করেন নাই এবং পরে এই কাহিনীকে বাঙ্গালায় যে রূপান্তরিত করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই প্রচেষ্টাও যে কারণেই হউক সাত অধ্যায়ের অধিক অগ্রসর হয় নাই। সাহিত্যসমালোচনায় এই জাতীয় রচনার স্থান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য-গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য "............সকল জিনিষেরই একটা আরম্ভ ত আছেই। সে আরম্ভ কাঁচা ও দুর্ব্বল, কিন্তু সম্পূর্ণতার খাতিরে তাহাকেও স্থান দিতে হয়............এই আমার কাব্যসংগ্রহে এমন অনেক রচনা স্থান পাইল যাহারা কেবলমাত্র পরিত্যক্ত নদীপথের নুড়িগুলির মত পথের ইতিহাস নির্দ্দেশ করিবে কিন্তু রসধারাকে রক্ষা করিবে না।"

Rajmohan's Wife গ্রন্থের আলোচনায় এই কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহা কি শৈশবের হামাগুড়ির মত বিস্মরণীয়? বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যে পথ বাহিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে ইহার মধ্যে কি তাহার পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়?

বঙ্কিমচন্দ্র অধিকাংশ উপন্যাসে ঐতিহাসিক প্রতিবেশ রচনা করিতে চাহিতেন। যেখানে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ অথবা কোন নৈতিক তত্ত্বের প্রতিপাদন তাঁহার উদ্দেশ্য, সেইখানেও তিনি ইতিহাসের আখ্যায়িকা আনিয়া কাহিনী ও চরিত্রকে বিশালতা দান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'বিষবৃক্ষ', 'রজনী' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—বড় উপন্যাসের মধ্যে শুধু এই তিনখানিতে তিনি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। Rajmohan's Wifeও ইতিহাসের সংস্পর্শ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার একটি প্রধান সূত্র এই প্রথম প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ইহা নিছক গার্হস্থ্য উপন্যাস।

মথুর ঘোষ ও মাধব ঘোষ—উভয়েই বংশীবদন ঘোষের পৌত্র। মথুর ঘোষ তাহার পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়াছিল এবং তাহা বাড়াইয়া গুছাইয়া প্রভূত বিত্তের অধিকারী হইয়াছিল। মাধবের পিতা খুব বেশী অর্থ রাখিয়া যায় নাই, কিন্তু মাধব নিঃসন্তান পিতৃব্যের সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিল। মথুর লম্পট ও ক্রূরমনা, মাধব উচ্চশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র। মথুর ঘোষের দুই স্ত্রী—তারা ও চম্পক। মাধব হেমাঙ্গিনী নাম্নী এক রূপসী দরিদ্র কায়স্থকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল—হেমাঙ্গিনীর ভগিনী মাতঙ্গিনীর সঙ্গে মাধবের পূর্ব্বপ্রণয় ছিল। মাধব ও মাতঙ্গিনী

উভয়েই সচ্চরিত্র; উভয়েই বাল্যের আকর্ষণকে সংযত করিতে সমর্থ হইয়াছে। মাতঙ্গিনীই Rajmohan's wife। রাজমোহন অশিক্ষিত, সন্দেহগ্রস্ত, বর্ব্বর, দস্যুদলসংশ্লিষ্ট; মাধব তাহাকে একটি চাকুরি দিয়া উপকার করিয়াছিল, কিন্তু মাধবের প্রতি তাহার স্নেহ বা কৃতজ্ঞতা নাই। এই সন্দিগ্ধমনা স্বামীর স্ত্রীর প্রতিও কোন অনুরাগ নাই।

রাজমোহন যে ডাকাতদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাহারা মাধব ঘোষের বাড়ীতে ডাকাতি করিবার সঙ্কল্প করিল, ডাকাতি করিয়া তাহারা রাজমোহনের নিকট মাল গচ্ছিত রাখিবে। মাতঙ্গিনী রাজমোহন ও দস্যুসর্দ্দারের গোপন মন্ত্রণা শুনিতে পাইয়া গভীর নিশীথে মাধবকে সতর্ক করিয়া দিল। এই সতর্কীকরণের জন্য ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। মাতঙ্গিনী স্বামীর নিকট সকল কথা স্বীকার করিল। রাজমোহন তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল; দস্যুসর্দ্দারের আবির্ভাবে বিরত হইল। মাতঙ্গিনী পলাইয়া গিয়া মথুর ঘোষের প্রথমা স্ত্রী তারার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল।

উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশের প্রতিনায়ক—রাজমোহন নহে, মথুর ঘোষ। যে পিতৃব্যের সম্পত্তি মাধব ভোগ করিতেছিল মথুর তাহার স্ত্রীকে দিয়া মাধবের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা আনাইল। কিন্তু মাধব যে উইলের জোরে সম্পত্তি ভোগ করিতেছিল সেই উইল হস্তগত করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে মথুর দস্যুসর্দ্দার ও তাহার অনুচর ভিকুকে নিয়োজিত করিল। তাহারা মাধবকে জোর করিয়া বন্দী করিয়া এক অতি ক্ষুদ্র, স্বল্পালোকিত কারাগৃহে বন্দী করিয়া রাখিল। এ দিকে মাতঙ্গিনীর কোন খোঁজ নাই। সে মথুর ঘোষের স্ত্রী তারার আশ্রয়ে

হইতে নিজের বাড়ীতে যাইতেছিল ; তাহার পর উধাও হইয়া গিয়াছে। বন্দীশালায় মাধবের সঙ্গে দস্যুসর্দ্দার ও ভিকুর আলাপ হইল। ইহাদের নিকট হইতে সে বুঝিতে পারিল যে সে মথুর ঘোষের বাড়ীর একাংশে আবদ্ধ হইয়াছে—তাহারা তাহার নিকট হইতে সেই উইল দাবী করিল। সেই সময় এক অস্ফুট চীৎকার বারংবার ধ্বনিত হইল। এই ধ্বনি কোথা হইতে আসিল, দস্যুগণ ও মাধব স্থির করিতে পারিল না। ইহা কোন অলৌকিক শব্দ ইহা মনে করিয়া এবং বাহিরে এক অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া দস্যুগণ পলাইয়া গেল। মাধব দেখিল তাহার কারাগৃহের দ্বার মুক্ত—এবং সম্মুখে মথুরের স্ত্রী তারা। তারা কয়েক দিন যাবত স্বামীকে বিমনা ও চিন্তিত দেখিয়া তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। সে দেখিল স্বামী গুদাম মহালের দিকে যাতায়াত করে এবং তাহার অশান্তির সঙ্গে বাড়ীর এই পরিত্যক্ত অংশের সম্পর্ক আছে মনে করিয়া সে রাত্রিতে এইখানে আসিয়াছিল। দূরে তাহার ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়াই দস্যুগণ আরও বেশী ভয় পাইয়া পলাইয়া গিয়াছিল। তারা ও মাধব সেই অস্ফুট শব্দের কারণ সন্ধান করিতে লাগিল—অনুসন্ধান করিয়া দেখিল সেই অতি ক্ষুদ্র ঘরের একটি গোপন কক্ষ আছে এবং সেইখানে মাতঙ্গিনী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। মথুর নিজের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে মাতঙ্গিনীকে এইখানে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এবং সেই অসৎকার্য্যে মাতঙ্গিনীকে সম্মত করাইতে না পারিয়া তাহার উপর কঠোর অত্যাচার করিতেছিল।

ইহার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। ভিকু পুলিশের নিকট সকল অপরাধ স্বীকার করিল। মথুর ঘোষ আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি পাইল ;

ধরা পড়িল। রাজমোহন মার্জ্জনার লোভে দোষ স্বীকার করিল, কিন্তু সকল কথা কবুল না করায় সে মার্জ্জনা পাইল না—তাহার উপর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হইল। মাতঙ্গিনী পিতৃগৃহে আশ্রয় লইল, কিন্তু জীবনের দুর্ব্বহ ভার হইতে অল্প দিনের মধ্যেই মুক্তি পাইল।

এই উপন্যাস গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনী লইয়া রচিত হইলেও ইহার মধ্যে চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা আছে। মাধব ঘোষের বাড়ীতে ডাকাতির চেষ্টা, মাতঙ্গিনীর সংবাদ দান, মাতঙ্গিনীর পলায়ন, মাতঙ্গিনী ও মাধবের অবরোধ, তাহার বহির্গমন, মাতঙ্গিনী ও মাধবের মুক্তি, মথুরের আত্মহত্যা—এই জাতীয় ঘটনা একেবারে অস্বাভাবিক না হইলেও অনন্যসাধারণ। ইহা হইতে দেখা যায় যে প্রথম হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি রোমান্স রচনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং পারিবারিক জীবনে বিস্ময়কর কাহিনীর অবকাশ কম বলিয়া তিনি ইতিহাসের প্রতিবেশ সৃষ্টি করিয়া তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম প্রচেষ্টাতেই দেখিতে পাই যে রোমান্স রচনার প্রতি ঝোঁক থাকিলেও তাঁহার আসল লক্ষ্য হইতেছে চরিত্রসৃষ্টির প্রতি। সে জন্য ঐতিহাসিক প্রতিবেশ রচনা করিলেও তিনি মাত্র একখানি পুরোপুরি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।

Rajmohan's Wifeএ উইল হস্তগত করার কথা আছে এবং জমিদার-বাড়ীর উপভোগ্য বর্ণনা আছে। ইহা কৃষ্ণকান্তের উইলের এবং নগেন্দ্রনাথের বাড়ীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রদের মধ্যে দস্যুসর্দ্দার, তাহার অনুচর ভিকু ও

তাহাদের বন্ধু রাজমোহন উল্লেখযোগ্য। পরিণত বয়সের উপন্যাস 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে দস্যুদলের সাক্ষাৎ পাই। Rajmohan's Wifeএর প্রধান চরিত্র দুইটি সাধ্বী রমণী, তাঁহাদের স্বামী মথুর ও রাজমোহন ঘোর পাপাসক্ত। ইহাদের মধ্যে কি সূর্য্যমুখী ও ভ্রমরের পূর্ব্বাভাস সূচিত হইয়াছে? এই ভাবে দেখিতে গেলে Rajmohan's Wife ও পরিণত বয়সের উপন্যাসের মধ্যে এইরূপ অনেক সাদৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আর্টের দিক্ দিয়া বিচার করিলে এই প্রথম প্রয়াসের সঙ্গে পরিণত রচনার কোন সংযোগ নাই। এইখানে সকল চরিত্রগুলিই একটানা ভাবে আঁকা, কাহারও মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নাই। মথুর ও রাজমোহন নিছক পাপের মূর্ত্তি; মাধব, তারা ও মাতঙ্গিনী অবিমিশ্র পুণ্যের প্রতিচ্ছবি। মাধব-মাতঙ্গিনীর পূর্ব্বরাগ তাহাদের জীবনে বৈচিত্র্য আনিতে পারিত, কিন্তু তাহারা এত সৎ যে এই ব্যর্থ অনুরাগ তাহাদের হৃদয়কে প্রভাবান্বিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মাতঙ্গিনী যে মাধবকে সতর্ক করিয়াছিল,—ইহার মধ্যে কৃতজ্ঞতা ছিল, অন্যায়ের বিরুদ্ধতা ছিল, ভগিনীর প্রতি স্নেহ ছিল, বাল্যপ্রণয়ীর প্রতি অনুরাগ ছিল কি? মাধবের আচরণ সম্পর্কেও এই কথা খাটে। শুধু মাতঙ্গিনী যে জীবনের শেষ কয় দিন মাধবের বাড়ীতে না থাকিয়া তাহার পিত্রালয়ে রহিল এই সঙ্কল্পের মধ্যে এই প্রণয়ের সংযোগ থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা স্পষ্ট হয় নাই, বিশেষতঃ এই সকল উপসংহারে বর্ণিত হইয়াছে, মূল উপন্যাসে নহে। ভ্রমর, সূর্য্যমুখী পতিগতপ্রাণা; কিন্তু ইহাদের মনে যে নানা বিচিত্র ভাবের সম্মিলন হইয়াছে তাহাই ইহাদিগকে জীবন্ত করিয়াছে। এমন

কি ক্রূরমনা হরবল্লভ রায় পর্য্যন্ত শুধু পাপের প্রতিমূর্ত্তি নহে; লোভ, ভয়, সমাজে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, অনিবার্য্যের কাছে অকুণ্ঠিত আত্মসমর্পণ—এই নানা মূর্ত্তিতে হরবল্লভ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এই বৈচিত্র্য Rajmohan's Wifeএর কোন চরিত্রে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত রচনায় দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র শুধু বাহিরে নহে, নরনারীর হৃদয়ে নানা সম্মিলন ও সংঘাতে উপন্যাসবর্ণিত দ্বন্দ্ব সজীব হইয়াছে। তাঁহার প্রথম রচনায় অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন চিহ্ন নাই। পাপ ও পুণ্যের প্রতিমূর্ত্তিদের মধ্যে কলহ ও সংঘর্ষের অবসানে পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় বিঘোষিত হইয়াছে। এই উপন্যাসে চরিত্রবিশ্লেষণের কোন আভাস নাই। সুতরাং যে রসধারা 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে আরম্ভ করিয়া 'সীতারাম' পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে ইহার কোন মৌলিক সংযোগ নাই।

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	১৪	উপন্যাসে	উপন্যাসে ও নাটকে
৩১	৪	তথায় পীড়ন	তথায় নিম্নজাতি পীড়ন
৪৪	১৬	হতেই	হইতেই
৪৭	১০	দিয়াছেন	করিয়াছেন
৫৪	১৫, ১৬	নানা বিচিত্র বর্ণে	নানা বর্ণে
৭২	১৩	আমরা কখনও	আমরা প্রায় কখনও
৭২	১৪	অনুভূতির কোন	অনুভূতির বিশেষ কোন
৮৭	১০	উন্নিসা	উন্নিসার
৯০	১১	সম্ভাবনা	সম্ভাব্যতা
১৯৪	২০	হিন্দু আচার ও	হিন্দু আচার পালন ও
১[illegible]	১২	তিনখানি	তিনটি